বাংলার নৈবেদ্য

আবদুল জব্বার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

এক লাইন পড়লেই
যাঁর লেখা
টং করে বেজে ওঠে—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পূর্বপুরুষেষু—

নিবেদন

বাংলার 'নৈবেদ্য'—নিবেদিত প্রসাদ, অর্ঘ্য বা সম্পদ—মানুষের জন্য।

আকাশকুসুম কল্পনা নয়—গ্রামজনপদের সাধারণ মাটি-মাখা মানুষের জীবন—মাটি-ঘাস-গাছপালা-নদনদী-পশুপাখি—নিসর্গচিত্র এই গ্রন্থের ফিচারগুলির উপাদান।

চিরুনী টানার মতো প্রকাশক একটু নিষ্করুণ হয়ে প্রায় ষাটটি লেখা থেকে বাছাই করেছেন এগুলি। ছোটগল্পের আলাদা মর্যাদা থাকলেও সসম্মানে এ আসরের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাদের।

'বাংলার চালচিত্র' আর 'বাংলার নৈবেদ্য' তবে কি রেললাইনের মতো সমান্তরাল? এ বিচারের বিষয় বিদগ্ধ সমালোচকদের।

অশিক্ষা আর অর্থনৈতিক দুরবস্থা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে দিচ্ছে না—তাদের বেশিরভাগ লোকই ভূমিহীন—পায়ের তলায় যাদের মাটি নেই—স্বাধীন ভারতের সাতটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপকথার সোনার পাখি হয়ে যাদের মাথার ওপর দিয়ে শুধু শব্দ রেখে উড়ে গেছে—তারা আজো পরাধীন নিজেদের জৈবিক চেতনা আর ক্ষুন্নিবৃত্তির কাছে। কাজেই এসব মানুষের কাছে মানবিক মহৎ চিন্তা-ভাবনার খোরাক খোঁজাও অযৌক্তিক।

মাটির কুঁড়েঘরে লম্প-হ্যারিকেনের আলোয়, বাঁশ-হোগলা-শরখড়ি ঝোপের জলাভূমিভরা পল্লীর মানুষ ডোঙা-শালতি-বোট-পালোয়ার—রিক্স-ভ্যান-ঠেলা বেয়ে হাটে-বাজারে কলে-কারখানায় ক্ষেত-খামারে কাজ করেও শত রকম হতাশার ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত!

তাদের যেমন দেখেছি জেনেছি—আজীবন—তা বাইরে থেকে নয়—তাদেরই মধ্যে জন্মে—রক্তে-মাংসে মিশে একেকার হয়ে—প্রকাশের নৈপুণ্য বা ব্যর্থতা যা তা আমার নিজেরই।

'বাংলার চালচিত্র'-গোত্রভুক্ত 'বাংলার নৈবেদ্য' যদি পাঠক-পাঠিকাদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করতে পারে তবেই আমাদের শ্রমসার্থক।

বইটির নামকরণ করেছেন সৌরেন মিত্র আর লেখা বাছাই করেছেন মণীশ চক্রবর্তী, সবিতেন্দ্রনাথ রায়—তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

'বাংলার চালচিত্র' উৎসর্গ করেছিলাম নিসর্গপ্রেমিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সেই পর্যায়ভুক্ত অন্য আর একজন মাটি আর মানুষঘেঁষা মহান প্রবক্তাকে খুঁজে হাওড়া-হুগলী-মেদিনীপুরের গ্রামেগঞ্জে ঘোরার পর—যে মানুষকে আজো কেউ ভোলেনি—যাঁর সন্ধান পাই—তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামতাবেড়েয় তাঁর বাড়ি দেখতে গিয়ে খাতায় লিখে দিয়ে এসেছিলাম, 'পূর্বপুরুষের ভিটে দেখে গেলাম।' সেই চিরস্মরণীয় অসামান্য জীবনকথককে 'বাংলার নৈবেদ্য' উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

২৬।১২।৮৯

গ্রাম—সাতগাছিয়া

থানা+ডাকঘর—নোদাখালী

ভায়া—বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আবদুল জব্বার

লেখকের অন্যান্য বই

ইলিশমারির চর
বাংলার চালচিত্র
মুখের মেলা
বিদ্রোহী বাসিন্দা
মাতালের হাট
ঝিনুকের নৌকো
বদর বাউল
রূপের আগুন
কনকচূড়া
অশান্ত ঝিলম
রাতপাখির ডাক
অলৌকিক প্রেমকথা
দেশ আমার মাটি আমার
বাংলার জলছবি
মরিয়মের কান্না
মাটির কাছাকাছি
জনপদজীবন
পল্লীর পদাবলী
আপনজন

বাংলার নৈবেদ্য

অমৃত-স্নান

সবুজ ঘাসভরা মাঠের পথে বিকেলের উদোম হাওয়ায় আমরা দুজন হেঁটে চলেছি। পায়ে পায়ে ঘাসের খসখস শব্দ। ময়রা, চিচ্চিড়ে, গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ছে খানিকটা দূরে দূরে। গরুর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। নধরকান্তি ষাঁড়ের পাশে একটি গাভী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে তাদের কাছে গোবক ফড়িং ধরে খাচ্ছে টকাটক। দূরের পল্লীর বাইরে বাঁশ, নারকেল, কলা, চাকন্দ গাছের মধ্যে আমরা যাবো কোনো এক পীরের মাজারে।

অনেক দিনের অনেক অপেক্ষা অনেক গান-হাসি-কান্নার পর সহেলি ওই মাজারের পীরবাবার কাছে মানত শুধে আজ আমার সঙ্গে আশ্রম-শিবিরে রাত্রিবাস করবে।

পাগলা হাওয়ায় সহেলির মোলায়েম রেশমী শাড়ি যেন আনন্দে হাততালি দিয়ে উড়ে পালাতে চাচ্ছিল। শাড়ি চেপে সে হাওয়ার বিপরীত দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। হাসতে লাগলো।

মাজারে পেঁছে আমরা দুজনে ওজু করে এসে নামাজ পড়লাম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। খাদেম কাছে এলে তাঁর হাতে পাঁচশো টাকা দিলে সহেলি। বললে, 'খাদেম-ভাই, পীরবাবার মাজারে আমার মোরগের 'হাজুত' মানসিক আছে। সন্ধ্যায় যতজন মুরীদান আসেন তাঁদের খাওয়াবেন। আর আমরা আজ এখানে খাবো, থাকবো।'

খাদেম বললেন, 'বহুৎ মেহেরবানি। থাকুন ঐ 'হোজরা'য়। একেবারে নিরাপদ আশ্রয়। বহু দূর থেকে ভক্তরা এসে রাত কাটিয়ে যায়।'

হোজরার মধ্যে গেলাম আমরা। তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতা। মশারিও আছে। ছোট্ট ঘর কিন্তু পরিষ্কার।

আমরা বসে পড়লাম।

সহেলি বললো, 'খাদেম বোধ হয় বুঝেছেন আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

বললাম, 'চলো আমরা পীরবাবার জীবন-কাহিনী শুনি! তাঁর জীবনেও নাকি অভিনব এক প্রেমকাহিনী আছে।'

খাদেমকে পীরবাবার কাহিনী শোনাবার কথা বললে তিনি জানালেন, ঈশার নামাজের পর খাওয়া-দাওয়ার শেষে বলবেন, এখন নয়।

সে সময় এলে তিনি আমাদের দুজনকে মাজারের মধ্যে আনলেন। মোটা রক্তাভ একটি মোমবাতি জ্বলছে। সমাধির ওপর লাল সালু পাতা। ফুলের ঝাড় চারকোণায়।

খাদেম আমিন সাহেব বললেন, 'হজরত হোসেন দরগাই ইরান থেকে ভারতে আসার পর কাশ্মীরে কিছুকাল তাঁর আব্বাজানের সঙ্গে ছিলেন। আব্বাজানের ছিল পোশাক-আশাক আর শাল-গালিচার ব্যবসা। যৌবনকালে হজরত দরগাই দেখতে ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। দোকানে বসে থাকলে তাঁকে দেখার জন্যে কত লোক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাবার পর আবার ফিরে আসতো। মানুষ এমন সুন্দর দেখতে হতে পারে এ যে অবিশ্বাস্য। দোকানে খানদানী 'রেইস' বাড়ির মেয়েদের ভিড় হতো। কেনাকাটার চাইতে তারা হজরত বাবাকেই দেখতে আসতো বেশি। দুটো একটা কথা বললে সবাই যেন কৃতার্থ হয়। মিষ্টি করে হেসে দিয়ে তিনি কথা বলতেন। তাঁর আব্বাজান বলতেন, 'আমার 'ফেরেস্তা' (স্বর্গীয় দূত) বাবা শুধু যদি আমার দোকানে বসে থাকে তাতেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

'হজরত হোসেন দরগাই ভোরবেলায় উঠে প্রথমে বাসিমুখেই একঘটি পানি পান করতেন। বাইরে যেতেন। ব্যায়াম করার পর অজু করে নিয়ে নামাজ পড়তেন। পরে 'সুবেহ সাদেক' বা নবপ্রভাত পর্যন্ত পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন। তাঁর কণ্ঠধ্বনি ছিল অপূর্ব সুরেলা। সেই সঙ্গীত শুনে ঘুম ভাঙতো বাড়ির সবার। তিনি কিশোরবেলা থেকে এই অভ্যাস করেছিলেন। আম্মাজান ছিলেন তাঁর মন্ত্রণাগুরু। হজরত দরগাই কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। অন্যায় কাজে তাঁর কখনো কোনো রকম আসক্তি ছিল না। একবার তাঁকে তাঁর আঠারো বছর বয়সে এক পাওনাদারের কাছে পাঠানো হয়। তখন খুব শীত। তিনি দামী রক্তবর্ণ নকসাদার শাল মুড়ি দিয়ে সাদা রঙের সুন্দর আরবী ঘোড়ায় চড়ে তেহেরান শহরের কাছে এক পল্লীতে গিয়ে কর্জদার লোকটির দেখা পান! গিয়ে দেখেন লোকটি শীতবস্ত্রহীন অবস্থায় দারিদ্র্যে পড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। প্রৌঢ় মানুষটি বিনয়ে অবনত হয়ে বললেন, আপনার পদধূলি পড়ার জন্য আমার কুটিরপ্রাঙ্গণ ধন্য হলো। কিন্তু আপনাকে কোথায় বসতে দিই! প্রায় নিরন্ন অবস্থায় আমার দিন কাটছে। গায়ের একটা শীতবস্ত্র পর্যন্ত যোগাড় করতে পারছি না। আপনার আব্বাজান দেবতুল্য মানুষ। তিনি আমাকে খুব সুসময়ে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কোনো রকম সুদ ছাড়া কে আর টাকা দেয় বলুন? বন্ধকী জমিটা সেই টাকায় ছাড়ালাম। এ বছর গম কিছুই হলো না। তাঁর ঋণ আমি নিশ্চয়ই শোধ করে দেবো যদি খরমুজা, ডালিম, খেজুর, চেরি, আপেল, আঙুর বা ভুট্টা বেচে এ বছর কিছু মুনাফা করতে পারি।

'হোসেন দরগাই প্রৌঢ় বিনয়ী মানুষটিকে বললেন, আপনি সৎভাবে জীবনযাপন করুন। আমি দোয়া করছি আল্লাহ্ সুদিন দেবেন। আর অনুগ্রহ করে আমার এই শালটি আপনি গ্রহণ করুন।

'চাষীটি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। না না করলেও পুণ্যবান 'নানাজী'র (দাদামশায়ের) শালখানি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ঘোড়ায় উঠে চলে এলেন। ঘোড়ায় ওঠার সময় চাষী খুশি বক্ত হেঁট হয়ে পিঠ পাতলেন। হোসেন

দরগাই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে দিলেন কিন্তু খুশ বক্ত নাছোড়বান্দা। শেষে তিনি গোলাপকোমল পা দুটি তাঁর পিঠে রেখে ঘোড়ায় উঠে যাবার পর কাছে টেনে মাথায় তিনটি চুম্বন করলেন। আর সুরা ইয়াসিন পড়ে ফু দিলেন। ফিরে এসে মাকে চাষীটির কথা বলতে বলতে দয়ায় তাঁর নীলাভ পদ্মকোরক চোখ দুটি থেকে অঝোরধারায় অশ্রু গড়াতে লাগলো।

'মা বললেন, বেশ করেছ বাপমণি, খুব ভাল কাজ করেছো। কিন্তু বাপমণি, তুমি একটি জিনিস হারিয়ে এসেছো। তোমার নানাজীর দান করা প্রাচীন ঐতিহ্যটি তো গেলই, উপরন্তু ঐ শালটির এমন প্রার্থনা-পূত গুণ ছিল যে ওটি গায়ে দিয়ে কোনো পুরনো দেনা উদ্ধার করতে গেলে প্রাপ্তিযোগ ঘটতোই। এই শাল দান করবার জন্য তোমার আব্বাজান খুবই ক্ষুণ্ন হবেন। ঠিক আছে, আমি তোমার দয়ার্দ্রতার কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলবো। মানুষের দুর্দশায় এই যে তোমার চোখে অশ্রু ঝরলো, এটাই বড় লাভ। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে তোমার ওপরে।'

আমি যেন পাথরের মতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সহেলির গোলাপ-রাঙা গণ্ড বেয়ে কাচের দানার মতো অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে নামছিল। সহেলি যেন আর এ জগতে নেই। সে হজরত হোসেন দরগাইয়ের রূপাবয়বের মধ্যে লীন হয়ে গেছে।

মোমের শিখাটি নীরব তপস্যায় আলো বিকিরণ করে গলে গলে নামছে।

খাদেম বলতে লাগলেন, 'একদিন দোকানে খুব ভিড় ছিল। দেখা গেল সেই চাষী খুশ বক্ত একটি তেজী ঘোড়ায় চড়ে এসে নেমে পড়েই পাঁচ হাজার টাকা বার করে দরগাই সাহেবের বাবার পায়ের কাছে রাখলেন। আর বেশ অনেক টাকার শাল-গালিচা কিনলেন। বললেন, আমার আর অভাব নেই। ক্ষেতে তো সোনা ফলেছেই, উপরন্তু পৈতৃক ভিটে কোপাবার সময় এক কলসী সোনার মোহর আমি পেয়েছি যা আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ছিল।'

কি জানি কোন ভাবাবেগে সহেলি মাজারে মাথা লুটিয়ে হঠাৎ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

খাদেম আমিন সাহেব তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। বললেন, 'ওঠ মা-মণি, ধৈর্য ধরো। আরো চমৎকার মরমী প্রেমকাহিনী আছে, তা শোন।'

সহেলির পিঠে আমি হাত বুলোতে লাগলাম। সে চোখ মুখ মুছে সোজা হয়ে বসলো।

খাদেম আমিন সাহেব বলতে লাগলেন, 'ঈদের আগের দিন পোশাক-আশাক কেনার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। দোকানের কর্মচারীরা প্রচণ্ড কাজের চাপের মধ্যে ছিল। মেমো দেখে সেদিন কেবল টাকা নিচ্ছিলেন হজরত হোসেন দরগাই। অন্যদিন তিনি বইপত্র পড়তেন। ক্যাশমেমো বাড়িয়ে ধরা অপূর্ব সুন্দর কোমল দুধে-আলতা রঙের একটি হাত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হাতটির কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটোনো। যার হাত তার শরীর বোরখায় ঢাকা। মুখের দিকে না তাকিয়ে তিনি গোলাপকোমল হাতের তালুতে যেই

না বাকি টাকাগুলি ফেরত দিলেন অমনি হাতটি একটু চেপে ধরল মেয়েটি। সবার নজর এড়িয়ে। খুব দ্রুত। হজরত দরগাই চোখ তুলে একটু তাকাতেই দেখতে পেলেন কালো রেশমী বোরখার নেকাব তুলে একটি স্বর্গের ফুল যেন তাঁর দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে আছে। স্বভাবরক্তিম দুটি ঠোঁট একটু ফাঁক হতেই দ্যুতিময় মুক্তাভ দাঁতগুলি দেখা গেল।

'বোরখার নেকাব ফেলে দিয়ে মেয়েটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে দ্রুত চলে গেল।

'মেমো দেখে টাকাকড়ি দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে ভুল হয়ে যেতে লাগলো। এরকম আর যাতে না হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেও রদ্ করতে পারলেন না। শেষে 'শরীরটা ভাল লাগছে না' বলে উঠে পড়লেন। আব্বাজান এসে তাঁর কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখে বললেন, অসুস্থ লাগছে তো বাড়ি চলে যাও।

'না, এমন কিছু নয়'—বলার সময় তাঁর ঠোঁট দুটো যেন অস্বাভাবিক রকম কেঁপে উঠলো। নিজের কণ্ঠস্বরও নিজের কাছে অচেনা লাগল। বাড়িতে আসার পর আম্মাজান দেখলেন তাঁর একমাত্র পুত্রের মুখখানা অস্বাভাবিক রকম লালচে হয়ে গেছে। মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন, কি হয়েছে বাবা তোমার?

'না, কই কিছু নয় তো আম্মাজান!' বলে হজরত দরগাই এড়িয়ে গেলেন।

'কিন্তু তিনি যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। নামাজ পড়ার সময় তাঁর সব কিছু ভুল হয়ে যেতে লাগলো। প্রার্থনার সময়ও সেই অচেনা মেয়েটির হাসিভরা মুখখানা কেবল দেখতে পান। এরপর তিনি স্বাভাবিকতাও হারিয়ে ফেললেন। বসে আছেন তো বসেই আছেন। উলটো জামা পরছেন। মাঝে মাঝে উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর উৎসুক চোখ খুঁজে বেড়াতো যেন কোনোকিছু। গাছের তলায় বসে থাকতে থাকতে অঝোরে কাঁদতেন। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতেন, 'কোথায় তুমি?' তাঁর সেই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতো পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে। একদিন গোধূলিবেলায় মেষচালকরা বাড়ি ফেরার সময় তিনি তাদের একজন বৃদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাকে দেখেছো?

'পাগল! তাকে কি দেখা যায়?'

'হ্যাঁ, আমি যে তাকে দেখেছি।'

'তুমি তাকে দেখতে গেলে কেন?'

'না, আমাকে তো সে-ই দেখা দিল।'

'তাতেই মাথা ঘুরে গেল?'

'হ্যাঁ, সে তো বেহেস্তের হুর!'

'তাহলে তুমি বেহেস্তে চলে যাও।'

'আমি তো সে পথ জানি না।'

'পাগলের সঙ্গে সে তো দেখা করে না। তুমি স্বাভাবিক হও। তার খোঁজে তোমাকে যেতে হবে না। সে তোমার কাছে আসবে।

'মেষচালক দূরে চলে যাচ্ছে দেখে হজরত হোসেন দরগাই চিৎকার করে বললেন, সে আসবে ?

'হ্যাঁ, তুমি যেমন ছিলে তেমন হও গিয়ে। হাঁক দিয়ে বলে গেলেন বৃদ্ধ মেষচালক। মেহেদি রাঙানো তাঁর লাল দাড়ি আর তীক্ষ্ণ মধুর চোখ দুটি যেন পথের নির্দেশ দিয়ে গেল।

বাড়িতে ফিরে স্নানাহার করার পর পবিত্র কোরান পড়তে বসলেন। কাঁদতে লাগলেন সেই সঙ্গে। আম্মাজানও কাঁদতে লাগলেন জানালার পাশে বসে। কিন্তু কোনোকিছু প্রশ্ন করলেন না। তাঁর প্রাণের বাছা আজ অনেকদিন পরে ভাল কাপড়চোপড় পরেছে। খেয়েছে। ভুল পড়ছেও না। তবে কি ও স্বাভাবিকতায় ফিরে আসছে ? হে আল্লাহ্, তাই যেন হয়।

'সারারাত ঘুমোবার পর সকালে আগের মতো স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো সেরে নিয়ে পোশাক পরে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে দোকানে এলেন। তাঁর আব্বাজান তাঁর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'আগের আসনটায় হজরত বাবা বসলেন গিয়ে। ক্যাশমেমো নিয়ে ক্রেতাদের পাওনা-কড়ি মিটিয়ে দিতে লাগলেন সঠিকভাবে। কয়েকদিন পরে নওরোজের উৎসবের সন্ধ্যায় দোকানে ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন সবাই। হঠাৎ আবার সেই হাতের আবির্ভাব। চমকে উঠলেন তিনি। মুখের দিকে তাকাতে দেখলেন 'নেকাব' ফেলা। মুঠোর মধ্যে টাকা। হাত পাততে মোহরের সঙ্গে একটা ভাঁজ-করা চিরকুট দিয়ে গেল। তাতে ফারসিতে লেখা ছিল ঃ ডাল হ্রদের তীরে আখরোট তলায় আগামী কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টায় দেখা হবে।—নার্গিস বানু।

'সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে তখন। হাউসবোটের আলো এসে পড়েছে ডাল হ্রদের পানিতে। দুটি হাউসবোট মাঝখানে রেখে নিচু হয়ে পড়া গাছপালার ভেতর দিয়ে রঙিন পানিতে দাঁড় ফেলে ফেলে একজন যুবককে শিকারা বেয়ে আখরোট গাছের আলো-আঁধারির মধ্যে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। হজরত হোসেন দরগাই সন্ধ্যার কিছু আগে এসে বিশাল আখরোটতলায় বসেছিলেন —পাছে সে এসে চলে যায়।

'শিকারা থেকে যে উঠে এলো তার মাথায় টুপি। কোমরে বাঁধা সোনালি জরির উড়ানী। সে কাছে এসে বললে, আদাব আরজ। মেহেরবানি করে যদি আমার শিকারায় আসেন তাহলে ডাল হ্রদের শোভা সৌন্দর্য দেখিয়ে আপনাকে আনন্দ দান করতে পারি।

'বামাকণ্ঠ শুনে কৌতুক আর কৌতূহল বোধ করলেন হজরত হোসেন দরগাই। তিনি দ্বিধা করতে লাগলেন। আবার আহ্বান এলো ঃ আসুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না ?

'হাত ধরে টানতেই যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শ পেলেন। ধীরে পায়ে এসে তিনি তার শিকারায় উঠলেন। বামাকণ্ঠ সেই পুরুষপোশাকী দুতটি শিকারা বেয়ে চলতে চলতে গান গাইতে লাগলো। তার চোখে-মুখে আলো পড়তেই

সে হাত-আড়াল করলো। পরপারের একটি হাউসবোটের পাশে এসে শিকারা ভিড়লো। যুবকটি উঠে গেল প্রথমে—তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। বাসন্তী রঙের বহুমূল্য গালিচা পাতা অতি সুন্দর একটি কামরার মধ্যে দরগাই সাহেবকে বসিয়ে যুবকটি ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে হাতে সরবতের গ্লাস নিয়ে রেশমী কালো বোরখার 'নেকাব' ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। তারপর আর একটি। পরপর সাতটি মেয়ে সাত রঙের সরবত নিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে বোরখার 'নেকাব' তুলে ফেললো। সকলেই অপূর্ব সুন্দরী। যার দিকে তাকাচ্ছেন সবাই হাসছে। যেন একই ভঙ্গিতে। চোখেও তাদের বিলোল কটাক্ষ। শরীরে মদির অলসতা, ঢেউভাঙা কোমর বুক। এদের মধ্যে কোনজন সেই 'হুর'? সাতটি গ্লাস তারা গোলাকারভাবে সাজিয়ে রাখলো। যেটিকে ইচ্ছা তুলে নিতে পারেন হজরত হোসেন দরগাই। কিন্তু তিনি কোনো গ্লাসই তুলে নিলেন না। মাথা নাড়তে লাগলেন। না, তোমাদের কাছে তো আমি আসিনি। সে তোমাদের মধ্যে নেই। মিথ্যা প্রবঞ্চনা! উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তখন পর্দা সরিয়ে সেই হুর তেমনি কালো রেশমী বোরখা পরে হাতে এক গ্লাস বেদানার রস নিয়ে এসে সাতটি গ্লাসের মাঝখানে রাখলো। তার সেই জ্যোৎস্নাধোয়া নিটোল সুন্দর হাতটি দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। বেদানার রসভরা গ্লাসটি তুলে নিয়ে তা পান করার পর কিছুটা রেখে নামিয়ে দিতে সেই অপরূপা অপ্সরী মুখের নেকাব তুলে দিয়ে তা পান করলো। দরগাই সাহেব বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকালেন তার মুখের দিকে। সেই হাসি! সেই চোখ!

'অন্য মেয়েগুলো হঠাৎ ছড়িয়ে বসে পড়ে বাজনা বাজাতে লাগলো।

নার্গিসবানু বিদ্যুৎকন্যার মতো নাচতে লাগলো যেন আকাশের নীল পটভূমিকায়। হাত বাড়িয়ে ধরা-ছোঁয়ার জিনিস নয় যেন সে। প্রাণচঞ্চল ঝর্ণাধারার মতো সঙ্গীত তার কণ্ঠে। নাচ-গান-শেষে মেয়েরা সব বিদায় নিলে নার্গিস বানু চিকন সাদা একটি ফুলের মালা পরিয়ে দিলে হজরত হোসেন দরগাই-এর গলায়। তখন তিনি আলতো হাতের উল্টোপিঠ ঠেকিয়ে মুখখানা তুলে ধরলেন নার্গিস বানুর। হজরতের অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটির তারা ছিল নীল কিন্তু তার চারপাশের সাদা অংশ ছিল প্রথম ঊষালগ্নের মতো হাল্কা রক্তিম। তাঁর কপাল, ঘাড় আর হাত-পায়ের যেসব অংশ দেখা যাচ্ছিল তা ছিল রুপোর পেয়ালাকে সোনার পানি দিয়ে ধোয়ার মতো। তাঁর সেই শোভা-সৌন্দর্য দেখতে লাগলো নার্গিস বানু। অস্ফুট স্বরে বললো, কি সুন্দর! কতদিন এই দুটি চোখ দেখার জন্যে আমি বোরখা মুড়ি দিয়ে যেতাম আপনাদের দোকানে। অপলক চোখে শুধু আপনাকে দেখতাম আর বুকভরা কত তৃষ্ণা নিয়ে যে ফিরতাম তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন।

'আর আমি যে তোমার মুখখানা শুধুমাত্র একবার একটু দেখার পর পাগল হয়ে গেলাম! তোমাকে কত কোথায় খুঁজলাম, পেলাম না।

'একবার দেখে উন্মাদ হওয়া আর বহুবার দেখেও স্থির থাকা দুটো এক

জিনিস নয়। আমি যে নারী। পৃথিবীর মাটির মতো সর্বংসহা।

'কঠিন পরীক্ষা যদি নেমে আসে?

'কামতীর মতোই সর্বংসহা হয়ে থাকব।

'নার্গিস বানুর চোখ আর ঠোঁট দুটি স্পর্শ করলেন হজরত হোসেন দরগাই। সৌন্দর্যের যিনি ছিলেন আকর। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ কেঁদে উঠে মুখে হাত চাপা দিতেই নার্গিস বানু তাঁর বুকের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠে বললো, ওগো তুমি কেঁদো না। আকাশ ফেটে যাবে! তোমার কান্না আমি সইতে পারবো না।

'সে-রাতে হজরত হোসেন দরগাই নার্গিস বানুর কামরায় রাত্রিবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ নার্গিসের মা-বাবা আজমীর শরীফে বেরিয়ে গিয়ে ও হঠাৎ স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে ফিরে আসেন রাত দশটার সময়। সে সময়টাতে তালাচাবি পড়ে যায়। নার্গিসের মহলটা ছিল শিকারা ভেড়ানো হাউসবোটের নিচের তলার একাংশ। নার্গিস অসুস্থ বাবাকে দেখতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আসে। সে-সময়েই সুযোগ ছিল পীর দরগাই বাবাকে বার করে দেওয়ার। কিন্তু নার্গিস প্রেমের মায়ায় তাঁকে গোপনে নিজের কামরায় রাখতে চায়। নার্গিস খেতে যাবার সময় গোটা বাড়িতে তালাচাবি পড়ে যায়। সমস্ত চাবি থাকে তার আব্বার কাছে। তখন আর চাবি চাওয়া সম্ভব হয়নি। তার আব্বা ফিরে না এলে চাবির গোছা থাকত তার নিজের কাছে। বাবার একমাত্র আদরের দুলালী সে ঠিকই কিন্তু তার বিয়ের পাত্র ঠিক করে রাখার পর এই গোপন অভিসার ওঁদের কাছে একেবারেই অবৈধ। তা প্রকাশ হলে আব্বাজান কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

'নার্গিসের বিয়ে হবার কথা বিখ্যাত এক ঘোড়া ব্যবসায়ীর পুত্রের সঙ্গে। যার মুখে ছিল বসন্তের দাগ। আর স্বভাবেও সে ছিল উচ্ছৃংখল। রেস-জুয়া তার আর একটি নেশা। তার সঙ্গে ছিল বেপরোয়া নারীবিহার।

'ভোরের আজানের পর দারোয়ান তালাচাবি খুলে দিতেই হজরত দরগাই অন্দরমহল থেকে বার হয়ে এলেন নিজেই, নিজের দায়িত্বে। শিকারা চালিয়ে ডাল হ্রদের অন্যদিকে চলে যাবার সময় দারোয়ান বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে নার্গিস সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু অন্য দাসদাসীর চোখে পড়লো তাঁকে। তারা গোপনে ডেকে দেখাল নার্গিসের মাকে—যারা ছিল শাঁখের করাত। তার আব্বাও জানলেন আর স্বচক্ষে দেখলেন। শিকারা চালিয়ে মাথায় নীল পাগড়ি জড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাঁর কন্যার ঘরে রাত্রিবাসকারী এক যুবক। স্পর্ধা কি এদের?

'হজরত হোসেন দরগাই দোকানে বসেছিলেন চুপচাপ। সামনের পথ দিয়ে বাজি-বাজনার মাতন করে বিয়ের বর যাচ্ছিল। ঘোড়ার গাড়িতে 'নওশা' বেশে সাজানো বরটির দিকে চোখ পড়লো দরগাই বাবার। একজনকে বলতে শুনলেন, স্বর্ণকার রহমত আলি খানের কন্যা নার্গিস বানুর বর যাচ্ছে।

'নার্গিস বানুর বর? হজরত হোসেন দরগাই সোজা হয়ে বসলেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই তার মাথা ঘুরে গেল। পড়ে গেলেন তিনি।

'বিয়ের কনে চলে গেল সন্ধ্যার পর। সমস্ত গাছপালার শোভা-সৌন্দর্য তখন আঁধারে গ্রাস করে ফেলেছে।

'হজরত বাবা চুপচাপ তা দেখলেন। যারা বিয়ে দেখতে বা নিমন্ত্রণে গিয়েছিল, ফিরে এসে জানালো কন্যা কিছুতেই মত দিচ্ছিলো না। তার ওপরে পীড়ন করা হয়েছে। কন্যার অজ্ঞান অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তার 'নানী' (দিদিমা) নাকি 'হুঁ' বা সম্মতি দিয়েছেন। এই বিয়ে ঠিক বৈধ উপায়ে হয়নি। নার্গিসের আব্বা এই বিয়ের আগে চশমখোর ব্যবসায়ী হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা কন্যাপণ আদায় করে নিয়েছিলেন ঘোড়া ব্যবসায়ী হবু বেহাইয়ের কাছ থেকে। কাজেই নার্গিস বানু যে হজরত হোসেন দরগাইকে ভালবাসতো তা প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তার বাবা কিছু করতে পারেন নি।

'তিনদিন পরে হজরত হোসেন দরগাই গৃহত্যাগ করলেন। ফকির-দরবেশ হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে আবার কাশ্মীরে ফিরে এলেন দশ বছর পরে— যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। কাশ্মীরে এসে শুনেছেন তাঁর বাবা মা পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ আর উন্মাদ হয়ে মারা গেছেন। সহায়সম্পদ যা রেখে গিয়েছিলেন তা চুরি হয়ে গেছে। বিরান হয়ে যাওয়া বাড়ি পড়ে আছে। আগাছায় ঢেকে গেছে বাগান-বাগিচা। তাতে তাঁর দু-চোখে দু-ফোঁটা অশ্রুও গড়ালো না। কোনো যন্ত্রণাই তাঁকে টলাতে পারবে না।

'একদিন দুপুরে এক সম্ভ্রান্ত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি যেন সম্মোহিত অবস্থায়। ঋষিকল্প চেহারার অতিথি দেখে তাঁকে আহার্য গ্রহণের জন্য বার-বাড়ির বৈঠকখানায় বসানো হল। তিনি অজু করার পর জোহরের নামাজ পড়লেন। তাঁর জন্য খাদ্যাদি পাঠানো হল।

'কিন্তু খাদ্য সামনে নিয়েও তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। খাদ্যগুলো তাঁর চোখে সোনার মতো ঝলমল করতে লাগল। রাজপুরুষের মতো অসাধারণ লাবণ্য ভরা চেহারার অতিথিটি খাদ্যগ্রহণ না করে নীরবে অশ্রুপাত করছেন শুনে বাড়ির বধূটি তাঁকে দেখার জন্য উঁকি মারতে এলো। তার দেওয়া খাদ্য খাচ্ছেন না কেন অতিথি?

'কে! বলে বধূটি চমকে উঠল। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এসে পায়ে জড়িয়ে ধরলো হজরত পীর বাবার। তিনি দেখলেন, নার্গিস বানু। তেমনি সুন্দরী, তেমনি লাবণ্যবতী হয়ে আছে এখনো। তিনি তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

'অনেক অত্যাচার করেও যে নার্গিসকে তার স্বামী সম্ভোগ করতে পারেনি, ধিক্কার করে তার একা থাকার মতো অবস্থায় রেখেছিল, তাকে আজ মুক্তি দিয়ে দিল। কেননা পীরবাবার যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ মূর্তি, তার সামনে এগোবার ক্ষমতা তার ছিল না। তার আরো দুটো বউ হয়েছিল। ছেলে-মেয়েও হয়েছিল কয়েকটি। তার বাবা শেষ পর্যন্ত অত্যাচার করতে নিষেধ করেছিলেন আত্মহত্যা করার ভয়ে। নার্গিস বানুকে এমত অবস্থায় আটকে

রেখে লাভ কী ?

'হজরত হোসেন দরগাই নার্গিস বানুর হাত ধরে মুসাফির বেশে হাঁটতে হাঁটতে অনেক মাজার তীর্থ ঘুরে শেষে বাংলাদেশে এসে এই ফুলগ্রামে আশ্রয় নেন। মানবকল্যাণে দুজন জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরা যখন মর্সিয়া, নাদ আর গজল গাইতেন মানুষ জমে যেত চারদিক থেকে।

'প্রবাদ আছে, বহু অন্ধ আতুর মানুষ পীরবাবার কাছে এলে তিনি তাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলোলেই তারা ব্যাধিমুক্ত হয়ে যেত।

'তাঁরা দুজনে একই দিনে একই সময়ে 'ইন্তেকাম' (মৃত্যু) বরণ করেন। দুজনেরই কবর আছে এখানে পাশাপাশি।'

গল্প শেষ হল যখন খাদেম আমিন সাহেবের, তখন 'সুবেহ্‌সাদেক' বা ঊষাকাল আরম্ভ হয়েছে।

আজান শোনার পর সহেলি আর আমি অজু করে এসে মাজারের বারান্দায় ফজরের নামাজ পড়লাম।

তারপর স্বর্গত দুই প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্দেশে ভক্তি-অবনত শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আবার মাঠের পথে নামলাম। সবুজ ঘাসে তখন শিশির মাখামাখি। সূর্যরশ্মিতে শিশিরের ফোঁটাগুলো হীরের দ্যুতি নিয়ে ঝলমল করছে।

সমুদ্রভৈরবী

তিরিশ বছর সমুদ্রের লোনাজলে ডুবে ডুবে আরিফ বুড়োর চোখ দুটো এখন পচা শামুকের মতন বেরিয়ে এসেছে—ক্রমাগত জল ঝরে। ছে-লম্বা কালো আবলুস চেহারার বুড়ো এখন তিনমাথা অবস্থায় বসে বসে ক্ষিধের জ্বালায় খুন্‌খুন্‌ করে কাঁদে। স্ত্রী আম্নাকে বলে, 'তুই আমাকে গলায় পা তুলে দিয়ে মেরে ফেল। এভাবে আর কষ্ট সহ্য করতে পারি না। দু-খুরি মদ এনে না দিলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে আজ ঝুলব।'

আম্না কোমরে কাপড় জড়িয়ে শুঁট্‌কি মাছের বস্তাটা রোদে নামিয়ে এনে মেলে দিতে দিতে বলে, 'তাই মরো, আপদ চুকে যাক।'

আরিফ বলে, 'রশীদ আমার ছেলে নাকি বাওয়া ডিম ? সে তো এখন জাপ্‌না দরিয়ার সবচেয়ে বড় ডুবুরী। দিনে তার একশো টাকা উপায়। টাকাগুলো কি সে এক রাতেই ফরসা করে দেয় ? পঞ্চাশ টাকা ওড়ালে পঞ্চাশ

টাকা দিলে তো সংসার চলে যায়। ওর মাথায় ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে তেড়ে দে। অমন ছেলে থাকার চেয়ে তাকে হাঙরে খাওয়া ভাল।'

ছুটে গিয়ে আন্না বুড়োর গলা টিপে ধরে। বলে, 'ছেলেকে হাঙরে খাবে, শাপ দিচ্ছ তুমি? সাত-আটজনের সংসারে পিণ্ডি চটকাবে কে, সে না দিলে?'

আন্নার হাতে কামড়ে দেয় আরিফ বুড়ো। দাঁত বসে যায়। আন্নাও নাকেকান্না শুরু করে।

রশীদ এসে পড়ে ঠিক সেই সময়ে। হাতে তার ঠোঙাভর্তি গরম পিঁয়াজী, মুড়ি, অন্য হাতে মদের বোতল। বুড়ো বাবার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিতে গেলে মা আন্না ছোঁ মেরে সব কেড়ে নেয়। বলে, 'হারামী বুড়োকে একদম দিবিনি রশীদ, এক্ষুনি তোর মরণ কামনা করছিল।'

ভাইবোনগুলো খাবার দেখে এসে জড়ো হয়। তাদের বখরা করে দেয় আন্না খাবারগুলো। বুড়োকেও দেয় একটা খোরায় করে ঠুকে বসিয়ে। মদের বোতলটা নিয়ে স্বামীর কাছে নিজেও খেতে বসে।

রশীদ ট্যাঁক থেকে পঁচিশটা টাকা মায়ের সামনে ফেলে দেয়।

মা আন্না বলে, 'এই কটা টাকা নিয়ে আমি কি করব? তিন কেজি চালের দাম কত? তারপর ডাল আনাজ মশলা-পাতি কিনতে হবে। তুই একশো টাকা রোজ কামাস—পঁচাত্তর টাকা তোর একরাতে ফুর্তি ওড়াতে ফুরিয়ে গেল?'

লাল কুঁচের মতো চোখ নিয়ে রশীদ বিরক্ত মেজাজে চিল্লে ওঠে, 'আর ঐ দশ টাকার যে খাবার আনলুম! কেন, ভাইয়েরা কিছু উপায় করে না? তুমি শুক্‌টি মাছ বেচে কিছু পাও না? আমি যদি সমুদ্রে শাঁখ তুলতে ডুবে আর না উঠি—হাঙরে খেয়ে ফেলে তো সংসার চলবে না?'

বুড়ো হাঁক মারে, 'চোপরাও সব। একদম কথা নয়। যা রশীদ, তুই ঘুমোতে যা বাপ। ঐ নিয়ে বাজার করুক। এই বুড়ীর কেবল টানাটানি। আসলে সংসার চালাতে জানে না—না-হয় টাকার হাঁড়ি পুঁতে রাখছে গোপনে।'

বুড়ী আন্না ছোট গেলাসের তিন গেলাস মদ গলায় ঢালার পর এবার খলখল করে হাসে। বলে, 'হাঁ হাঁ, আমার মেঝেয় পোঁতা জালার মধ্যে টাকা রেখে রেখে জমা টাকা একবুক হয়ে গেছে। তোমার মরার পর মানুষকে 'খানা' খাওয়াব।'

'তাই খাওয়াস! তুই আমার বড় পিয়ারের জিনিস। নইলে শালা কোনো মেয়ে ডুবুরীর ঘর করে!' বলতে বলতে লাঠি ধরে বুড়ো পা-মাপা-পথে রহমানের দোকানের দিকে চলে যায়।

নুলিয়াপাড়ার তামিল মুসলমানদের ঝোবড়া কুঁড়েঘর আর আর নারকেল গাছের ওপর দিয়ে একটানা সমুদ্রের ঝড়ো বাতাস বয়ে চলেছে। সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসার শব্দ শোনা যায়। পাড়ায় রাজ্যের মানুষের কলরব। পথের পাশে হাট-বাজারে লোকের কেনাকাটার ভিড়। চা-দোকানগুলোয় চা

যতটা না বিক্রি হয় তার চেয়ে ধেনো মদ বিক্রি হয় অনেক বেশি। মেয়ে-পুরুষ সবাই মদ খায় আর তুলকালাম করে ঝগড়া করে। কোনো মেয়ের আধবুড়ো স্বামী অন্য কোনো হাফ-গেরস্থ মেয়ের কাছে পাপোষ কারখানার রোজগার উড়িয়ে দিয়েও হয়নি, আবার ঘর থেকে থালা বাটি নিয়ে দিতে গেলে তার কাছা ধরে টানাটানি করে চেঁচিয়ে মুখখিস্তি করতে থাকলে লোক জমে যায়। রগড় দেখে তারা হেসে মরে।

আন্না চাল ডাল আলু তেল কিনে এনে ভাত বসায়। ঝোপজঙ্গল থেকেকাঠ-পাতা কুড়িয়ে এনে রেখেছে ছেলেমেয়েরা। সেগুলো জ্বালানী করে। ছোট ছেলেটি জাপ্‌না সারভিসের লঞ্চ ইস্টিমারের যাত্রীদের কাছে পয়সা চাইতে চলে যায়। দল দল কালো আদুল গায়ের কত ছেলে যায় সেখানে। যাত্রীরা তাদের পয়সা না দিয়ে আধুলি-সিকি-টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সমুদ্রে। অমনি তীরবেগে বাচ্চাগুলো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। এক মিনিট, দু মিনিট কেটে যায়। তারপর উঠে পড়ে। একটা ছেলের দাঁতে কামড়ানো টাকা বা আধুলিটা দেখা যায়। হিহি করে হাসছে সে। মেজো সেজো ছেলে ইস্টিমারের মোটঘাট বইতে যায়।

আন্না সেলেকচা শুক্‌টি মাছের তরকারী রাঁধে আলু দিয়ে ঝালকটকটে করে। আর মটর ডাল। ডাবা পচা চালের লালচে ভাত।

বেলা নটার সময় রশীদকে তুলে দিতে সে স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে ডুবুরীর কাজে চলে আসে।

সমুদ্রের তীরে ডুবুরীদের আখড়ায় নানান ডুবুরীর ভিড়। মদ খায় তারা মহাজনের পয়সায়। দামকাড় নেবার সময় তা হিসেব থেকে কাটা যাবে।

মহাজনরা রঙচঙে জামা পরে ছাতার তলায় মেয়েদের সঙ্গে বসে মস্করা করে। সমুদ্রের তীরে রাজ্যের নৌকো বাঁধা আছে। ডুবুরীদের নিয়ে যাবে বারদরিয়ায়।

রশীদের মহাজন আক্কাশ আলী তাকে বড় পেয়ার করে। বলে, 'রশীদ, তুমিই এখন হীরো! চারবার তোমার মত কেউ আর ডুবতে পারে না হে! তিনবারেই কালিয়ে যায়।'

হাসি দিয়ে পরমা যেন সম্বর্ধনা জানায় রশীদকে। পরমা দুরন্তযৌবনা খ্রীষ্টান মেয়ে। মহাজনদের মধ্যে তার ঘোরাঘুরি। লেখাপড়া-জানা ফরসা মেয়ে।

আক্কাশ আলী চোখের ইশারা করে রশীদকে। পরমাকে তার চাই কিনা জিজ্ঞেস করে।

রশীদ ঠোঁট উল্টে জানায়, তার তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই।

মহাজন বলেই ফেলল, 'রাহিলার বুনো যৌবন রশীদকে এখন পাগল করে রেখেছে, অন্যদিকে মন নেই। ডুবুরীর আবার শাশ্বত প্রেম! কথা দিয়েছে নাকি রাহিলা, তোমাকে বিয়ে করবে?'

'হাঁ, তাই তো বলেছে।'

পরমা বলল, 'ভাগ্যবান আপনি!'

রশীদ সমুদ্রে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলে। এক বোতল মদ খেয়ে নিলে সে চানাচুর বাদাম চিবোতে চিবোতে। লাল জাঙ্গিয়া পরনে তার। কোমরে খাপে গোঁজা একটা খঞ্জর। গোটা শরীর মজবুত, পেশীবহুল, একেবারে উদোম। পরমা তিল তিল করে ওকে দেখে।

ফ্রেঞ্চকাট কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে চশমা চোখে মহাজন আক্কাশ আলী হাতের ঘড়ি ধরে হাঁক মারে, 'সাড়ে ন-টা বাজল, মাঝিরা চলে যাও।'

ডুবুরীরা পাঁচজন নাইলনের জালতি ব্যাগ কোমরে গুঁজে নিয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল। তীরের বেলাভূমি পার হয়ে গিয়ে লাল নিশানঅলা নৌকোয় গিয়ে উঠে পড়লে দাঁড়ি-মাঝিরা হৈ মেরে বদর গাজির জয়ধ্বনি করে যাত্রা শুরু করল।

দূরের ইস্টিমার ঘাটায় তখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। শ্রীলঙ্কায় জাপুনা সারভিস চলে যাচ্ছে।

উত্তাল তরঙ্গ টপকে দোল খেতে খেতে নৌকোগুলো বার সমুদ্রের দিকে চলে আসে। দূরের বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ের দাপাদাপি তীরের চাইতে অনেকটা কম।

ঠিক জায়গায় এসে নৌকোর বহরগুলো দাঁড়ায়। নজর করে। জল এখানে মাইল দুয়েক গভীর।

ডুবুরী রশীদ বলির পাঁঠার মতো যেন হাড়িকাঠে গলা দেয়। ভারীযাঁতার ওপরে বসে বোর করে লাগানো শিকল ধরে চোখ বন্ধ করে ইষ্টনাম জপ করে। পাঁচজন দাঁড়িমাঝি তাকে যাঁতাসমেত তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জল ছিটকে রুপোর দানার মতো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। একটা আবর্ত ঘুরতে থাকে। শিকল হুড়হুড় করে নেমে যায়।

মাঝি তার হাতের চুনের ডিবের মতো ঘড়িটার কাঁটা দেখে।

রশীদ চোখ বন্ধ করে নেমে যায়। চোখ চাইলে লোনাজল লেগে জ্বালা করে। মাটিতে পড়ার পর একবার চেয়ে দেখে। আকাশ অন্ধকার। দূরে দূরে আলোকবিন্দুর মতো তারা মাছ। কোনো কোনো বড় মাছের চোখ জ্বলছে। ওসব দেখার সময় নেই এখন। রশীদ মাটিতে হাত-পা দিয়ে হাতড়াতে থাকে। শাঁক ঠেকলেই তা পিঠের ওপরের জালতি ঝোলার মধ্যে রেখে দেয়। দ্রুতহাতে শাঁখ কুড়োতে থাকে। দম পুরে ভাসতে থাকে। থেকে থেকে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যদি অক্টোপাশ ধরে তার আটটা বাহু জড়িয়ে, খঞ্জর দিয়ে কেটে ফেলে মুক্ত হতে হবে। বাঁ হাত বা পা থেকে যেন শিকল ছেড়ে না যায়। কড়ি শাঁখ যা পাওয়া যায় তুলে নেয়। ঝিনুক তোলা নিষেধ। সরকার তার মধ্যে বালুকণা ঢুকিয়ে দিয়ে নকল মুক্তা তৈরি করার জন্যে ফেলে দিয়েছে। হঠাৎ যদি হাঙর এসে তার পেটে কামড় দিয়ে নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে নেয়! চোখ মেলেই বন্ধ করে নেয় রশীদ। অন্য সভ্য দেশের ফিল্মে ডুবুরীদের পিঠে অক্সিজেন পাইপ আর হাতে-পায়ে পাখনা বাঁধা থাকতে দেখেছে সে।

ভুড়ভুড় করে বুদবুদ ছাড়ে। যতক্ষণ ইচ্ছা ডুবে থাকতে পারে। তাদের চোখও আঁটা থাকে দূরবীনের পরকোলায়। হাতে থাকে যান্ত্রিক অস্ত্র।

ভারতের মতো দরিদ্র দেশের নুলিয়ারা এলোচোখে এলোগায়ে বিনা অক্সিজেনে হাতে-পায়ে পাখনা না বেঁধেই নেমে যায় গভীর সমুদ্রের তলায়। কেননা মানুষ এখানে অনেক বেশি। জীবনের দামও কানাকড়ি মূল্যের।

মহাজন আক্কাশ আলীর গদিতে রশীদ এখন একশো পনেরো নম্বরের ডুবুরী। অনেকেই মরে গেছে দম ছুটে, নয়তো বা হাঙর, অক্টোপাশ, জলহস্তী, সিন্ধুঘোটক, তিমি, শুশুকের আক্রমণে। কেউ কেউ ভাগ্যবলে বেঁচে আছে। হাঁপানী রোগে পড়ে, চোখের পচা গোলকে জল ঝরিয়ে রশীদের বাপ আরিফের মতো বাতিল বুড়ো হয়ে পড়ে আছে। তাদের না আছে পেনসন, না আছে বেঁচে থাকার আশ্বাস।

দম শেষ হয়ে গেলে রশীদ জোরে শিকলে ঝোনা মারে। গড়গড় করে শিকল উঠতে থাকে। নামতে আড়াই মিনিট, উঠতে আড়াই মিনিট—পাঁচ মিনিট—আর তিন মিনিটে যতটা মাল তুলতে পারো। আট মিনিট দম রাখা কি সহজ?

সাধারণ মানুষ মাত্র আধ মিনিট দম রাখতে পারে। ছোট ভাইরা যেমন টাকাপয়সা কুড়োতে গিয়ে জলের তলায় জাপানা সারভিসে দু মিনিট থাকার অভ্যাস করে, রশীদও আট-দশ বছর সেইরকম করেছে।

ছ মিনিটের বেশি এখন কোনো ডুবুরীই জলের তলায় থাকতে পারে না। রশীদ একাই হীরো এখন। দুশো ডুবুরী কাজ করছে দরিয়ায়। প্রায়ই তাদের মধ্যে এক-আধজন মরে বা খোয়া যায়। আসে নতুন ডুবুরী। শরীর খারাপ হলে বদলি ডুবুরী আছে। মাল বিবেচনায় টাকা।

রশীদকে ওপরে তোলা হলে অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়ে ফেলার আগে শাঁখের ঝোলা খুলে নেওয়া হয়। তার শরীরে চাপ দিয়ে বিশেষ কায়দায় ঘুরিয়ে বসিয়ে পেট চেপে লোনাজল বার করে উপুড় করে ফেলে রাখা হয়। অন্য ডুবুরীরা কাজ করে।

অজ্ঞান অবস্থায় মরার মতো পড়ে থাকে রশীদ। পাশাপাশি নৌকোর অন্য সব ডুবুরীদেরও একই অবস্থা। কেউ টেঁসে গেলে নৌকো ফেরত চলে যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে পিঠে চাপড় মেরে মেরে জাগিয়ে তুলে বসানো হলে রশীদ তলিয়ে যাওয়া সমুদ্রের তলার অন্ধকার থেকে হঠাৎ যেন পৃথিবীর আলো-বাতাসে বুদবুদের মতো জন্মলাভ করে। চোখ খুলে তাকায় সে। মাথা ঘুরছে তার। গলার ভেতর জ্বালা করছে। হঠাৎ একটা দমকা বমি হয়ে যায়।

পেটে তার আর কিছু নেই! খেয়ে আসাই বৃথা। ভুট্টার খই বা শুকনো মুড়ি খেতে খেতে একটু একটু করে মদ খায় রশীদ। আস্তে আস্তে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

দু ঘণ্টা পরে আবার তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার আট মিনিট পরে টেনে

তোলা হয়। আবার অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে।

দুবারের পর ঘণ্টাতিনেক বিশ্রাম। মালিকের দেওয়া বিনা পয়সার হালুয়া রুটি, দোসা অথবা নারকেলকোরা লুচি খেতে পায়। এক বোতল মদ টানে। দশটায়, বারোটায়, পরে তিনটের সময় আবার সমুদ্রের গভীর তলদেশে নামে।

চতুর্থবার বেলা পাঁচটার সময়। তারপর নৌকোর বহরগুলো ফিরতে আরম্ভ করে। খবর রটে যায় কোন্ নৌকোয় কোন্ মহাজনের কোন্ ডুবুরীর আর জ্ঞান ফেরেনি তৃতীয় বার ডোবার পর।

সবাইকে মহাজন কাগজে সই করিয়ে রেখেছে ঃ 'আমার মৃত্যুর জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।' যে মারা যায় তার আত্মীয়স্বজনরা কান্নাকাটি করতে করতে নিয়ে চলে যায়। কবর দিয়ে দেয়।

মহাজন শ্যাওলা-ঢাকা শাঁখ-কড়িগুলোকে বস্তা ভরে গাড়িতে করে নিজের বা ভাড়াটে কবরখানার মাটির মধ্যে পোঁতার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। তিন মাস পুঁতে রাখার কথা। শাঁস পচে গলে যাবে। ভাড়াটে কবরখানায় অতদিনও রাখে না। তাই পচা দুর্গন্ধ থাকে। তারপর ঔষধিজলে পরিষ্কার করে গোটা তামিলনাড়ু অঞ্চলের একমাত্র শাঁখ ব্যবসায়ী আবদুর রহমান অ্যান্ড কোম্পানীকে বেচে দেওয়া হয়। তিনি এজেন্টদের অর্ডার মতো জাহাজে করে নানান বন্দর শহরে চালান করেন। কলকাতা শাঁখের একটা বড় আড়ত।

শাঁখ-কড়ির একচেটিয়া ব্যবসা মাদ্রাজী নুলিয়া মুসলমানদের। শাঁখারীদের হাত থেকে তা ব্যবহারের জন্য কিনে নিয়ে যায় হিন্দুরা।

সন্ধ্যার পর সমুদ্রতীরের ডুবুরী-আখড়ায় আমোদ-ফুর্তির নিত্য আয়োজন। এখানে সেখানে অল্প আলোর মধ্যে রঙ্গিনীরা ঘোরাঘুরি করে। মহাজন রোজকার পাওনাকড়ি মিটিয়ে দিলে ডুবুরীদের কাছ থেকে সেই টাকা কেমন করে হাতাতে পারবে মেয়েদের সেই ধান্ধা। ঠোঁটে তাদের লালসার রঙ। নাভি বার করা উদর। বুকের লজ্জা আটকে রাখে অতি স্বচ্ছ স্বল্পবাস রক্ষাবরনীতে। যাকে যার পসন্দ, ডুবুরীরা হাত ধরে নিয়ে নারকেল-কুঞ্জের আলোআঁধারির মধ্যে চলে যায়। সমুদ্রবেলায় পড়ে থাকে। কলকাতার মতো বাড়তি উপায়কারী পুলিস বা তাদের দালালদের উৎপাত নেই। কারণ ডুবুরীদের জীবনটা খুবই ছোট আর দুঃখের। তাদের অবাধে ফুর্তি করতে দিতে হবে যে ক'দিন বাঁচে। মহাজনরা তাদের কিছু বলতে দেয় না।

রশীদ একশোটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে শীস্ দিতে দিতে গিয়ে দোকান থেকে মদের দুটো বোতল আর মাংস বাদাম ছোলা চানাচুর পটেটো-চিপ্স লেবু কিনে নেয়। অনেক মেয়ে তার সঙ্গ পাবার জন্যে এগিয়ে আসে। কোমরের ধাক্কা মেরে রঙ্গ করে তাদের সরিয়ে দেয় রশীদ। রাহিলা এলে তারা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে নারকেল-কুঞ্জের মধ্যে চলে আসে। সমুদ্রতীরের বাতিঘর থেকে আলো ছিটকে এসে পড়ে।

চাঁদের আলোয় পৃথিবী ভাসে। মাতাল বাতাস নারকেল পাতার চাঁচর চুলের গোছা দোলায়।

নারকেল-কুঞ্জের পাশে ভাঙা একটা চাতালে রশীদ রাহিলার কোলে মাথা রেখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। তার যৌবনের বনে পাগলা ঘোড়ার মতো উন্দাম হয়ে উঠলে রাহিলা সুযোগমতো টাকাগুলোর যতটা পারে আত্মসাৎ করে।

রশীদ বলে, 'রাহিলা, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে চাই না। তুমি আমার স্বর্গ—তুমি আমার নরক।'

'নরক বলছ কেন?'

'বলব না! যতদিন তুমি বিয়ে না করো, বলব। আমি পাপী নই। তোমার মূল্য আদায় করে দিই। তাহলে তুমি কি বলো?'

কথার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে রাহিলা বলে, 'তোমার মা দেখা হলেই মুখ ভ্যাংচায়। থুথু ফেলে। লাথি দেখায়। গালাগালি করে।'

'করবেই তো। আমার মায়ের মতো তোমার সাহস হবে? আমার বাপও তো আমার মতো একজন সেরা ডুবুরী ছিল। সব মেয়ে ভয় পেলেও মা কপাল ঠুকে তাকে বিয়ে করেছিল। তার বাপ তাকে মেরেপিটে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কেননা মেয়ের স্বারা আর উপায় হবে না। তুমিও তোমার বাপ কমবক্ত, খোঁড়া আলীমদ্দির সংসার চালাচ্ছ।'

'এই আমার বাপকে গাল দেবে না।'

'ঠিক আছে, একদিন তোমার বাপকে বস্তায় মুড়েসুড়ে এনে দরিয়ায় ফেলে দোব। নাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না। তোমার বাপ তো মদ বা শুক্‌টিমাছ বিক্রি করতে পরে। তা ছাড়া তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করে প্রেমব্যবসা করে বাপের সংসার চালাতে চাও, তাহলে একজনের কাছে আটকে থেকো না। যৌবন পাঁচ বছরের ফুল, নানান দেবতার পূজায় লাগাও।'

'আজকে খুব সিরিয়াস কথা বলছ!' মদ ঢেলে দিল রাহিলা। খেলে না রশীদ। বললে, 'তুমি খাও। আমাকে মাতাল বানিয়ে লুঠ করো না। প্লিজ! আমি বাড়ি যাব। আমার বাপ খিদেয় কাঁদে!...'

উঠে পড়ল রশীদ। বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাহিলা, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে তোমাকে ছোঁব না আর। জানো, সমুদ্রে যখন ডুবি তখন শুধু তোমার মুখটার কথাই ভাবি। তোমার চোখ দুটোই পিদিমের মতো জ্বলতে থাকে মনের মধ্যে। হাঙরে যদি খেয়ে নেয়, তোমার নাম ধরেই ডাকব—রাহিলা আমি চলে যাচ্ছি—'

দৌড়তে থাকল রশীদ।

রাহিলা দাঁড়িয়ে থাকে। মদের বোতল গেলাস পড়ে আছে। রশীদ কি পাগল হয়ে গেল! তার পিছনে পিছনে ছোটাও ভাল দেখায় না। আজ মাত্র পঁচিশ টাকা হাতাতে পেরেছে সে।

রাহিলা বোতল গেলাস দোকানে জমা দিতে চলে আসে। তাকে ইসারা

করে মহাজনরা পর্যন্ত ডাক দেয়।

মহাজন আক্কাশ আলী বলে, 'রাহিলার গায়ের রঙ তামাটে হলে কি হবে, ওর চেহারায় একটা আর্ট আছে।'

রাহিলা সোজা বাড়িতে চলে এলে তার খোঁড়া বাপ আলীমদ্দি বলে, 'কিরে খুকি, এখনি যে চলে এলি?'

লাউ বাগার দেবার মতো গদগদ করে ওঠে রাহিলা, 'রশীদ বিয়ে করতে চায়, নইলে আর মিশবে না বলেছে।'

'বিয়ে করবে ডুবুরীর পো! ছো! দুদিন বাদেই 'কোড়ে-রাঁড়ি' হবি তুই!'

মাও বলল, 'খবদ্দার! ও-পথে যাবি না। ও না মেশে, আর ডুবুরী নেই?'

'তোমরা আমাকে নিয়ে ব্যবসা করতে চাও? আমি রশীদকে বিয়েই করব।' বিরক্ত মেজাজে দৃঢ় স্বরে বলল রাহিলা।

আলীমদ্দি হাঁক মারল, 'তাহলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা তুই। খাইয়ে-ধুইয়ে মানুষ করলে কে? আকাশ থেকে পড়ে মানুষ হইচিস? তোর মুখ আর দেখব না। ছোট ছোট ভাইবোনগুলো কি খেয়ে বাঁচবে, ভাবিস তাদের কথা?'

রাহিলাও জ্বলে উঠল, বলল, 'পায়ে যাঁতা পড়ে খোঁড়া হয়ে যাবার পর আমার ভরসায় কি তাদের এই পৃথিবীতে এনেছিলে তুমি?'

'আল্লা দিয়েছে, আমি আনার কে?'

'তাহলে আল্লার ভরসায় থাকো—আমি চললাম।'

রাহিলা মাঝরাত্রেই পাগলের মতো ছুটতে লাগল। তার পর মা বেরিয়ে এলো। ডাকল, 'রাহিলা, ফিরে আয় মা, আগুনে ঝাঁপ দিস না।'...

রাহিলা আবার সমুদ্রতীরের নারকেল-কুঞ্জের মধ্যে এসে বসল। একা। ভাবতে লাগল। দু-একজন মাতাল তার কাছে টোপ ফেলতে এলে সে ভাগিয়ে দিলে।

সমুদ্রের গর্জন শুনতে লাগল। বিস্তীর্ণ সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো পড়েছে। সাদা ফেনাগুলো পাক খেতে খেতে ভেসে চলেছে।

রশীদকে ভালবাসে সে। তার প্রতিটি হাসি, কথা, দেহভঙ্গি, রমণীয় আচরণ সবই সে অমৃতের মতো চেখে চেখে অনুভব করে তৃপ্তি পায়। যদি দুর্ভাগ্য নেমে আসে, সে বহন করবে। তার একটা সন্তান যদি গর্ভে আসে, মানুষ করে তুলবে। তাকে লেখাপড়া শেখাবে। ডুবুরী হতে দেবে না।

ভূতে পাওয়ার মতো একসময় সে রশীদদের নারকেলপাতা-ছাওয়া ছোবড়া কুঁড়েঘরটার কাছে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা কপাটের কড়া নাড়ে।

রশীদের মা আম্মা এসে দোর খোলে। রাহিলাকে দেখে জ্বলে ওঠে। বলে, 'রাক্ষসী, দূর হ তুই! আমার ছেলেকে চুষে চুষে শেষ করবি বলে এসেছিস ঘর থেকে ফুসলে নিয়ে যেতে?'

শান্ত গলায় রাহিলা বলল, 'না মা, আমি তোমার মতোই এই বাড়ির বউ

হয়ে চিরকাল থাকতে এসেছি।'

'থাকবি তুই ! সাহস আছে তোর ! আয় আয় ! ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না মা—রশীদকে ডাকব আমি ?'

'না মা, সে যদি ঘুমোয়, থাক—আর ডেকো না। আমি তোমার কাছেই থাকব আজ।'

'ঠিক আছে। কালই আমি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করব।'

বিয়ের দিন আর সমুদ্রে গেল না রশীদ। আজ তার মহা আনন্দের দিন। সে কথা দিল খোঁড়া শ্বশুরের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করবে। মণ চারেক শুকুটি মাছ ধরে এনে শাশুড়িকে ব্যবসা করতে দেবে।

কতদিন মিশেছে রশীদ রাহিলার সঙ্গে, কিন্তু ফুলশয্যার রাতের মতো এমন করে কখনো তো পায়নি তাকে !

রাহিলা যেন প্রেমের দরিয়া ! তাতে ডুবে মরেও সুখ আছে।

পরদিন সকালে মা আম্মা যত্ন করে শুকুটি মাছের তরকারী, ডাল, মাংস, রসম্, ভাত খাইয়ে বিদায় দিতে রাহিলা বললে, 'তুমি যেও না সমুদ্রে ! এই—ব্যবসা করবে ?'

'টাকা কোথায় ? তাছাড়া হিসেব, ব্যবসা আমার মাথায় আসে না। টাকা আছে তোমার কাছে ?'

'আমার কাছে কোথা ? সরকারী কর্জ নেবে !'

'ধুষ্ শালা ! ঋণ করে ফেল মারলে ?'

রাহিলার মুখ যেন গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাল টিপে দিয়ে আনন্দে যেন উড়তে উড়তে ডুবুরী-আখড়ায় এসে পৌঁছল রশীদ। আজ আর সে আদৌ মদ খেলে না।

মহাজন অবাক ! বলল, 'শক্ত কাজ রশীদ মিয়া। পর্বত আরোহণের মতো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত কাজ হল নুলিয়া ডুবুরীর। কোনো দেশের লোকই এ কাজ পারে না। মদ না খেয়ে পারবে ? সব কিছু ভুলে থাকতে হয়।'

'মরলে আমি সজ্ঞানেই মরব। আমি ভুলতে চাই না। বিশেষ করে আমার নতুন স্ত্রী রাহিলার মুখটা !'

নৌকো চলে গেল মাঝ-দরিয়ায়। পুবের আকাশে তখন সূর্য।

সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রশীদ। নতুন অভিজ্ঞতা, নেশা না করেই সে অন্ধকার সমুদ্রের তলায় নেমে এসে মাটিতে দাঁড়িয়ে চোখ মেলল। দুটো অগ্নিগোলক জ্বলতে দেখল বেশ খানিকটা দূরে। আলো দুটো এক হাত পাশাপাশি সমান্তরালে আছে। দূরত্বটা কত দূর ? দুশো গজ হবে ? নাকি আরো দূরে ?

দ্রুত হাতে শাঁখ তুলতে থাকে রশীদ। এগিয়ে আসছে আলো দুটো। শাঁখের ঝোলাটা বাঁ হাতে খুলে নেয় পিঠ থেকে। খঞ্জরটা ডান হাতে বাগিয়ে

ধরে। ঘাঁতার শিকলে পা জড়ানো। আলোটা এগিয়ে আসছে সোজাসুজি। বড় কোনো প্রাণীর চোখ। লক্ষ্যবস্তু সে-ই। শাঁখ তোলা বন্ধ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বারেক আজ নেশা করেনি। নেশা করলে আচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বন্ধ করে গোঁয়ারের মতো কেবল মাটি হাতড়াতো শাঁখ খোঁজার জন্যে।

আলো দুটো একেবারে কাছে এগিয়ে আসতেই রশীদ বুঝতে পারল হাঙর এসেছে। মস্তবড় প্রাণী। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটছে!

রাহিলার হাসিভরা মুখটা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল বাপের বিকৃত চোখমুখটা। শিকলে টান মারল না সে। তুলতে দেরি হবে।

হাঙরটা সামনে এসে এক নিমেষ দাঁড়িয়েই হাঁ করে তাকে ধরতে যেতে বাঁ হাতের শাঁখের ঝোলাটা এগিয়ে দিতেই এক ঝোনা মেরে কেড়ে নিল। কেবল একটা সাদাটে দীর্ঘ অবয়ব আর চোখের জ্যোতির্ময় অগ্নিগোলক!

হাতটা জ্বলে উঠল তার।

অত্যন্ত দ্রুত শিকল ধরে যেন বিদ্যুৎবেগে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হল তার বুঝি অর্ধেক শরীরটাই নেই।

নৌকোয় হাত ঠেকতে সে চকিতে উঠে পড়েই আছাড় খেয়ে পড়ল। তার বাঁ হাতটায় আরো তীব্র জ্বালা জেগে উঠল। চোখ মেলে দেখল, আঙুলগুলো থাকলেও ওপরের চামড়া নেই, রক্ত ঝরে পড়ছে।

তীব্র জ্বালায় কাতরাতে থাকে রশীদ। বলে, 'বিরাট হাঙর। আমাকে নিয়েছিল একটু হলে। শাঁখের ঝোলাটা নিয়ে গেছে। উঃ, কী ভীষণ জ্বালা!'

হাতটা বেঁধে দিতে থাকল মাঝি হরমুজ চাচা।

রশীদ বলল, 'চলো, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চলো। হাঙরের বত্রিশ-পাটি দাঁতের চিরুনিতে আঁচড় লেগে হাতের চামড়াটা চলে গেছে। আর জীবনে ডুবুরীর কাজ করব না। ভিক্ষে করতে হয় তাও ভাল।'

সমুদ্রের নীচে বড় হাঙর এসেছে জেনে সমস্ত ডুবুরীকে তুলে মাঝিরা নৌকো নিয়ে চলে এলো ডুবুরীর আখড়ায়।

বিনা উপায়েই বাড়ি ফিরে এলো রশীদ। তার হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখে রাহিলা, আম্মা, বাবা, ভাইবোনরা সবাই বলল, আর সমুদ্রের ডুবুরী হয়ে দিনে একশো টাকা উপায় করতে যেতে হবে না।'

মা আম্মা ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বারেক পালিয়ে আসতে পারলি বাবা, নইলে আমাদের কি হত!'

রাহিলাও কাঁদছে খুঁটি ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাপও বলল, 'ঝাঁটা মার শালা ঐ ডুবুরীর কাজের মাথায়! তুই আর সমুদ্রের তলায় নামিস না!'

রশীদ বলল, 'কিন্তু সংসার চলবে কি করে?'

মেজো ভাই হানিফ বলল, 'আমি যাব ডুবুরীর কাজ করতে—শুকুটি মাছ বেচে কি সংসার চলবে?'

রাহিলা বলল, 'কাউকে ডুবুরীর কাজ করতে যেতে হবে না। কাল সকাল হলে আল্লার ইচ্ছায় আমাদের একটা ব্যবস্থা হবেই। আসমান থেকে আল্লার ফেরেস্তা সুসংবাদ নিয়ে আসবে।'

রাহিলার কথার অর্থ কেউ কিছু বুঝল না। রাত্রে রশীদকেও কিছু বলল না রাহিলা। পরদিন সকালে একটু বেলা হতে স্নান করে এসে ভাল শাড়ি ব্লাউজ জুতো পরে রাহিলা রশীদকে জামা প্যাণ্ট পরিয়ে নিয়ে কিছু-দূরের পোস্ট অফিসে এলো। সবে তখন পোস্ট অফিস খুলেছে। মাস্টার-মশায় বললেন, 'কি রাহিলা মায়ি, টাকা জমা দেবে নাকি ?'

রাহিলা বলল, 'না চাচাজী, টাকা তুলব। কত টাকা হয়েছে দেখুন তো ?'

'কেন, তোমার কাছে তো টাকা জমার বই আছে।'

'সেটা বাপের বাড়ি আছে, সেখানে আমি যেতে পারব না। দেখুন না, কতটা হয়েছে।'

জমার খাতা দেখলেন পোস্টমাস্টার। বললেন, 'বেশি নয়, সুদে-আসলে সাড়ে ছত্রিশ হাজার হয়েছে। রোজ দশ টাকা করে জমা দিয়েছ কয়েক বছর ধরে।'

রশীদ বলল, 'সাড়ে ছত্রিশ হাজার টাকা !'

রাহিলা হাসতে হাসতে বলল, 'সবই তোমার টাকা। দশ টাকা করে রেখে দিতাম রোজ। সপ্তায় একবার জমা দিয়ে যেতাম। যাকগে, চাচাজী, এই টাকাগুলো আমি তুলে নিতে চাই। আমরা একটা নৌকো আর জাল কিনব। এই ডুবুরীকে আমি বিয়ে করেছি। সমুদ্রে ভাইদের নিয়ে মাছ ধরবে। ডুবুরীর কাজ আর করবে না। হাঙরের হাত থেকে কাল ভারি বেঁচে গেছে। দেখুন না হাতটা !'

'তাই তো হে ! তাহলে দরখাস্ত দাও, নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। পাসবইটা আনবে এক সপ্তাহ বাদে। বড় পোস্ট অফিসে জানিয়ে টাকা এনে রাখব। তদ্দিন নৌকো জাল দেখে ঠিক করো। কত টাকা লাগবে আন্দাজমতো এখন জানিয়ে যাও। সব টাকা তোলার দরকার নেই।'

সাড়ে তিরিশ হাজার টাকা তোলার দরখাস্ত দিয়ে চলে এলো রশীদ আর রাহিলা।

ফেরার সময় রাহিলা রশীদকে নিয়ে গেল তার বাপের বাড়িতে। ভাগ্যি ভাল আলীমদ্দি তখন ছিল না। রাহিলার মা তাদের বসতে দিল। সরবৎ করে দিল জামাইকে। যে খাবার তারা ভাইবোনদের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল তা থেকে নাস্তা দিলে। মাকে রাহিলা জানাল হাঙরের আক্রমণের কথা। মা শুনে আতঙ্কিত হল। ডুবুরীর কাজ ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরার কাজ করবে শুনে আশ্বস্ত হল।

মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তোরঙ্গ খুলে তার কাপড়-চোপড় নেবার নাম করে পাসবইটা বার করে নিয়ে নিলে রাহিলা। বাবা মা মূর্খ লোক—তার যে পাসবইয়ে এত টাকা আছে তারা জানত না। রাহিলা বলেওনি কোনোদিন।

বইটাতে নাকি ডাক্তার তাকে যেসব ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দিতেন—যাতে মা হয়ে না যায়—সে সব নাকি লেখা থাকত।

শাশুড়ির হাতে গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে চলে এলো রশীদ।

সে মদ খাওয়া আর ডুবুরীর কাজ ছেড়ে বেকার হয়ে কদিন কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাজনরা জিজ্ঞেস করতে বলল, 'আমাকে ভূতে ধরেছে। ওঝা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মহাজন আক্কাশ আলী অনেক গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে সে বলল, 'তোমার মরা ডুবুরীর খাতায় আমার নাম আর উঠল না বলে আফসোস হচ্ছে জানি, কিন্তু ভালই যদি আমাকে বাসো মহাজন চাচা, তাহলে একখানা নৌকো বেচে দাও—আমি নগদ দামে কিনে নেবো।'

'এত টাকা আছে তোর! জানিস একখানা নৌকোর কত দাম?'

'কত?

'কুড়ি হাজার টাকা। এ কি নদীর দশ-বারো-পদী খিলে নৌকো বাপধন! সমুদ্রে-বাওয়া কুড়ি-পঁচিশ-পদী গহনার নৌকো। পাকা লোহা কাঠের তৈরি।'

'নতুন মাল হবে?'

'হাঁ, তা হবে। একখানা নামছে কারখানা থেকে। আমার নেবার কথা আছে আঠারো হাজার টাকায়। দু-হাজার লাভ দিতে হবে।'

'এক হাজার লাভ নাও।'

মাথা নাড়তে লাগল আক্কাশ আলী। সে রাজী নয়।

রশীদ বলল, 'ঠিক আছে, নেবো আমি।'

'টাকা দে।'

'আগে মাল আনো। লেখাপড়া হোক। টাকা দিই কিনা দেখবে।'

'তাই হবে। পাঁচদিন পরে আসিস।'

দিনের দিন হানিফ, আজাদ দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রশীদ রাহিলার পোস্ট অফিসে গেল।

তিরিশ হাজার পাঁচশ টাকা তুলে নিয়ে তারা রিকশায় করে বাড়ি ফিরে এলো। পাঁচশো টাকার চাল বাজারহাট কিনতে দিলে রশীদ।

তারপর নতুন নৌকো ঘাটে দেখে এসে কুড়ি হাজার টাকা আর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মহাজনের সঙ্গে লেখাপড়া করে নৌকোটা কিনে নিল। জাল কিনলে দুখানা চার হাজার করে আট হাজার টাকায়।

দাঁড়িমাঝি জোটাল রশীদ। জাল ফেলার কাজ তারা জানে না। কিছু-দিন তাদের রেখে শিখে নেবে তারা তিন-চার ভাই। বাড়ির কাছাকাছি ঘাটে নোঙর করা নৌকোটাকে দেখে এলো সকলে। আরিফ বুড়োও হাত দিয়ে দিয়ে দেখল নৌকোটা।

রাহিলাকে যেন সবাই পুজো করতে আরম্ভ করল।

প্রথম দিন বিকালে যখন দরিয়ার পাঁচ পীর হাঁক দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে গেল তিন ভাই ভাড়াটে চারজন দাঁড়িমাঝি সঙ্গে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইল রাহিলা।

তার চুল আর লাল শাড়ি উড়তে লাগল সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায়। বহু দূরে থেকে রশীদ তাকে দেখতে লাগল। তার পর কালো বিন্দুতে হারিয়ে গেল।

সারারাত মাছ ধরার পর সকালে যখন তারা তীরে ফিরে এসে মাছ তুলল, মহাজন আক্কাশ আলী অবাক।

এত মাছ পড়েছে রশীদের নৌকোয়!

পাঙাশ, কইভোল, পমফ্রেট, ম্যাগরেল, চেলা, শিমুল, লোটাঘাগর, আড়ট্যাংরা। দুই কুইণ্টল কুড়ি কেজি মাছ পাইকেররা নগদ দাম মিটিয়ে দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে কিনে নিয়ে চলে যায়।

নৌকো ধুয়ে জাল শুকোতে দিলে তিন ভাই। দাঁড়িমাঝিরা নগদ টাকা নিয়ে চলে গেল। রাত্রে আবার জালে যাবে তারা। নৌকোয় রইল রশীদের চতুর্থ ভাই আজিম। বয়স তার বারো।

রশীদ বাড়িতে ফিরে টাকাগুলো রাহিলার হাতে দিয়ে দিলে। দু হাজার টাকার মাছ—দশ টাকায় এক কেজি দু কুইণ্টালের পাইকিরি দাম। কুড়ি কেজির দুশো টাকায় দিয়েছে মাঝির চল্লিশ টাকা, দাঁড়ি তিনজনের তিরিশ টাকা করে নব্বই টাকা। থাকে সত্তর টাকা।

সেই সত্তর টাকায় শাশুড়ির শাড়ি আর শ্বশুরের লুঙ্গি কিনতে দিলে রাহিলা। দু হাজার টাকা হাতে ছিল—আর দু হাজার এলো। চার হাজার টাকা নিয়ে পোস্ট অফিসে যাবার সময় দশটা টাকা রাহিলা তার বাপকে দিয়ে আসতে গেল। রোজ সে দশ টাকা বাপকে দেবে জানাতে বাপ আর কিছু বললে না।

টাকা জমা দিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে রশীদ। দেওর দুজনও ঘুমে একেবারে কাদা।

শাশুড়ির সঙ্গে রান্না করতে বসল রাহিলা। বড় একটা পাঙাশ এনেছিল রশীদ। শাশুড়ি তা রাঁধছে।

ভাজা মাছের গন্ধ পেয়ে রশীদ জেগে উঠে রান্নাঘরে এসে বসল। ভাজা মাছ খেতে দিল তাকে তার মা। বুড়ো বাপটাও ভাজা মাছ চিবোচ্ছে দাবায় বসে মদ খেতে খেতে। চোখে তার জল ঝরছে। গালাগালি করছে মহাজনকে। বিড়বিড় করে বকে কেবল বুড়ো।

বোন দুটো মাছ চেয়ে নিয়ে গিয়ে খেতে খেতে এ ওকে ভেংচি কাটে। ঝগড়া করে ইসারায়। রাহিলা দেখে খুব আমোদ পায়। দেখায় রশীদকে।

আকাশ ডেকে ওঠে হঠাৎ মাঝদুপুরে। দুরন্ত মেঘ ভেসে আসছে। ঝড় উঠবে বোধ হয় এখনি।

নৌকো-জালের ভাবনা এখন রশীদের।

প্রচণ্ড ঝড়ে নোঙর ছিঁড়ে সমুদ্রে বেরিয়ে গিয়ে ডুবে যাবে না তো নৌকো? জালগুলো হেপাজত করা দরকার।

ঝড় উঠতে তিন ভাই ছুটল ডুবুরী-ঘাটের দিকে। নোঙ্গর তুলে চার ভাই নৌকোকে জোয়ার ওঠা সরু নদীর মোহনার ভেতরে এনে নারকেল গাছের গোড়ায় ডবল কাছি দিয়ে বেঁধে রাখল।

বৃষ্টি নামল মুষলধারে। টোঙের মধ্যে জাল গুছিয়ে রেখে বৃষ্টি ঝড় থামার অপেক্ষায় চার ভাই বসে রইল।

হানিফ বলল, 'একদিনে দু হাজার টাকা উপায় দাদা!'

রশীদ বলল, 'ভেবে দেখ যাদের দশখানা নৌকো খাটছে, দিনে তাদের কত উপায়! দেখ, রাহিলা কত বছর ধরে পিঁপড়ের মতন একটা একটা দানা সংগ্রহ করে রেখে আমাদের বরাত ফিরিয়ে দিলে। নৌকো-জালের যত্ন নিবি আজিম। আর কেউ মদ খাবি না—বাজেপয়সা খরচ করবি না। দু বছর পরেই আমরা পাকা বাড়ি বাঁধব। আরো একটা নৌকো কিনব। সবাই মিলেমিশে থাকব। ঝগড়া গণ্ডগোল বাজে ব্যাপারের ধারেকাছেও কেউ এগোবে না।'

আজিম বলল, 'তোমার হাতের মাংস-চামড়া হাঙরে খেয়েছে, সেই কথাটা ভাবলে দাদা হিম হয়ে যাই।'

ঝড়বৃষ্টি থেমে যেতে আজিম নৌকোয় জমা জলটা ছেঁচে ফেলতে থাকে। অন্য দু ভাইও সাহায্য করে। তারপর তারা আবার ডুবুরীঘাটায় নৌকোকে গুণ টেনে নিয়ে এসে নোঙ্গর করার সময় একজন মাঝি বলে, 'তোদের উদ্বেগ দেখে আমরা হেসে খুন হই। নতুন তো!'

রাত্রে জালে গেলে রাহিলার চোখে ঘুম আসে না। তার আতঙ্ক কখন ঝড় আসবে! যদি না তিন ভাই আর কেউ নৌকো নিয়ে ফিরতে পারে?

শাশুড়ি আম্মা কিন্তু অকাতরে ঘুমোয়।

বুড়ো শ্বশুর মাঝে মাঝে হাঁক মারে : 'শালা মহাজন, তোর বাড়ি গাড়ি লাখ লাখ টাকা হল! আমার চোখ দুটো পচে গলে গেল। সারাজীবন ডুবুরী থেকে এই কি আমার পুরস্কার? আমি কত হাজার হাজার শাঁখ তুলেছি—সে-সব ভারতের ঘরে ঘরে কত সতী লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যে-সকালে বাজাচ্ছে পুজো-আচ্চায়—তাদের আশীর্বাদেও কি আমার দুটো চোখে আলো ফুটবে না? আমাকে হাঙরে খেলে না কেন?'

ভোরের দিকে শ্বশুরের হেঁড়ে গলার গান শোনা যায় :

'অকূল দরিয়ার মাঝি
আমায় নিয়ে যাও—
কোন বিহানে ভিড়বে ঘাটে
তোমার সোনার নাও…'

রাহিলা সকাল হতে-না-হতেই সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে যায়, রশীদ কখন ফিরবে নৌকো থেকে!

সূর্য উঠছে পুব আকাশে আলোর ছটা ছড়িয়ে।

একসময় দেখা যায় রশীদ ছুটে আসছে বেলাভূমি দিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে

এসে রাহিলার বুকের ওপরে। মাছ মেপে বিক্রি করে আসতে বলে এসেছে সে ভাই দুজনকে।

রাহিলাকে রশীদ হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নামায়। বিরাট ঢেউ এসে তাদের ওপর আছড়ে পড়ার পর দুজনকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবার আগেই দৌড় মারে তারা।

দুজনে হাসাহাসি গড়াগড়ি জড়াজড়ি করে। কত মানুষ সমুদ্রস্নান করে উঠে যাচ্ছে।

তারা দুজনেও উঠে আসে ভিজে শরীরে। রাহিলার ভিজে কাপড় জড়ানো শরীর যেন মোহবিস্তার করে। পিছন দিকে তাকিয়ে দুজনের ফেলে আসা পায়ের রেখা দেখায় রাহিলা। জল পর্যন্ত নেমে গেছে পদচিহ্নগুলো।

রাহিলা বলে, 'ওই সমুদ্রের মাঝখানে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

রশীদ বললে, 'তুমিই তো আমার সমুদ্র! আগে কি জানতাম তুমি এমন একটি রত্ন! মুক্তাভরা ঝিনুক!'

রাহিলা আড়চোখে তাকিয়ে হাসল। তারপর নারকেল-কুঞ্জটার পাশ দিয়ে বহুদিনের স্মৃতি মাড়িয়ে দুজনে বাড়ির দিকে চলে এলো।

রশীদের সাড়া পেতেই তার বাপ আরিফ বুড়ো বললে, 'দে ব্যাটা, টাকা দে, মদ খাব। নুলিয়ার বাচ্চা হয়ে তুই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরিস না, চেঁচামেচি করিস না, ভদ্দরলোক হয়ে যাচ্ছিস নাকি? খবরদার!'

আম্মা বলল, 'তাই তো, ভদ্দরলোক হওয়া কি নুলিয়ার সহ্য হয়! ওনার মতো চেঁচামেচি না করলে কি বেঁচে আছে বলে বোঝা যায়!'

রাহিলা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে হাসতে থাকে। তার ভরপুর শরীরের যৌবন নাচতে থাকে সেই হাসির দমকে। বলে, 'দাও, বাবাকে টাকা দাও—নুলিয়া হয়েই বাঁচুক। ভদ্দরলোক হলে তার অনেক জ্বালা।'

রশীদ মায়ের তৈরি গরম সমোসা খেতে খেতে বলে, 'বাবাকে তুমি একদিন নিয়ে যাও চোখের ডাক্তারের কাছে। তোমার কথা শুনবে। ছানি তুলুক, অপারেশন করুক, মার্বেল গুলি বা রঙিন চশমা যা দেয় দিক। চোখের যন্ত্রণাতেই অত চিৎকার করে।'

রাহিলা বলে, 'খালি পেটে মদ খেয়ে খেয়ে মাথায় হিট্ উঠে আরো বেশি হয়েছে। ঠিক আছে, কালই আমি বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

আম্মা বৌমার কথা শুনে আশ্বস্ত হল। লোকটা পাগল হয়ে মারা যাবে!

রশীদ শুয়ে পড়লে রাহিলা তার মাথা টিপে দিতে দিতে গুনগুন করে গান করে।

তন্দ্রা নেমে আসে রশীদের চোখে। সে ঘুমিয়ে পড়লেও তার মস্তিষ্কের ঝিল্লির মধ্যে যেন সমুদ্রভৈরবী বাজতে থাকে। পাহাড়সমান ঢেউ উঠছে আর সশব্দে ভেঙে পড়ছে। তোলপাড় করছে গোটা সমুদ্র। অন্ধকারে সেই সব ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো ঝলমল করছে।

একটানা কেবলই শব্দ—সমুদ্রভৈরবী॥

মৎস্য প্রেম

'একটা কইমাছ আধ সের হয় দেখেছ ?'

'দেখিনি, শুনেছি। বাওয়ালী মোড়ল জমিদারদের পদ্ম-পুকুর 'হোদ' হয়েছিল বহু বছর—তার থেকে আশুবাবুর বড়ছেলে নাকি পচা পিঁপড়ের ডিম দিয়ে কয়েকটা আধ সের ওজনের বড় বড় কই মাছ ধরেছিলেন। সে কাল গুজরে গেছে, আর কোথাও কোন পুরনো মাছের প্রাণ বাঁচানোর উপায় নেই। স্বাধীনতার পর থেকে লোকসংখ্যাও বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। উৎপাদন বাড়লেও বিপুল জনসংখ্যার সঙ্গে সমানতালে খাদ্য-হার যোগানো যাচ্ছে না বলে অভাবী মানুষরা পুকুর-খাল-বিল সব ছেঁচে ফেলে পুরনো মাছের বংশ ধ্বংস করে ফেলছে, বীজ আর কোত্থেকে হবে? নদী আর সমুদ্রকেও যদি ছেঁচে ফেলতে পারত তাও ছাড়ত না মানুষ। এখন যদি বলে কেউ, আধ কেজি কই-মাগুর-শিঙি মাছ ধরেছি, তবে তা গালগল্প বলে বিশ্বাস করতে হবে। মোড়ল জমিদারদের চিড়িয়াখানার পশ্চিম পাশের গোলাপবাবুদের পুকুরটা ছেঁচে ছিল, তাতে সাত সের ওজনের বানমাছ পাওয়া গিয়েছিল। এক মণ ওজনের পোনামাছ ছিল। দীঘি থেকে একটা খুব বড় কাৎলা মাছ বর্ষাকালে কিভাবে যান দিয়ে উঠে গিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে আটকে গিয়ে মারা যায়। শিয়াল-শকুনে খেয়ে ফেলে। তার কানকোর ডালাদুটো ছিল বিড়ি-বাঁধা কুলোর মতো। গোলাপবাবুদের গোলকধাঁধা বাড়ির বৈঠকখানায় মাছের বড় বড় আঁশ দিয়ে পদ্মফুল, গোলাপ করে রেখেছেন জমিদার-গিন্নিরা, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।'

চিত্তরঞ্জন হালদারের কেবল মাছের গল্প। মথুরাপুর থানার পাটকেলবেড়িয়া গ্রামের মানুষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও তিনি সাহসে ভর করে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে তখনকার মৎস্যমন্ত্রীর কাছে। চিত্তবাবু প্ল্যান দিয়েছিলেন, 'পুরনো দেশী মাছ পুকুর ছেঁচে নষ্ট করে ফেলা আইন করে যদি বন্ধ করতে না পারেন স্যার,—গণতন্ত্রে যার যা খুশি করবার অধিকার আছে বলে, তাহলে আমাকে অথবা অন্য লোককে পুরনো দেশী কই, মাগুর, শিঙি, পাঁকাল, বান, চেঙো, বেলে, খলসে, শোল, শাল, বোয়াল, চিতল, 'ভেকটি' (ভেকুট বা কুঁজো), ন্যাদোস, ল্যাঠা, চ্যাং, ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা, চুনো, চিংড়ি, চাঁদা এইসব মাছ সংরক্ষণের জন্যে টাকা দিন—পুকুর কেটে মাছ কিনে বীজ রক্ষা করি। নইলে দেশী মাছ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে। রোগীকে খাওয়াবার জন্যে মাগুর-শিঙি মাছ কেনা এখন শক্ত ব্যাপার। পঞ্চাশ টাকা কেজি।'

অতবড় মন্ত্রী হয়েও চিত্তবাবুর দেশপ্রেমের আবেদন বোঝেননি তিনি। উল্টে নাকি মন্তব্য করে বসলেন, 'আপনি দেখছি এক পাগল! সেই যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে এক পাগল শহরের নার্শারি থেকে নানারকম মহীরুহের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে বিহারের লবটুলিয়ার জঙ্গলে ছড়াতে থাকেন, নানান গাছ হবে—আপনিও দেখছি তেমনি এক খামখেয়ালি লোক!...'

চিত্তরঞ্জন হালদার বিমর্ষচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবুও ভাবনার জ্বর তাঁর কমেনি। শেষকালে সকালে বিকালে নিজে কোদাল ধরে এক চাপ এক চাপ করে মাটি কেটে শুকনো ডোবাটার চারপাড় বেঁধে পুকুর কেটেছেন। বেশ গভীর পুকুর। তিন মাস একটানা পরিশ্রম করেছেন। পিঁপড়ে যেমন তিলতিল করে মাটি তুলে বয়ে নিয়ে গিয়ে পাহাড় গড়ে তোলে তেমনি। হয়তো কখনো তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী বা মেয়ে তনুজা, ছেলে যশোদাদুলাল সাহায্য করেছে কিন্তু একাজে তারা তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। কারণ যে মানুষ বীজ মরার আশঙ্কায় পুরনো কই-মাগুর এনে না খেয়ে মাঠের জলে বা অন্যের পুকুরে ছেড়ে দেন তাঁর মতো বোকার পিছনে মেহনত করে কোন লাভ আছে?

'এ যুগেও আদর্শের কথা বলে কেউ? ধর্মপুস্তক ছাড়া আদর্শ কোথাও বেঁচে আছে এখন? আছে একটা বাড়িতে কোথাও?' একথা পদ্মাবতীর। কাব্যিক দীঘল চোখে তাঁর নিদারুণ বিরক্তি।

ক্লাস-নাইনে-পড়া ছেলে যশোদাদুলালকে চিত্তবাবু শিক্ষা দেন, 'মানুষের উপকারে লাগাই ধর্মের মূল-কথা। উপকার করে যাও। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করো না।'

পদ্মাবতী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'কেন ওকে ওসব শিক্ষা দিচ্ছ? জীবনটা মহাপুরুষদের মতো বেকার হবে? উপকার করলেই মানুষ ক্ষতি করে। কেন, মানুষের আশা তুমি মেটাও নি? মানুষ একটা পৃথিবী পেয়েছিল, দুটো পৃথিবী পায়নি কেন সেটাই তার দুঃখ!'

মেয়েলি স্বরে তোতলামি করে বলেন চিত্তবাবু, 'দুঃখ নয় গো সীতেরানী, পরিতাপ। কথা যখন বলো শব্দটা ঠিক ঠিক প্রয়োগ করো। যেমন কোন প্রেমিকা তার প্রেমিককে লিখল, তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। শব্দটা হবে, প্রতীক্ষা। এক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার গলার মালায় যে রুদ্রাক্ষ আছে তা কি খুব শক্ত! সাধুজী বললেন, না, এটা নিরেট!'

চিত্তবাবু হাত দোলাতে দোলাতে দু-পাশে নজর ফেলে পথ চলেন। সামনেটা তাঁর অত দেখার দরকার নেই। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে বা চৌকি গেঁথে মাছ মারছে দেখলেই বলেন, 'আরে আরে, মাছগুলো ধরে মেরে ফেলছ? এগুলো তো পুরনো হলে ডিম ছাড়ত! কত মাছ হত! পোনা চরানো শোল-শাল-ল্যাঠা-চ্যাং মারা খুবই অন্যায় কাজ। ওদের বাচ্চাগুলোকে অন্যমাছে সব খেয়ে নেবে মেরো না, মেরো না। এটা পাপ কাজ। পুত্রকন্যা

হত্যার সামিল।'

খালে বাগদি মেয়েরা যদি কাপড় পেতে 'ম্যাতা' মাছ ধরে তো আকাশ ভেঙে পড়ে চিত্তবাবুর মাথায়। তিনি চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেন, 'তোমাদের কি আক্কেল-জ্ঞান কিছু দেয়নি ভগবান! হ্যাঁগা মেয়েরা, মায়েরা? কত লক্ষ কোটি মাছের ডিম তোমরা ধ্বংস করছ! এক বেলার একটা চচ্চাড়ি খাবার জন্যে কত কোটি কোটি ডিম মারা পড়ছে তোমাদের হাতে। উঠে পড়ো—উঠে পড়ো সবাই।'

বাগদি মেয়েরা হাসাহাসি করে। 'পাগ্‌লা' বলে চিত্তবাবুকে আমলই দেয় না। ধানসেদ্ধ করা হাঁড়ির মত কালো এক বুড়ী বলে, 'ভগমানের চ্যালা! জগৎ-সংসারের মাল 'অক্কে' কত্তেচে। খাল কি তোমার বাবার?'

'আচ্ছা, আমি থানার বড়বাবুকে জানাব।' বলে চোখ রাঙিয়ে চিত্তবাবু সত্যই থানায় গিয়ে বড়বাবুকে অভিযোগ জানালেন। বড়বাবু শুনে বললেন, 'মাথার একগাছা চুলও আমি ছিঁড়তে অক্ষম ঐ বাগদি গরিব মেয়েদের, চিত্তবাবু—ম্যাতা মাছ ধরা অন্যায় এমন আইন পাশ করিয়ে আনুন আপনাদের এম এল এ-এর কাছে গিয়ে, তিনি বিধানসভা থেকে বিল পাশ করে আনলে তবেই ওদের বিধান করা যেতে পারে। এটা তো গণতান্ত্রিক দেশ। বাগদি মেয়েরা যদি ঘেরাও করে আমার প্যানটুল খুলে নেয় তখন কি আমার ইজ্জত রক্ষা করতে এসে আপনি বেনারসী ঘিরে ধরবেন!'

চিত্তবাবু চিত্তভরা পরিতাপ নিয়ে স্বগৃহে ফিরলে চোখে পড়ে মায়ের কথামতো যশোদাদুলাল জাল ফেলে নতুন পুকুর থেকে মাছ ধরেছে। তাই কুটছেন এখন পদ্মাবতী। আগে তবু চুরি করে মাছ ধরে চিত্তবাবুকে আড়াল করতেন, এখন আর লুকোছাপাও করেন না।

চিত্তবাবু বলেন, 'মাছ মারছ তো? কোথা থেকে আমি মাইনের অর্ধেক টাকা খরচা করে মাছ কিনে এনে চাষ করেছি—এখন তোমরাই তা খেয়ে নিচ্ছ!'

পদ্মাবতী বলেন, 'কেন, আমি কি বিধবা হয়েছি যে মাছ খাব না? ছেলেমেয়েরা কি বাপকে হারিয়েছে যে মাছের মুখ দেখতে না পেয়ে রোজ রোজ নিরামিষ খেয়ে তোমার মত পেটে চড়া পড়ে যাবে?'

চিত্তবাবু অর্ধেক ভাত খেয়ে পাতের অর্ধেক ভাতটা পুকুরের মাছের পেটে দেন বলে পদ্মাবতী আজকাল থালাভরে স্বামীকে ভাতও দেন না। ভাত চাইলে বলেন, 'পুকুরে ঢালার ভাত নেই। জমিতে ধান তোমার কত হয় খেয়াল রাখো? ঐ পুকুরটা জমির পাশে কেটে যদি জল দিয়ে বোরো ধান চাষ করতে, তাহলে কি তিনমাস খোরাকির টান পড়ত? বাজারের কাঁকর চাল খেয়ে আমার একটা দাঁত চটে গেল!'

চিত্তবাবু পদে পদে সবার কাছে হেরে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত প্রধান, বি ডি ও, মন্ত্রী কেউই তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন না। সবাই পাগল বলছেন।

পাগ্‌লা চিত্তবাবু দুটো বাগাতোক পুরনো শোলমাছ কিনে আনছেন বাজার

থেকে দাড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে। দেখে, তাঁদের গ্রামের হরিমোহন বলে, 'চিত্তদা, মাছ দুটো আমাকে দেবেন নাকি, পুকুরে ছাড়ব!'

'তোমার আবার পুকুর কোথা?'

'আছে আছে। একটা ডোবা। তাতে রাখলে বাচ্চা ছাড়বে।'

'হ্যাঁ, তোমার পেটে বাচ্চা ছাড়বে। অতটুক ডোবায় এই বড় মাছ থাকতে পারবে না। জল কমলে উঠে পালাবার সময় কেউ মেরে দেবে।'

বর্ষা নামলে, যখন পাটকেলবেড়িয়ার গোটা মাঠ জলে থইথই করে, চিত্ত হালদারের চোখে কেন ঘুম নামে না ভাবতে থাকেন পদ্মাবতী পানের বাটা কোলের কাছে নিয়ে সুপারি কুঁচোতে কুঁচোতে। তিনিও চর দিয়ে আছেন স্বামীকে। একসময় বলেন, 'শোবে না তুমি?'

'কি রকম মুষলধালে বৃষ্টি হচ্ছে!' বলেন চিত্তবাবু। অবশেষে শুয়ে পড়েন তিনি। বৃষ্টির গান শুনতে থাকেন। ঘুমোন না আদৌ। অপেক্ষা করেন পদ্মাবতী কখন ঘুমোবেন। স্ত্রী অনেকদিন পরে আজ এসে স্বামীর বিছানায় শুয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি ওঘরে ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকতে লাগল পদ্মাবতীর। বৃষ্টিও তখন ধরে গেছে। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে টর্চ জেলে গোলার নিচে থেকে কোদালটা বার করে নিয়ে অন্ধকারে চললেন নতুন পুকুরের পাড়ে। যানের কাছে এসে আলো জেলে দেখলেন জমির জল নামছে অল্প অল্প। কই শিঙি মাগুর পাঁকাল পুঁটি শোল ল্যাঠা মাছগুলো উঠে পালাবার জন্যে বুক বেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। দুটো জল ঢোলা সাপ। আলো জেলে রেখে যেই পুকুরের যান কাটিয়ে দিতে চললেন কোদাল হাতে তুলে, হঠাৎ পিছন থেকে পদ্মাবতী তা ধরে ফেলে বলে উঠলেন, 'যান, একদম কাটবে না। পুকুর ভরা মাছ তুমি বার করে দেবে?'

'পদ্মাবতী, সরে যাও তুমি! খোদার ওপর খোদকারী করো না! আমার পুকুর আমি কেটে দোব!'

পদ্মাবতীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে কোদালের কোপ মেরে মেরে যানটা কেটে দিতেই বানের তোড়ের মতো জলাজমির জল এসে ঢুকতে লাগল পুকুরে হুড়হুড় শব্দ তুলে। পুকুর উপচে উঠলো।

পদ্মাবতী স্থির হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। আর তার ক্ষ্যাপা পাগল স্বামী তখন মনের আনন্দে বলছেন, 'যা বেটা-বেটিরা, পুকুর ছেড়ে মাঠে ময়দানে চলে যা। ডিম ছাড়গে যা। দু-হাজার টাকার মাছ—এক লাখ টাকার মাছে পরিণত হবে। মানুষের মাছের কষ্ট যাবে।'......

পদ্মাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এলেন। পা ধুয়ে এসে ছেলেমেয়েদের জাগালেন। বললেন, 'তোমার বাপ পুকুরে যান কাটিয়ে দিয়েছে। মাছ সব বার করে দিচ্ছে। এমন পাগল মানুষ থাকে!'

মেয়ে তনুজা বলল, 'তুমি যান বন্ধ করে দেবার ভয়ে তো বাবা এখন সারারাত পুকুর পাড়ে বসে থাকবে। যান খোলা থাকলে মাছ যাবেও যেমন, আবার আসবেও।'

পদ্মাবতী বললেন, 'আমার বয়ে গেছে যান বন্ধ করতে যাবার। ঠাকুরের দিব্যি, আমি আর ঐ পুকুরের মাছ খাব না, ছোঁবও না। তুই তো তোর বাপের টান টানিস। বোঝা যাবে তোর বিয়ের সময় মাছ কোথা পায়। পোনা-চাষ করলে কাজে লাগত না, দেশী মাছ বাড়াচ্ছে!'

যশোদাদুলাল শুয়ে পড়ল।

পদ্মাবতীও শুয়ে পড়লেন।

তনুজা তখন হ্যারিকেন হাতে নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে গেল বাগানটা পার হয়ে। গিয়ে দেখল, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, 'এসো বাবা, শুয়ে পড়বে এসো। 'আসলা'র দিন, সাপে কামড়ে দেবে।'

'তোর মা, যশোদাদুলাল শুয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চল্ তবে। এতক্ষণ প্রায় সব মাছ বেরিয়ে গেছে। খবরদার ওরা যেন বাঁধ বেঁধে না দেয়। তাহলে মাথা ফাটিয়ে দোব।'

তনুজা বলল, 'মা আর এই পুকুরের মাছ ছোঁবে না, খাবে না, বলেছে ঠাকুরের দিব্যি দিয়ে।'

'বলেছে?' চিত্তবাবু যেন মহা আশ্বস্ত। বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল।'

তিনি এসে শুয়ে পড়তেই আবার বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে পরম আনন্দে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

হাওয়ান সওদাগর

তিনমাস পানি না খেয়ে থাকতে পারে এমন জীব হল উট। যখন পানি পায় তিনটে থলি ভরে রাখে পাকস্থলীর। বাকি চারটের দুটিতে থাকে মজুত করা খাদ্য—আর দুটিতে থাকে জাবর কাটার মাল। কাঁটা গাছ মড়মড় করে যখন চিবোয় কষে বেয়ে খুন ঝরে। ফণীমনসার কাঁটাকে জিব দিয়ে পয়লা টান মেরে সোজা করে নেয়। তারপর গোড়ার দিক থেকে কামড় মারে। সাহারার মতো বিশাল আগুন জ্বলা মরুভূমি পাড়ি দিতে গিয়ে যখন সাতটা পাকস্থলীর জমা রাখা মাল নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ক্ষুধার জ্বালায় পিঠের কুঁজ ছিঁড়ে খায়। এটি নরম গদি। চর্বির ঢিবি। সওয়ারি বসবে তাই আল্লা আরামদায়ক স্পঞ্জের আসন বানিয়ে দিয়েছে। গোটা শরীর কাটখোট্টা রুক্ষ। উটের কুঁজের মাংসই হল সন্দেশ। তুলোর মত নরম। এত ভাল মাংস বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন পশুর নেই। আরবের ধনীরা এই মাংস খান। বাইরের চামড়া মোটা মজবুত খসখসে হলেও

মাংস কিন্তু খুব নরম। ফুলের পাশে যেমন কাঁটা, কঠিনের পাশেই নরম জিনিস তেমনি। বহু কিছু থেকে বঞ্চিত মরুবাসীর জন্য উপহার-বিশেষ হল উটের নরম মাংস আর নটের আঠার মত ঘন সুস্বাদু দুধ। প্রকৃতি-বিচারে এসব তৈরি হয়েছে। আরবের মুরগিও নরম মাখনের মত। পনের মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যায়। নইলে জ্বালানী কোথায়?

কথা বলছিলেন আব্বাস আলী দেওয়ান। বাঙালী হলেও কাবুলিদের মত সাজপোশাক। ইউপি-র দেওবন্ধ এতিমখানায় তাঁকে ছ-বছর বেলায় এক বিহারী মাথা ন্যাড়া ইয়া চাম্বা দাড়িওলা হাজিসাহেব বাংলা মুলুকে ওয়াজ নসিহৎ করতে এসে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। টাইটেল পাশ করার পর এতিমখানার সেবা করার ওয়াদা ছেড়ে পালিয়ে যান আজমীরে। খাজা বাবার দরগায় সেবক হিসাবে ছিলেন বছর কয়েক। তারপর এক ফল ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করেন। কিছু টাকা সঞ্চয় করার পর ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, খাসি, গরু, মোষ, উট বিক্রির কোম্পানি খোলেন। তাঁর দলে এখন চল্লিশজন লোক খাটে। কোরবানির ছ-মাস আগে থেকে রাজস্থানের হাজার খানেক বাতিল উট কিনে নিয়ে সদলবলে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চলেন ভারতের দক্ষিণ হয়ে পূবের দিকে। অযোধ্যার নবাববংশের খুব সুন্দরী বউ আছেন তাঁর লক্ষ্মৌয়ে। আজমীরের ফল ব্যবসায়ীর ভাড়াটে ছিলেন স্ত্রীর গরমকাপড়-বেচা আব্বাজান।

মহা তাজ্জব কী বাৎ, জীবজন্তু ব্যবসায়ী আব্বাস আলী দেওয়ানের বড় ছেলে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে লন্ডনের দূতাবাসে বড় চাকরি করেন। মেম বিয়ে করেছেন। মেজো ছেলে ইরানের ডাক্তার। সেজো ইঞ্জিনিয়ার। ছোটটি উর্দু ভাষার কবি। তাঁর মেয়ে নেই বলে আফসোস!

বাংলা ভাষা ভুলেই যেতেন তিনি কিন্তু দেওবন্দে আরো দুজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা ছিলেন বয়সে বড়। আর চল্লিশ বছর ধরে প্রতিবছরে একবার বাংলা মুলুকে উট দুম্বা নিয়ে আসেন। তখন মাসখানেক থেকে যান। খিদিরপুর 'বা মেটিয়াব্রুজে। পাট্টা জুলপি, বড় একজোড়া গোঁফ, চাঁছা দাড়ি, মাথায় চল্লিশ গজ কাপড়ের পাগড়ি, হাতে ক্রিজভরা রুপোর ছড়ি আব্বাস আলীর। কোমরে ঝোলে চাবির গোছা। 'সর্দার উটে'র পিঠের 'হাওদায়' তাঁর অনেকগুলি বাক্সপ্যাটরাও চলে সঙ্গে সঙ্গে।

আব্বাস আলী বলেন, 'জীবনটা হেঁটে হেঁটেই কেটে গেল। আমার হাঁটা মানে ঐ উটের বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া। হয়তো আগা খাঁ কোম্পানির কাছ থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে গেলাম হায়দরাবাদে। যুদ্ধ বা রেসের ঘোড়ার দাম প্রায় তিন লাখ টাকা। নানা রকমের ঘোড়া থাকে আমার কোম্পানিতে। বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, কলকাতা, দিল্লি, লক্ষ্মৌ, শ্রীনগরে যখন যাই ঘরভাড়া নিয়ে থাকি। আলী কোং-এর হাঁড়ি পাতিল তাঁবু রসদ সবই সঙ্গে থাকে। শহরে পৌঁছনোর আগে কতদিন কত রাত আমাদের মাঠে ময়দানে কাটে। পথে-পথেই ছটা ঋতু বদল হয়। কেউ ঠাণ্ডায় মরে গেলে

পথের পাশেই কবর হয়ে যায়। নতুন লোক আসে আবার দলে। আমাদের মধ্যে মেয়ে থাকে না কেউ। খানসামা দেগহাঁড়িতে মাংস পোলাও রান্না করে। এক খাঞ্চায় পাঁচজন করে চার খাতায় (দলে) খেতে বসি। গালিচা পেতে দামী শাল বা কম্বল মুড়ি দিয়ে বোলবোলা টানি। খাম্বির তামাকের গন্ধে তাঁবু মাতোয়ারা হয়। আমাদের পোশাক, খাদ্য, ডেরা দেখলে মনে করতে হবে আমরা সেই মোগল-পাঠানই আছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা উটের দাম কত?'

আমরা রাজস্থানের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাতিল উট কিনি দু হাজার আড়াই হাজার টাকায়—চার হাজার টাকায় বেচি। বাংলায় যে উট এনে কোরবানি হয় তা অধিকাংশই বুড়ো। কচি দু-বছরের উটের মাংস অসাধারণ নরম আর মোলায়েম। বাঙালীরা কী করে জানবে সে মাংসের স্বাদ! তবে একটা উটের চাইতে একটা পাঞ্জাবী বা ইউপি-র গাইয়ের দাম কোরবানির বাজারে তিনগুণ হয়। বারো হাজার টাকা। ওজন আট মণ। নীলামে দাম ওঠে। সে গরুর গা দিয়ে তেল চুঁইয়ে পড়ে। এক রঙ হলে বেশি দাম। এদের শিংয়ের মাথায় পাঁচ ফুটে লোক হাত পায় না।'

'উট কি কাঁচা হালিঘাস খায়?'

'বড় আকারের উলু-কাশ-খড়ি জাতীয় ঘাস হলে খায়। নারকেল, বটপাতা, বটের ডাল খায়। আমরা শুকনো বিচালি, গমের খড়নাড়া, মটরকলাই গাছ সংগ্রহ করে খেতে দিই। ভুষিও দিই। যখন কাফেলা কোথাও বিশ্রাম নেয় তখন একটা উটের সঙ্গে অন্য একটার পায়ে বাঁধা থাকে—তিনপায়ে থাকে। তাই পালাতে পারে না। উট দল ছেড়ে বড় একটা পালায়ও না।'

উটের দুধ কতটা হয়?'

'ন-দশ কেজি থেকে বারো-তেরো কেজি পর্যন্ত।'

মেটিয়াবুরুজের বাসায় দেওয়ান সাহেবের লোকজনগুলো কেমন যেন দেহাতি মানুষ। খইনি চাপড়ায়। থুথু ফেলে। জামাকাপড় ময়লা। মাথায় পাগড়ি। খালি ফাটা পা। খোস ওঠা গা।

গুলগুল্লা, চাপাটি সমোসা, হালুয়া আর চা আনল একজন। বিহারের শক্ত হালুয়ার মধ্যে কী রকম নরম মেওয়া শাঁস যেন আর কিসমিস দেওয়া।

বললাম, 'আচ্ছা দেওয়ানজী, টাকার জন্যেই কি আপনার এখনো এত মেহনত?'

'না মিয়াভাই, টাকা আমি বহুৎ কামিয়েছি। দানও করে দিই মসজিদে, এতিমখানায়। হিন্দুরাও চাঁদা আদায় করে। তবে এ যেন একটা কর্তব্য—নেশার মত হয়ে গেছে। উটের পিঠে বসে চলেছি। ঢেউ-ভাঙা দুলুনি যেন। বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে চলেছে কেউ হাওদায় বসে। মাঠ-প্রান্তর গাছ-পালা দেখে দেখে চলেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন বড় একা। অসহায়। কোথায় যাচ্ছি যেন কোন হদিস নেই।'

'ডাকাতের হাতে পড়েননি?'

'হ্যাঁ, দুবার পড়েছিলাম। একবার ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিলাম হায়দরাবাদে। আমাদের পথ তো সোজা নয়। আঁকাবাঁকা। কখনো পাহাড়-পর্বত বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাত্র দু-মাইলের পথ পেরুতে দশ-বারোদিন লেগে যায়। নদী পার হতে ঝামেলা হয়। চড়া নদী হলে হেঁটে ঘোড়া বা উট পার হয়ে যায়। একদিন হল কি, এমনি এক নদী পার হয়ে সন্ধ্যার সময় একটা পাহাড়ের কোলে এসে উঠলাম। পাথর ছড়ানো অসমতল মাঠে ছাউনি গাড়তে হল। খানিকটা দূরে জঙ্গল। জায়গাটা মহারাষ্ট্রের ভেতরে। হঠাৎ মাঝরাতে মশাল আর বর্শা খড়গ নিয়ে আক্রমণ শুরু করল। আগেই তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘোড়াগুলো দিকবিদিকে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগলো। কয়েকজন নিহত হল। আমি বন্দী হলাম। টাকা-পয়সা বাক্স-প্যাঁটরা যা ছিল কেড়ে নিল। লোকগুলোর বড় বড় গোঁফ। কপালে আড়াআড়ি লম্বা তিলক। খাটো কাপড়ে কাছা সাঁটা। ভাষা আদৌ বুঝি না। বন্দী করে এনে পাহাড়ের পিছনের একটা বস্তিঘরে রাখল। সকালে রামকানাই কলা খেতে দিল। তারপর ওদের পুরুত এলো। নাপিতকে আমার দাড়ি চেঁছে দিয়ে মাথা কামিয়ে চৈতন রাখতে বলল। চৈতনে একটা ঘণ্টি বেঁধে দিল। পুরুত পিঠে তিনবার পদাঘাত করল। তারপর বিবস্ত্র করে মাথা নেড়ে ঘণ্টি 'বাজাতে বাজাতে ইসারায় কেটে পড়তে বলল। পালিয়ে এলাম। প্রাণ তো বাঁচল। জঙ্গলে লুকিয়ে রইলাম। ঘোড়াগুলো সব চলে গেছে। দুটো ঘোড়া ছিল দামী। আরবের। চার লাখ টাকায় বিক্রি হত। যাক গে, জঙ্গলেও জীবজন্তুর হাতে প্রাণের ভয়। হঠাৎ দেখি যে আমার খাস খাদেম ইনসান ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কাক-জোছনা রাতে জঙ্গলের জালি-কাটা আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে। তালি বাজাতেই সে দাঁড়িয়ে গেল। কাছে আসতে সে নেমে পড়ল। তার পাগড়ি দিল পরতে। তারপর লক্ষ্ণৌ চলে আসি। স্ত্রীর কাছে একমাস সেই সময়টায় ছিলাম। কেবলই আহার-বিহার আর সুখী অলস সংসারী মানুষের মতো দিন কাটছিল। সেইবারে প্রায় আশি হাজার নগদ টাকা চোট খেয়েছিলাম। আর পঁচিশটা ঘোড়ার দাম লাখ সাতেক। ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে নিয়ে আবার রাজস্থানে উট কিনতে চলে গেলাম। ছ-মাস পরেই কোরবানি। বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা মুলুকে যেতে হবে।...আর একবার লুটপাট হল বিহারের মধ্যে। তাতে আমাদের লোকরা ডাকাতদলের তিনজনকে জখম করেছিল। আমিও আহত হই। টাকা সব চলে যায়। কিন্তু কেউ উট নিয়ে যায়নি।'

দেওয়ানজীকে বললাম, 'আচ্ছা, লোক দিয়ে এই ব্যবসা চালাতে পারেন তো?'

'না, চলে না। তেমন বিশ্বাসী লোকের সন্ধান আছে?'

আমি মাথা হেঁট করলাম।

'ছেলেরা তো অন্য লাইন ধরেছে। কেবল ছোটটি বেকার। কিন্তু সেই খুব দামী লোক। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সে অপূর্ব সুন্দর কবিতা

লেখে। তার জন্য জগতের এইসব বাহ্যিক কাজ নয়। কাশ্মীরের এক পরিচিত বাড়ির খুব অপরূপা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তার শাদি হবার কথা আছে সামনের মাসে। গতবছর তার জন্মদিনে উট জবাই করেছিলাম। পাঁচশো মেহমান খাইয়েছিলাম। এ বছরও খাওয়াব।'

'আপনার বেগমসাহেবা আপনার মুখ চেয়ে থাকেন না ?'

হাওয়ান (জীবজন্তুও) সওদাগর আব্বাস আলি দেওয়ান তাঁর বিকশিত চোখ দুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। আশ্চর্য দুটো চোখের কোণ বেয়ে তাঁর দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি তা মুছে ফেললেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি যখন মায়ের গর্ভে তখন বাপ মারা যান। মা-ও মারা গেলেন আমাকে মাত্র চার বছরের রেখে। স্নেহ-ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তা আমার ঐ অশেষ গুণবতী স্ত্রীর কাছেই পেয়েছিলাম। তার সেই স্বর্গীয় ভালবাসা একটানা কাছে থাকলে হারিয়ে যাবার ভয়ে আমি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াই। তারপর হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হবে। বিশ্বাস করুন। এখনো যেন আমরা তেমনি যৌবনদিনের স্পন্দন-কম্পন অনুভব করি। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি আনন্দের মাসুলস্বরূপ সন্তানগুলি যেন আমাদের কেউ নয়। কিন্তু ভোররাতে যখন কবি পুত্রটি সায়েরী গায় মনটি বিবাগী হয়ে যায়। মরু-পাহাড়-নদী-প্রান্তর যেন আমাকে হাতছানি দেয়। আমার শরীরটা যদি বয়সের তুলনায় এমন তরতাজা না হত, তাহলে এই জন্তু-ব্যবসায় সওদাগরী তুলে দিয়ে সবকিছু দান করে বুড়ী বেগমটার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মক্কায় হজ করতে চলে যেতাম।'

'বয়সের তুলনায় তাজা চেহারাটা নিয়েই আপনার মুশকিল হয়েছে, না ?'

'জী হ্যাঁ। এই প্রৌঢ় বয়স একটা শক্ত সময়।'

বললাম, 'সওদাগর, পশ্চিম দিকে মুখ করে চলে যান এবার লক্ষ্ণৌ।'

দেওয়ানজী দু'হাতে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'ভাই সাহেব, যাব। তিনটে উট বিক্রি করতে বাকি আছে। কোরবানীর নামাজ পড়তে রওনা দেবো। আমার ছেলে জিল্লুর রহমানের কবিতায় আছে ;

'জীবনটা উটের মতোই কুৎসিত।
সাতটা পাকস্থলীর ছটাও ভরে না,
তবু মক্কা-মদিনা পাড়ি দিতে
স্বর্গ পর্যন্ত যাবার বাজি ধরে বসে আছে।'

জাহাজি টাউট

কাস্টমস অফিসে যাবার পর কেরানী ভানু রায় হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল নিশিগোবিন্দকে। বলল, 'চা খাও। নতুন জিনিস সন্ধান আছে?'

সাহেবদের দেওয়া জাহাজি প্যাণ্ট পরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল নিশিগোবিন্দ। গায়ে একটা মোটা ফুলহাতা গেঞ্জি। গলায় যিশুর লকেট। বলল, 'ভাগ্য যেন শালা পাঁকাল মাছ। পাঁক কেটে কেটে পালায়। একটা ডবকা জিনিস হাতে আসবে আগামীকাল সন্ধ্যায়—গ্রামের জিনিস। একেবারে আপনি যেমন বললেন।'

উৎসাহিত হল ভানু রায়। মাঝারি বয়েস হলেও মাথায় অস্ট্রিয়দের মতো সাদা চুল। বলল, 'আমিও সন্ধান দিচ্ছি, ৪নং ড্রাই ডকে নঙ্গর করেছে একটা তুরস্কের তেলের জাহাজ। আর ৬নং-এ একখানা রুশ জাহাজ।'

'গুলি মারুন রুশদের। ওরা জাহাজ থেকে নামবে না। টার্কির লোক তো মহামেডান! খরচ-খরচা করবে?'

'আরে বোকা, ইস্তাম্বুলের লিভিংস্ট্যাণ্ডার্ড পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হাই। ওরা কি এদেশের মহামেডানদের মত ধর্মবাতিক? ঐ ৪নং ড্রাই ডক থেকে কপাল ফিরেছে হাজি মস্তানের, সে কথা জানিস?'

না বলে মাথা নাড়লে ভানু রায়। বলল, 'হাজি মস্তান সাধারণ একজন জাহাজি মালবওয়া কুলি ছিলেন। একবার এক জাহাজের দশপেটি মাল নামল। চায়ের পেটির মত। হাজি মস্তান মাথায় করে এনে গেটের বাইরের চা দোকানের সামনে ফেলে বসে আছেন। লরি আনবেন মালিকের এক বাবু। তিনি কাস্টমসে গেছেন। হঠাৎ কানাঘুষো দেখেই তিনি কেটে পড়লেন। মাল চৌকি দিয়ে সারাদিন বসে আছেন হাজি মস্তান। দু-চারদিনেও আর বাবুর দেখা নেই। শেষকালে একমাস। একদিন সেই বাবু এসে বললেন, মস্তানজী, সেই মালের পেটিগুলো আছে তো? নাকি পুলিশ নিয়ে গেছে?'

হাজি মস্তান বললেন, 'ঐ চা দোকানের পিছনে পড়ে আছে। আপনি তো আর এলেন না। - আমার মাল-বওয়া রোজও পেলাম না।'

পেটিগুলোর ওপর মানুষ প্রস্রাব করেছে। বাজে জায়গায় পড়ে আছে। একটা প্লাস আনতে বললেন বাবু। একটা পেটি কেটে দেখালেন অনেক কাগজ কুঁচোনোর ভেতরে কাঠের গুঁড়ো। তার ভেতর থেকে বার করলেন সোনার বাট। এমনি অনেক আছে। সব পেটিগুলোতেই।

'হাজি মস্তান বললেন, 'যাই থাকুক বাবু, আমার অতশত দেখবার দরকার

নেই। ওসব আমার কাছে মাটির ঢেলা। আপনি লরি আনুন, আমি তুলে দিই।'

বাবু মাল তুলে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর হাজি মস্তানের পুরস্কার মিলে গেল লাখ টাকা। তিনি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। উড়োজাহাজ আছে। বোম্বে শহরে ফ্ল্যাটবাড়ি করছেন আর বিক্রি করে দিচ্ছেন। হাজার হাজার টাকা দান আছে তাঁর সারা ভারতের কত মসজিদে।'

'তখন ছিল ইংরেজ আমল। এখন জাহাজের মধ্যে যে কোন জায়গায় সোনা রাখলে যন্ত্র ঢনঢন করে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেয় কোথায় সেটা আছে। মালের কাছে যত যাবে তত জোরে ঘণ্টা বাজবে। সে যুগে এ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। কত সোনা পাচার হত। যাও ৪নং ডকে, হাজি মস্তানের মত যদি ভাগ্য ফেরে!'

নিশিগোবিন্দ দুই হাত জোড় করে নমস্কার জানাল হাজি মস্তানের উদ্দেশে।

৪নং ড্রাই ডকে সারাবিকেল অপেক্ষা করার পর একজন সাহেব নামলেন 'রুকসানা' জাহাজ থেকে। মালবাহী জাহাজ। দিন পাঁচেক থাকবেন।

কটা রঙের গোঁফ, হাঁসা চোখ, বছর বত্রিশের সাহেবটির পিছু নিলে নিশিগোবিন্দ। ডাকলে, 'হ্যালো মিস্টার!'

'হ্যালো? আর ইউ কল মি?'

'ইয়া! ওয়াণ্ট গার্ল?'

'ইয়া! ইয়া!' সাহেব খুশিতে আটখানা। হাত ধরলেন নিশিগোবিন্দর। সে ভাল ইংরেজি জানে না। স্কুল ফাইনাল ফেল করেছিল। তাও আবার ইংরেজিতেই। আর অংকেও। লাইফটা তাই হেল হয়ে গেল।

ট্যাক্সি ধরে নিয়ে সটান নগর কলকাতা। সাহেবিপাড়া পার্ক স্ট্রীট। তখন রঙিন আলোয় কনে সেজেছে যেন অনেক দোকান-হোটেল-বার-বাড়িঘর।

সাহেবের নাম আবুল কাশেম বেগ।

বেগ সাহেব জুতো কিনলেন একজোড়া দুশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে। তিনখানা নোট ফেলে দিলেন। বাকিটা আর ফেরত দিলে না নিশিগোবিন্দ। সাহেবের পায়ে যত্ন করে জুতো পরিয়ে দিলে। পুরোনোটা নিজে পরে নিল। একেবারে ফিটফাট। মাত্র মাস তিনেকের জুতো। সাহেব খুশি, ঘৃণা না করে তাঁর জুতো পায়ে পরার জন্যে। বললেন, 'মাই ফ্রেণ্ড।'

একটা বারে সাহেবকে নিয়ে ঢুকল নিশিগোবিন্দ। টাকা দিয়ে একবোতল হুইস্কি আর সোডা নিলে।

বেগ আবুল কাশেম ভাল ইংরেজি জানে না বলে লজ্জা আর দুঃখ জানালেন। মাত্র ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলেন। জাহাজে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ করেন। মাইনে সামান্যই পান। মাত্র সাত হাজার টাকা। বাবা-মাকে তিন হাজার দিতে হয়। পাহাড়ী সমুদ্র-উপকূলে সুন্দর বাগানে নতুন বাড়িতে তাঁরা বাস করেন। একটি বোন আছে, ডাক্তারি পড়ে।

পৃথিবীর সব বড় বড় বন্দর-শহর বেগ সাহেব ঘুরেছেন।

কয়েকটি মেয়ে ঘুরে-ঘারে গেল। 'নিশিগোবিন্দবাবু ভাল আছেন তো?' নিশিগোবিন্দ হেসে একটু মাথা নেড়ে ওদের আমল না দিয়ে প্রাণভরে মাংস, পটেটোচিপস, চানাচুর-বাদাম খেতে খেতে মদ টানে। সাহেবকে খাওয়াতে থাকে বেশি করে।

হঠাৎ লায়লা এসে হাজির। 'আরে আরে—এসো ডার্লিং! তোমাকেই এই টার্কি বেগ সাহেব খুঁজছিলেন। কার কাছ থেকে যেন তোমার প্রশংসা শুনেছেন। কেবল বলেন এই বারের নাম আর তোমার নাম।'

আগুনের শিখার মতো লায়লা। ঠোঁটে রঙ। নখে রঙ। আঁকাবাঁকা ভুরু। মিনিস্কার্ট পরা। চুলে দোলা দিয়ে বহুদিনের পরিচিতার মত সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করেই বসে যায় খেতে। সাহেবের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক।

দু-চারটি টুকরো টুকরো কথা। তারই মধ্যে দামদস্তুর হয়ে যায়।

চোখ-ইশারায় লায়লা জানাল সাহেবকে নিয়ে বাইরে যেতে।

ট্যাক্সি ধরল নিশিগোবিন্দ। লায়লা এসে সাহেবের পাশে বসল। হাতটা কোলে টেনে নিলে।

গাড়ি থেকে নামার পর লায়লা ফ্ল্যাটে ঢোকার আগেই দুশো টাকা নিয়ে নিলে নিশিগোবিন্দর কাছ থেকে। একশো টাকা উপায় হল নিশিগোবিন্দর।

সাহেব বেরুলেন মিনিট কুড়ি পরে।

'ও. কে?' শুধোলে নিশিগোবিন্দ।

'ও. কে।' সাহেব বললেন। বেশ টলটলায়মান তখন তিনি। পৌঁছে দিতে হল জাহাজে। সাহেব একটা ওভারঅল আর এক টিন বিস্কুট দিলে তাকে।

নিশিগোবিন্দর পর পর সাতদিন আর কোন উপায় নেই। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে তার। পকেটমারের কাজ করবে নাকি সে? যদি ধরা পড়ে?

কোট, ওভারঅল, মোটা পশমী গেঞ্জি, প্যান্ট কত কি পায় সে কিন্তু পেটের দায়ে সবই বিক্রি করে দিতে হয় তাকে।

মাথা গুঁজে ৬নং ড্রাই ডকের একটা গাছের তলায় চাতালে বসেছিল নিশিগোবিন্দ। খিদেয় তার মাথা ঘুরছে। গাছের ওপর কাক ডাকছে। গ্রীসের জাহাজ এসেছে একটা। বিরাট বড় জাহাজ। বোধহয় কয়েকদিন থাকবে। কেউ নামছে না কেন?

এক লাখ টনের কারগো শিপ গোটা পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে মাল খালাস করে তবে কলকাতার খিদিরপুর ডকে ঢোকে মাত্র ১০/১৫ হাজার টন মাল নিয়ে; জাহাজের পেছনে কী বিরাট প্রপেলার। বড় মাছ, কুমীর, শুশুক যাই ঢুকুক ওর ভেতরে, কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। চলমান জাহাজের পিছু পিছু চলে মাছশিকারী পাখির দল। ক্লান্ত হলে মাস্তুলে বসে ওরা সমুদ্র পার হয়ে যায়। প্রপেলারের তোড়ে তীব্রবেগে মাছ শূন্যে উঠলেই বাজ,

গাংচিলগুলো রকেটের গতিতে ছুটে গিয়ে ধরে নেয়। মহাসাগরে উড়ে উড়ে চলে বিরাট ডানার এ্যালবাট্রস।

বেশি ভারি মাল নিয়ে কলকাতা বন্দরে আর বড় বড় জাহাজ ঢুকতে পারে না। বড় জোর হলদিয়া, ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত তাদের গতি।

গ্রীকজাহাজএসেছে বোধহয় রংকরার বা জরুরী কোনো সারাসুরির কাজে। কিছুদিন থাকবে। গ্রীক জাহাজের কর্মীরাই বহুদিন সমুদ্রে ঘোরাঘুরির পর মাটিতে নামার জন্যে উম্মুখ হয়ে ওঠে। পিপাসার্ত হয় নানারকম ক্ষুধায়। মার্কেটিংও করে অনেক কিছু। স্মাগলাররাও কাস্টমসের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু মাল হাতায়। প্রায় সব দেশের জাহাজিরা বলে, 'কলকাতা কাস্টমস বড় কড়া। বিদেশী চোরাই মাল এখানে বেশি কিছু নামানো যায় না।'

নিশিগোবিন্দ কতবার জাহাজের ভেতরে গেছে। সাহেব-পছন্দ কেবিন, চেম্বার আছে। খোলের মধ্যে থাক থাক গোডাউন আছে। মাল লিফটে চলে যায়। থাকে থাকে সাজানো হয়। আবার খাতাপত্র দেখে বন্দরে বন্দরে ক্রেনে করে নেমে যায়। আবার নতুন মাল ওঠে। জাহাজ কোম্পানির অফিসে মাল বুক করে টাকা জমা দিতে হয়।

আদা-ব্যাপারীর অত জাহাজের খবরে দরকার কী? নিশিগোবিন্দর এখন একজন সাহেবকে দরকার যিনি খাবেন-দাবেন ফুর্তি করবেন। ধুলো-কাদায় লুটোপুটি করবেন। শিক্ষিত ভদ্রঘরের টাউটও বেড়েছে এখন। চাকরি পাবে কোথা? কুলি-মজুরের চাকরির জন্যে নাকি এখন লাগছে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। মাস্টারির জন্যে তিরিশ হাজার। প্রফেসারির জন্যে পঞ্চাশ হাজার। বড় দারোগার জন্যে লাখ টাকা। সবই ভদ্র ভাষায় ডোনেশন। পার্টির নজরানা। নেতাদের এমনি ভুঁড়ি-গাড়ি-বাড়ি-জমি-সোনা-ব্যাঙ্কব্যালেন্স হয়? বাইরে তাঁরা চাঁছাছোলা ভদ্দরলোক।

হঠাৎ এক গ্রীক সাহেব নেমে এলেন যেন আসমান থেকে। কয়েকজন টাউট নড়েচড়ে ছুটতে গিয়ে খামোস হল। এ সাহেবের ওজন সাড়ে তিন মণ। উচ্চতা সাত ফুট। সবাই হাসছে ওকে দেখে।

নিশিগোবিন্দ পেটের দায়ে যেন মড়া খেতে গেল। সাহেবের কাছে যেতেই তিনি তার মাথাটা বগলদাবায় চেপে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন গিয়ে। ট্যাক্সি একদিকে কাৎ হয়ে গেল। এসপ্লানেডে এসে সাহেব ব্যাগ থেকে বার করে বেচলেন তার ব্যক্তিগত ক্যামেরা, ঘড়ি, মিনি টেপরেকর্ডার, পোর্টএবল রেডিও, টর্চ, কম্পিউটার হিসাবযন্ত্র। তারপর ঢুকলেন নিউ মার্কেটে। 'আইয়ে বাবা—আইয়ে বাবা' বলে দোকানদাররা সবাই ডাকতে লাগল। কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ না করে হাতির মতন চলতে লাগলেন সাহেব। লোকজন হাসছে।

গ্যারিবল্ডির মত বিরাট গোঁফ গ্রীক সাহেব এডমণ্ড নপনদিসের। এক বোতল রাম নিয়ে শেষ করলেন। বিয়ার আর মাংস খেলে নিশিগোবিন্দ।

মেয়েরা কেউ আসে না। সার্কাসে বুকের ওপর হাতি তুলতে দেখেছিল একটা মেয়েকে কিন্তু এই বারের সার্কাসে তেমন একজন নেই কি কেউ? মোটা বয়স্ক মেয়েটির কাছে গেল নিশিগোবিন্দ। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'রঙ্গিলাদি, মান-ইজ্জৎ রাখো। বড় খারাপ অবস্থায় পড়ে গেছি।'

রঙ্গিলা বললে, 'তুই ছোঁড়া মারবি আমাকে? বরং দশটা টাকা ধার নিয়ে যা। আগে একবার কী দুর্জয় নিগ্রোকে এনেছিলি! সে আমাকে মাত্র একশো টাকায় ঘণ্টাখানেক ধরে ছিঁড়ে খেয়েছিল পাগল সিংহের মতো। এখন তুই কাট!'

'রঙ্গিলাদি।' পায়ে চেপে ধরল নিশিগোবিন্দ। কেঁদে ফেলিল সে। ছেলেমেয়েরা না খেয়ে বাড়িতে কাঁদছে তার।

'তুই তো বড় জ্বালাস!' রঙ্গিলা নরম হল। ছুটে গেল নিশিগোবিন্দ। সাহেবকে গুঁতোতে গুঁতোতে ঠেলে রাস্তায় এনে ট্যাক্সিতে তুলল। রঙ্গিলা এসে কাছে বসল তার পাশে। বলল, 'দুশো টাকা দে।'

'একশো মাত্র দিয়েছে যে!'

'তবে গাড়ি দাঁড় করা।'

নিশিগোবিন্দ সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে আরো দুখানা নোট চাইল। সাহেব দিলেন পঞ্চাশ টাকার আর দুখানা নোট।

একশো পঞ্চাশ টাকা দিতে রঙ্গিলা নিল।

ফ্ল্যাটে আনার পর বাইরে বসে রইল নিশিগোবিন্দ। তার এখন বাড়ি ফেরা দরকার। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে।

এক ঘণ্টার পর রঙ্গিলার চিৎকার, সাহেবের গর্জন-মারামারির শব্দ পেয়ে নিশিগোবিন্দ কেটে পড়ল। খুন-জখম হলে কে দায়ী হবে? রঙ্গিলারও ছিনতাইকারিণী বলে দুর্নাম আছে। সাহেবের কাছে টাকা আছে। হয়তো তাই ছিনিয়ে নিচ্ছে—ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

বাইরের পৃথিবী তখন কুয়াশায় ঢেকে গেছে।

পরদিন আর ভ্রাই ডকে গেল না নিশিগোবিন্দ। চৌরঙ্গির পরিচিত সেই বারে এসে জানল রঙ্গিলা আজ আসেনি। বাসায় গেল তার নিশিগোবিন্দ। দেখল রঙ্গিলার মুখ-চোখ ফুলে আছে। রঙ্গিলা বলল, 'বুড়ো দামড়া কেবল কামড়ায়। সব টাকা বার করে নিয়ে লাথি মেরে বার করে দিয়েছি। পুলিশকে কিছু টাকা দিতে তুলে নিয়ে গেল।'

'তোমার নাকে কামড়ে দিয়েছিল?'

'শুধু নাকে? আর বলো না। ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে আমাকে। কক্ষনো আর এরকম রাক্ষস ধরে আনবে না।'

'কত টাকা পেয়েছিলে দিদি?'

'হ্যাঁ, তা বেশ। তোর অত জেনে কাজ নেই।'

'আমাকে কিছু দাও। তোমারও তো বয়স হয়েছে। বয়স্ক বুড়ো মানুষ

পেলে আনব তোমার কাছে। মা কালী! আমার বাচ্চাদের জ্বর। বউয়ের একদম শাড়ি নেই।'

ভেতরে বসিয়ে মুড়ি-তরকারি-চা খাওয়াবার পর রঙ্গিলা পঞ্চাশটা টাকা আর একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি দিলে।

নিশিগোবিন্দ বললে, 'তুমি সত্যিকার দিদি। তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমি দাঁত দিয়ে বার করে দোব।'

'তা করতে হবে না। তুমি বরং ছিনতাইয়ের অভিযোগ আনলে বলবে সাহেব মারধর করে পালিয়ে গেছে।'

'হুঁশ হলে গ্রীক সাহেবদের ওসব মনে থাকে না। লালমুখ ইংরেজ হলে ভয় ছিল।'

রঙ্গিলা মুখে-হাতে-পায়ে মালিশ ঘষতে ঘষতে বলল, 'আনবে তো সেরকম কাউকে পেলে? বুলডগ নিয়ে খেলা করে মজা আছে!'

নিশিগোবিন্দ পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'রঙ্গিলাদি, তুমি শুধু দিদি নয়, সর্বংসহ—মায়ের মত।'

পারাপার

ওপারে কালীমন্দির আর এপারে মসজিদ। এপারের হিন্দুরা কালীপুজো দিতে যেতে চায়। মেয়েরাই বেশি। সঙ্গে ছেলেমেয়ে। হাতে প্রসাদীর ডালা। এয়োতিদের পিঠভরা এলোচুল। সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর। পাট বা সিল্কের লালপাড় সাদা শাড়ি। সীমান্ত পার হবার আগে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ওপারের সিকিউরিটি গার্ড সরদার শাহাবুদ্দিন দুজন রাইফেলধারী সহকারীকে নিয়ে খবরদারি করেন। 'নাম-ধাম-গ্রাম-স্বামী বা বাবার নাম, সব কিছু লিখিয়ে যাও। তোমাদের কারো পাশপোর্ট নেই। আইনত কেউ এপারের আলাদা মুলুক 'বাংলাদেশে' আসতে পার না। তবু মাত্র দু-ঘণ্টা মন্দিরে পুজো দেবার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছি। খবরদার, ভেতরে গিয়ে যেন কারো বাড়িতে থেকে কুটুম্বিতা করার অছিলায় চোরা-চালানের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে জেল জরিমানা দুই হবে।'

এসব কথা মৌখিক। একবার না শোনালেই নয়। যতক্ষণ না সমস্ত পুজারিণী এসে জমে সরদার তাঁর তাঁবুর ভেতরে বসে যত্ন করে দাড়ি গোঁফ ছাঁটেন। তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন প্রত্যেক ভক্তকেই সীমান্তরেখা পারাপারের জন্যে দু-টাকা করে নজরানা দিতে হবে। তারপর মন্দিরের

ঠাকুরের প্রণামী আলাদা।

আর এপারের মসজিদে শুক্রুবারের জুম্মার নামাজ পড়তে আসার আগে বর্ডার সিকিউরিটির টিনের ডিবের মধ্যে ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলতেই হয় নামাজীদের। পিস্তলধারী গার্ড ক্যাপ্টেন শশধর চক্রবর্তীর হিসাবে বাংলাদেশী পয়সায় এটা নিদারুণ ঠকা। ওপারের টাকা যেন খোলামকুচি!

কিন্তু সরদার শাহাবুদ্দিন ঝোল-টানা-সুরে আমতা আমতা করে বলেন, 'আরে চক্রবর্তীবাবু, আপনের তো সংখ্যায় তিন-চারগুন। আমার রেট বেশি হলে কি হবে, পুজারীর সংখ্যা তো কম।'

চক্রবর্তীবাবু বলেন, 'তাহলে এক কাজ করতে পারেন, ওপারের ঐ মন্দিরের দেবী কালী যে ভয়ঙ্কর জাগ্রত, দু-চারটে কাহিনী ভক্তদের ছড়িয়ে দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটে আরো জাঁকিয়ে পুজোপাঠ চালাতে দিন। ভিড় হোক খুব।'

শাহাবুদ্দিন সাহেব দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলেন, 'কিন্তু অপৌত্তলিকরা তো বিশ্বাস করবে না। আমাকেই শেষ পর্যন্ত হিন্দু-ভাবাপন্ন পৌত্তলিকতা প্রচারের এজেন্ট জানিয়ে, অনেক-টাকা ঘুষ দিয়ে বর্ডারের এই গার্ড কমান্ডারের যে চাকরিটা জুটিয়েছি সেটার দফাও রফা করব!'

'ইসলামে তো ঘুষ খাওয়া বা দেওয়া মহাপাপ বলে গণ্য সাহেব, কিন্তু আপনি নামাজও পড়েন আবার······অবশ্য আমিও পুজাপাঠ করি কিন্তু আমাকেও এই জায়গায় দাঁড়াতে বহু তেলখড় পোড়াতে হয়েছে মিঞাভাই। ধর্মে আমিও বিশ্বাস করি। এই যে প্রতিদিন পাঁচবার ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়তে আসে মুসলমানরা, মাত্র দশ পয়সা করে নিই আমি।'

হঠাৎ একখানা পাটবোঝাই লরি এসে দাঁড়ায়। কালো মোষের মতো চেহারার তিন-চারটে আঙটি হাতে মধ্যবয়সী একজন ব্যবসায়ী নেমে পড়ে কাগজপত্র দেখান। কিছু লেনদেন হয়।

কিন্তু গাড়ি এপারে এলেই চক্রবর্তীবাবু রুখে দিয়ে বলেন, 'সমস্ত পাট নামান তো আগে। কি আছে আমি তন্নতন্ন করে দেখব। প্রসাদবাবু, আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবেন আর আমরা কি পাই বলুন? আপনি তো একজন রাঘব বোয়াল, গরু-মোষ, দুধ, পাট, প্যাকাটি, পেতল, কাঁসা যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, রেডিও, টেরেলিন, টেরিউল-কাপড়, কি না পারাপার করছেন!'

চক্রবর্তীবাবুর তাঁবুর মধ্যে ঢোকেন প্রসাদবাবু। হাত চেপে ধরেন। 'দয়া করে আর মাল ঢালবেন না। আপনি এই প্যাকেট দুটো রাখুন। দুদিকেই তো দিতে হচ্ছে। আমাদেরও মাল কিনতে হয়। দশ ব্যাগ অস্ট্রেলিয়ান গুঁড়োদুধ, বিশ থান টেরেলিন, বত্রিশ থান টেরিউল আর কিছু পেতল-তামা-লোহার যন্ত্রপাতি আছে।'

সরদার শাহাবুদ্দিন তাড়া লাগান, 'তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন তো মশায়। ঝামেলা পাকাবেন? এই সময় সিগন্যাল কমান্ডার ট্যুরে আসতে পারেন।'

গাড়ি বেরিয়ে যায়। চাপড়া, কৃষ্ণনগর, করিমগঞ্জে এসে এসব গাড়ি আন্তর্দেশীয় পাট সংগ্রহের কথা বলে। দরকার হলে ভুয়ো রসিদ দেখায়।'

শাহাবুদ্দিন নামাজের পর আল্লার কাছে বাংলা ভাষাতেই অস্ফুট স্বরে 'মোনাজাত' (প্রার্থনা) করেন, 'হে আল্লাহ, তুমি এই 'গুনাহ্‌গার' (পাপী) বান্দার প্রতি সদয় হও। কখনো যেন রুষ্ট হয়ো না। বিপদ-আপদ থেকে আমাকে দূরে রাখো। হিন্দু পৌত্তলিকদের কাছ থেকে আমি যে কিঞ্চিৎ নজরানা নিই, তা থেকে আমি ঈদের সময় গরিব-মিসকিনদের কাপড় কিনে দিই। তুমি তো জানো, লাখ টাকা ঘুষ দিতে গিয়ে আমি আমার মা আর বউয়ের যত সোনারুপোর গহনা, জমি-জায়গাও খুইয়েছি। তা এখন আমাকে উপার্জন করে নিতে দাও। তুমি এই অধম বান্দার প্রতি নেক-নজর দিলে বছরে আমি দশ লাখ টাকা উপায় করতে পারি।'

শশধর চক্রবর্তীও আহ্নিক-পুজোপাঠের পর প্রার্থনা করেন, 'হে মা কালী করালী, তুমি অধমের প্রতি সদয় হও। তুমি চাইলে ধুলোমুঠিও সোনায় পরিণত হয়। শিলাও সমুদ্রে ভাসতে থাকে। আমিও তোমার পায়ে হাত দিয়ে শপথ করছি, সীমান্তের এপারে তোমার একটা মন্দির গড়ে দোব। শুধু দীর্ঘদিন তুমি আমার এখানের চাকরিটা বাহাল রেখো নিরাপদে। মা, আমি তোমার অনুগত বলি (পাঁঠা) মাত্র।'

মায়ের কি দয়া, তিনি রাজস্থানে খরা মড়ক লাগিয়ে দিয়ে হাজার হাজার গরুর ঠ্যাল দিয়েছেন বর্ডার অঞ্চলে। পাঁচ হাজার বড় বড় বিশাল চেহারার ঐরাবত গরু নিয়ে এসেছে ভৈরব হালদার। বাংলাদেশের নকিব মোহম্মদ দশটা এজেন্টের কাছ থেকে টাকার বস্তা এনে ফেলে দিয়েছে ভৈরবের সামনে। বারোশো থেকে দু-হাজার টাকা দাম মাত্র এক একটা গরুর। সামনে মাত্র মাসখানেক বাকি কোরবানির। এসবের মধ্যে যেগুলো বাছাই গাই, যাদের শিংয়ের মাথায় হাত পায় না মানুষ—নিলামে দশ বারো হাজার টাকা দাম উঠবে। জলে জল বাড়ে। টাকায় টাকা আসে।

শশধর চক্রবর্তীর ডানচোখ নাচছিল আজ। রাইফেলধারী গার্ড দুজন হিন্দুস্থানী হলেও বেশ বাধ্য তাঁর। তারা গরুগুলো গুনে আসতে গিয়ে দু-ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। কেবলই নড়েচড়ে সরে যায় আর এক-কুড়ি দু-কুড়ি করে পাঁচ হাজার গরুর সমুদ্রের ঢেউ গুনে ওঠা কি তাদের পক্ষে সম্ভব ?

'গরু পিছু দশ টাকা দিতে হবে।' বলে দেন শশধর চক্রবর্তী। ভারতীয় গরুরআলাদা একটা মর্যাদা বা স্বাদ আছে। পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালা ছাড়া সব প্রদেশেই গরুকাটা বন্ধ। কিন্তু খরাপীড়িত এলাকার গরুদের খাবার কোথা, কেই বা তাদের পালন করবে ? যারা গোমাতার ভক্ত তাঁরা সবাই যদি এইসব গরু কিনে নিয়ে গো-সেবায় মাহাত্ম্য লাভ করতেন তবে ভাল হত।

শেষ পর্যন্ত দুই দেশের সীমান্তরক্ষীর দুই কর্তার সঙ্গে দু'পারের গরু বিক্রির মাতব্বর দুজন আপসে নিষ্পত্তি করে নেন। গরু পিছু পাঁচ টাকা। পঁচিশ হাজার টাকা হাফাহাফি দুজনের।

শশধর চক্রবর্তী তবুও গ্যাঁজ বার করেন, 'গরুগুলো তো আমাদের। কাজেই আমি যদি পারমিশন না দিই, যাবে কী করে ? শাহাবুদ্দিন সাহেবের বরং সিকি ভাগ নেওয়া উচিত।'

শাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আপনি বড় টাকা-টাকা করেন। এপার থেকে যখন মাল যায় তখন কি আমি বেশি চাই ?'

'টেরিলিনটেরিউল ভারতে আসছে কিন্তু দর্জিপাড়া ঘুরে জামাপ্যান্ট হয়ে আবার তো ফিরে যায় ঢাকায়। তখন আপনারা জাপান, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি বলে লেবেল সেঁটে দেন। ভারতীয় মাল হলে নাকি নাক সিটকায়। কিন্তু গরুর বেলায় ? আর গরু গেলে কি ফেরত আসবে ?'

'আসবে না ? চামড়া লরিভর্তি হয়ে যায় না বেলডাঙায় ? হাড় আসে না সার কারখানায় ?'

হাড় চামড়া নিয়ে শকুনের মতো কে আর ঝগড়া করে অত ? শশধরবাবু বিরক্তি চেপেই বলেন, 'ঠিক আছে। বর্ডার অবশ্য দু-দেশেরই। কিন্তু আমাদের মাল যায় অনেক বেশি।'

একটু রাত বাড়তে গ্রামের মাঠ দিয়ে পঙ্গপালের মতো গরুগুলো চলে যায় ওপারে। সেখান থেকে দশটা এজেন্টের হাতে দশ দিকের বাজারে চলে যাবে।

পাক সড়কটার গায়ে সীমান্তে মাত্র হাঁটুউঁচু তিনটে পিলার। লোহার বেড়ার ফটক।

শাহাবুদ্দিন এসে শশধরের খাটে চিৎ হয়ে পড়ে ক্যাসেট চালিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে থাকলে শশধর বলেন, 'এই একটা গান, অন্তরের সব জ্বালা নিভিয়ে দেয়।'

'আমার কিন্তু জ্বালা ধরিয়ে দেয়।'

'আপনার কটা বেগম ?'

'আল্লার ইচ্ছায় এখনো একটাই। ভাবছি আর একটা করব।'

'কেন ?'

'আল্লার ইচ্ছায় ধনদৌলত হলে চারটে বেগম আমরা করতেও পারি। আর একটা সমস্যাও দূর হয়। মেয়ে বেশি হয়ে গেলে যদি বহুবিবাহ না করি তবে মেয়েগুলো তো অকালে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'বটে বটে। কে যায় ? হুকুমদার !'

থমকে দাঁড়ায় দুটি যুবতী মেয়ে। রাত তখন এগারোটা। দুপাশের চারজন সান্ত্রী তাসখেলা ফেলে রেখে রাইফেলে খটাখট শব্দ তোলে। সেই শব্দে বটগাছের বাদুড়গুলো ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে পালায়।

তাঁবুতে হাত ধরে দুটি মেয়েকেই টেনে আনেন দুজন কর্তা।

প্রদীপের মতো ডাগর চোখের নিতম্ববতী মেয়েটি নাম জানায় মন্দাকিনী মণ্ডল। অন্যটি তন্বী কালো চেহারার মেয়ে হলেও চোখে-লাগা সুন্দরী। হাতে তাদের দুটি করে ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে পলিথিন প্যাকেটে চিনি, নুন

আর বারোখানা করে শাড়ি। তৈরি জামাও আছে কতকগুলো।

'পেটে বাঁধা আছে কিছু? দেখি!' শাহাবুদ্দিন তখন একছড়া মর্তমান কলা বার করেছেন। প্রত্যেকটির পিছনের বোতাম ভাঙা আর টিপে বসানো কেন? পট করে একটা ভাঙতে গেলে কালো চেহারার লায়লা মেয়েটি বাধা দিলে, হাঁ হাঁ সাহেব ভাঙবেন না। আমার বুড়ী নানীর জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। ওপারের মেয়ে আমি।'

কিন্তু প্রত্যেকটি কলার ভেতর থেকে সোনার পাত বেরিয়ে এলো। বারোটা কলায় বারোটা পাত।

উন্মুক্ত উদরদেশের শোভা নারীর দেহে কি মনোরম করেই না ঈশ্বর গড়েছেন নিজের হাতে। সোনার যখন হাজার তিনশো টাকা প্রতি দশ গ্রামের দাম তখন বারো গ্রামের দাম কত?

লায়লা কেঁদে গেল, 'দোহাই আপনাদের। আমরা কেবল পাচারকারিনী। মাল যথাস্থানে পেঁছে দিলেই একটা কমিশন পাব। যাদের মাল তারা নিয়ে নেবে। আমাদের ছেড়ে দিন।'

সরদার শাহাবুদ্দিনও দাড়ি চুমরে চোখ কুঁচকে বললেন, 'ছেড়ে দেব? বিনা নজরানায়?'

'এর মধ্যে থেকে আমরা কি দোব বলুন? পরের মাল।'

মন্দাকিনীর ঐ এক কথা।

উত্তেজক তরল পানীয় পান করে মাঝারি ধরনের নেশা-ধরা শশধর চক্রবর্তীর অন্তরে দয়া যেন হাঁড়ির ফুটন্ত দুধের মতো বেগে উথলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললেন, 'তা বটে। পরের মাল। এরা তো গচ্ছিতদার। এরা গরিবের মেয়ে। এইভাবে করে খায়। মন্ত্রীরা যখন লাখ লাখ টাকা পেটেন তখন তাদের কে ধরতে যায়? তোমাদের দুজনের পুঁজি আমরা ভাঙতে চাই না। তার চেয়ে মাসতিনেক জেল হলে বরং তোমাদের কম শাস্তি হবে।'

তীর-খোঁজা নৌকো যেন হঠাৎ ঘাটে ভিড়ে গেছে। মন্দাকিনী বলে, 'ঠিক বলেছেন স্যার।'

'তাহলে ঈশ্বরের কৃপার পুঁজির ধন তোমরা ভাঙাও। রাজি?'

সুন্দর দুটি চোখ তুলে লজ্জার হাসি হাসল মন্দাকিনী। লায়লাও যেন জালে পড়া অসহায় মায়াহরিণীর মতো চলে গেল সরদার শাহাবুদ্দিনের তাঁবুর মধ্যে।

শশধর চক্রবর্তী প্রায় নিজের স্ত্রীর মতো ভালবেসে সমাদর করে নিজের স্বপ্নের গদিতে ঠাঁই দিলেন মাহিষ্য কন্যা হলেও মন্দাকিনী মণ্ডলকে।

শশধর বললেন, 'তোমরা দুটোই চতুর বাজপাখি। সামনা-সামনি সদর দিয়ে যেতে তোমাদের ভয় হোল না কেন? উঁ!'

মন্দাকিনী হেসে গড়াগড়ি খেল কাতুকুতু দিতে। বলল, 'লুকিয়ে গ্রামের বাঁশবন, কবরডাঙা, জলা-জঙ্গল দিয়ে গেলে আরো ভয় বেশি চোর-ছ্যাঁচড়ের।

তারা ধরলে ধুতিও যাবে আর পুঁথিও যাবে। হাতে হারিকেন। আপনারা বরং সে তুলনায় অনেক মহৎ। বর্ডারের অন্য জায়গা দিয়ে আমরা যেতাম। এখন সেখানে কমান্ডার ইন চিফ বেশি দলবল নিয়ে নমুনা পাহারায় বসেছেন। একুশ দিন আমাদের ব্যবসার উপোস গেছে। তাই এখান দিয়ে যাবার জন্যে আজ মরীয়া হয়ে এসেছি। দোহাই আমাদের মাঝরাতের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। ফিরে আসব আবার।'

ঘণ্টা দুই পরে ওরা দুজনেই চলে গেল। রাত জেগে বসেছিলেন দুই সীমান্ত কর্তা।

দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় ওরা আবার এসে পেঁছিল। আবার কিছু মাল এনেছে। বিদেশী ঘড়ি, কম্পিউটার হিসেব-যন্ত্র, টর্চ, মিনি টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট আরো কত কি জিনিস।

আজ ওরা পাত্র বদল করল। শাহাবুদ্দিনের কাছে মন্দাকিনী। শশধরের কাছে বাংলাদেশী লায়লা। চাপড়া থানায় জলঙ্গি নদীর তীরের কাছাকাছি নাকি মন্দাকিনীর বাড়ি। লায়লা এপারে এলে মন্দাকিনীর বাড়িতে ভাত খায় আর রাত কাটায়।

শাহাবুদ্দিন বললেন, 'ভালই হয়েছে, তোমরা এসে পড়েছ। আমরা দুজন সাহেব বিরিয়ানী রান্নার যোগাড় করেছি। মুরগি, ঘি, মশলা, দেরাদুন পেশোয়ারী চাল সবই যোগাড়। তোমরা দুজন রান্না করো। খেয়েদেয়ে রাতে থাকবে। কাল সকালে চলে যেও।'

লায়লা বলল, 'সেই ভাল। রাতের বেলা পথে বড় ঝক্কি আছে।'

শশধর আর মন্দাকিনী লায়লার বিরিয়ানী রান্নার যোগাড় দিতে দিতে হাসি খুশি গল্প চলতে লাগল।

মন্দাকিনী জানাল, সে নাকি বি-এ পার্ট ওয়ান পাশ করার পর বাবা মারা যেতে পড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কোথাও চাকরি পেলে না। টিউশানি করেছিল বছর চারেক। মাইনে পায়নি কত ছেলে-মেয়ের। আরো ছোট তিনটে ভাইবোন, মা আর বুড়ী দিদা আছেন। সংসার চালাতে হয় তাকে। এখন উপায় মোটামুটি ভাল হলেও কেউ তাকে বিয়ে করতে চায় না। কারণ সে নাকি চোরাই মাল পাচারকারিণী, বেলাইনের দুনম্বরী মেয়ে। কোথা কখন কার সঙ্গে রাত কাটায় তার ঠিক নেই। তবে প্রায় সব পুরুষই তার সঙ্গে গোপন-প্রেম করতে চায়।…

আহারাদি করতে বসলেন চারজনে একসঙ্গে।

অফিসার আর স্মাগলারকারিণী বলে মনের মধ্যে যে একটা ব্যবধান ছিল তা দূরে হয়ে গেল লায়লার তৈরি পরম উপাদেয় বিরিয়ানী খেয়ে। লায়লাও খানিকটা লেখাপড়া জানা সূচিকাজে দক্ষ মেয়ে।

আর মন্দাকিনী মণ্ডল যখন রাত জেগে এক অসাধারণ ভাবাবেগে একের পর এক মুখস্থ রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল' সরদার শাহাবুদ্দিন যেন সম্মোহিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'মন্দা, তুমি এ পথে পা দিলে কেন?'

মন্দাকিনী হাসিভরা অশ্রুজলকণ্ঠে বলল, 'কি করব বলুন !'

মন্দাকিনীর কাঁধের ওপর মুখ রেখে শাহাবুদ্দিন এত কথা হয়তো ভেবেছিলেন কিন্তু কিছু বলতে পারেন নি।

যেন অনেককালের ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে রেখে সকালে ওরা দুজনে চলে গেল। যাবার সময় মন্দাকিনী আবৃত্তি করে বলল, 'যাওয়া আসা দু-দিকেই, খোলা রবে দ্বার। যাবার সময় হলে যেও, আবার আসিতে হয় এসো।' সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটা দেশের একই প্রদেশ কেটে দু-টুকরো হলেও বাংলা ভাষা একই, গ্রামগঞ্জের মানুষের মধ্যে বহুকাল ধরে দাদা-কাকা দিদি-চাচী সম্পর্ক রয়েছে। এ পারের হাঁস মুরগি গরু ছাগল ওপারে চলে গেলে ডেকে-হেঁকে তেড়ে-তুড়ে আনতে হয়—পাশপোর্ট কি সব সময় চলে ? তাহলে নদীর জল, বৃষ্টির জল, আকাশের মেঘের পারাপার, বায়ুঝড়, রোগ-মড়ক, শিয়াল কুকুর শুয়োর বাঘ খরগোস ইঁদুর নিশাচর প্রাণীদের গমনাগমন বন্ধ করো। এসব কথা বলেন শশধর চক্রবর্তী। তাঁর এসব তত্ত্বকথায় সায় দেন সরদার শাহাবুদ্দিন।

আইনের চোখে তাঁরা আলাদা দেশের লোক কিন্তু খাদ্য, চেহারা, ভাষা, ভাবনা, স্বপ্ন একই রকম। তাই ইনি ওঁর তাঁবুতে এসে বসবেন না কেন ? যত রকম বাধা ব্যবধান থাক, পরস্পরের টাকা বদল করার সময় হৃদ্যতা রাখতেই হয়। কার কত উপায় জানা হয়ে যায়।

তবু দুরূহ এক তিক্ততায় মন যখন তেতে ওঠে, শশধর চক্রবর্তী সীমান্তের এপারে পিস্তল হাতে টহল দিতে দিতে বলেন, 'জানেন সরদার সাহেব, আপনাদের টাকার কোনো দাম নেই। খোলামকুচি।'

শাহাবুদ্দিন সাহেব বলেন, 'আপনাদের টাকার দাম বেশি বটে কিন্তু একটার ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য ! কি জিনিস কয়েন তো ?'

শশধর চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাদেশের লায়লা আর ভারতের মন্দাকিনী !'

খুশিতে তুড়ি মারেন শাহাবুদ্দিন। বলেন, 'ইয়া ! ইয়া !'

হ্যাণ্ডশেক করেন দুজনে।

হঠাৎ কমাণ্ডারের ওয়ারলেস জিপ এসে হাজির হয় দুপারেই। একই সময়। সবাই খটাখট সালাম বাজান।

হঠাৎ নেমে পড়ে কমাণ্ডাররা তাঁবু সার্চ করেন। দুজন সিকিউরিটি অফিসারের বাক্স থেকে অজস্র টাকা আর সোনা উদ্ধার করার পর দুজনকে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে তোলা হল। নতুন অফিসার নিযুক্ত হলেন।

যাঁরা এলেন তাঁরাও নিশ্চয়ই বহু টাকা নজরানা দিয়েছেন। তাঁরা জেনে রাখলেন প্রাক্তনদের মাল জমিয়ে রাখার বিপদের কথা।

সরদার শাহাবুদ্দিন বেপরোয়াভাবে বলে বসলেন, 'সাহেব, ওপরতলার আপনারাই স্বাধীনতার পর থেকে দেশের মালমাত্তা সব লুটে খাচ্ছেন !'

কমাণ্ডার চুকচুক শব্দ করার পর উল্টো হাতে একটা চপেটাঘাত করলেন শাহাবুদ্দিনের মুখের ওপর। 'শালা, বেইমান !' বলতেই আবার তাঁর

নাকে পড়ল একটা ঘুঁষি।

দুদিকের গাড়ি চলে যাবার পর হঠাৎ লায়লা আর মন্দাকিনী এসে হাজির। তাদের চোখে-মুখে অদ্ভুত এক চালাকির হাসি!

নতুন গার্ড ক্যাপ্টেন দুজনে তাদের দেখে যেন ভয় পেলেন। বললেন, 'যান, যান আপনারা। কোন কিছু চেকিং লাগবে না আপনাদের। কমান্ডারদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ!'

'চিনতে পেরেছেন তাহলে?' বলে লায়লা মন্দাকিনীর গায়ে ধাক্কা দিলে। হাসতে হাসতে চলে গেল তারা।

দু-পারে দুটি কাক ডাকতে লাগল কা-কা-কা-কা……

জেলখানায় পাপিয়া

হেডওয়ার্ডার হয়েও পাঁচ বছর মিউনিসিপ্যাল শহরের সাব-জেলের চাকরিতে পচে মরছেন মিঃ সদানন্দ গোস্বামী। ফরসা চেহারা। বুদ্ধিতীক্ষ্ম ছোট্ট চেরাচোখ। টিকলো নাক। মাথার অল্প-পরিমাণ পাকা চুল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বয়স দশ বছর কমিয়ে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ। মেদশূন্য উদর। বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ হলে তিনি সহজেই জানিয়ে দেন তাঁর বড় ছেলে এম-এস-সি পড়ছে।

যত যন্ত্রণা হয়েছে তাঁর বউটাকে নিয়ে। মোটাসোটা গোলগোবিন্দ। সে কথা অবশ্য বলেন না। গোলকচাঁপাকে অবশ্য বলেছিলেন, একটা বব-ছাঁট চুলওলা বছর আঠারো বয়সের মাঝারি ফরসা ভরাট চেহারার পাগলী মেয়েকে পথ থেকে পুলিস ধরে এনেছিল। তার নিরাপত্তার জন্য এস ডু সাহেব নিলয় কুমার দেব পুলিসদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। এস ডু বাচ্চা ছেলে, দয়ামায়ার অবতার। মেয়েটাকে দেখে বুঝতে পারেন, এ এসেছে কোনো মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। পথে ছিটকে আসার পর হাতে হাতে ঘুরেছে। সহজে কথা বলে না। ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। চোখ দুটো যেন মায়াময়। কিন্তু নানান দুঃখ-ক্ষোভ যখন ক্রোধ হয়ে বেরিয়ে আসে বাঘিনীর মতো, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সান্ত্রীদের ওপরে। গলা টিপে ধরে। সান্ত্রী তখন প্রাণ বাঁচাতে কোমরে ভারী রাইফেল নিয়েও লটর-পটর। মেয়েটা অনেক সাধ্যসাধনায় নাম বলে রিজিয়া। আবার বলে, আমি তো পাপিয়া। মেদিনীপুর যাব। কোনো আসামী ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধারণ করলে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

মেয়ে দুর্ধর্ষ হলে মেয়ে-ওয়ার্ডারেরই তত্ত্বাবধান করার নিয়ম কিন্তু পাপিয়া

যে আঁচড়ায়, কামড়ায়। দুর্গা নামে যে মেয়ে ওয়ার্ডার আছে, হাজার ট্রেনিং নেওয়া সত্ত্বেও এই মেয়েটাকে ভয় পায়। তাকে একবার কামড়েও দিয়েছিল। তাই সে আমার ওপরে নির্ভর করে। আমি শালা বাঘের খেলা জানি। মেয়েটাকে ঘরের খরচা করে সুগন্ধি তেল মাথায় দিয়ে যত্ন করে চুল আঁচড়ে দিই। পা ধোয়াই, গা ধোয়াই। খাওয়াই। কাপড় পরিয়ে দিই। হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে 'সমাজ' বলে কাপড় খুলে ফেলতে গেলে ছড়ি নাচাই। মারি তাকে চাবুক। তখন যেন যন্ত্রণার অনুভূতিতে চিৎকার করে। তিন থাক উঁচু গোলাকার লাল পাঁচিলটার বাইরে থেকে পথচলা লোকরা হয়তো তখন পাপিয়ার সেই বিকট চিৎকার শুনতে পায়। অবোধ ময়ালের মতো সে যেন পাক খায়। তারপর তাকে দু-হাতে বেঁধে গরুর মতো হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাই সেলের মধ্যে। মেয়েটাকে নিয়ে যে কি করি! যেন একটা ভুঁইচাঁপা।

সারাদিন আর সব আসামী, অভিযুক্তা রাহিলা বিবি, লক্ষ্মীবালা, মেনকা খাটুয়া, গলায় দড়ির কেসের রেণুকা প্রামাণিক, রশীদা খাতুন, সবাই জেলখানার ভেতরে খোলা থাকে। ফলভরা পাতিলেবু গাছগুলোর তলায় মেয়েরা সবাই জোট পাকিয়ে বসে থাকে। দুমকা থেকে ধরে আনা মস্তিষ্করোগিণী পাপিয়াও বসে থাকে ওদের কাছাকাছি লালপাড় সাদা খোলের ময়লা একটা কাপড় পরে—অবশ্য একটু দূরে—মেয়ে-জেলখানাটার চাতালে। মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে থাকে। কাঠকয়লা, পোড়ামাটি অথবা মাটির ঢেলা নিয়ে সিমেণ্টে হিজিবিজি কাটে। সেসব নিয়ে মুখে মাথায় মাখে। একদিন দেখি সে একটা নাম লিখেছে। আনন্দ। তার নিচে গোলাপ ফুল। এই এঁকে সে কাঁদছে। আমি বসে পড়ে তাকে দেখতে লাগলাম। চোখের জল মুছে দিলাম। মাথা বুকে চেপে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। বললাম, শালা আনন্দকে আমি ধরে এনে দোব। তুই কাঁদিস না। হাহা করে হাসতে হাসতে সে আমাকে এমন জোরে লাথি মারল বুকে যে আমি তিন ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে নিচের ড্রেনে পড়ে গেলাম। মাথাটা কেটে গেল। রক্তে হাত ডুবে গেল। হঠাৎ পাপিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

পাগলা ঘণ্টি বাজতে লাগল। গাছের জল দেওয়া বাংলাদেশের সমুদ্র থেকে ট্রলার নিয়ে বঁড়শিতে হাঙর ধরা যে সব লোক ভারতীয় এলাকায় ঢুকে ধরা পড়ে জেলখানায় এসেছে তারাও হু হু করে এসে যে যার সেলে আশ্রয় নেয়। সান্ত্রীরা আমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে আমার অফিসে। ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছিল পাপিয়া। রক্ত ঝরছে। সাতদিনের বেশি তো আমরা কাউকে রাখতে পারি না। এটা সাব-জেল। সেন্ট্রাল জেল হবে বলে বিরাট উঁচু চারতলা মজবুত জেলখানা তৈরি হয়েছে এই সাবজেলের ভেতরেই, দুটো অফিস তৈরি হয়েছে বাইরের দিকে। আমি এই জেলখানায় এসে কেয়ারি করা পথ, ফুল-ফল-সবজি বাগান বানিয়ে যেন নন্দনকানন তৈরি করেছি। লোকগুলোকে খাটাই। কেমন করে বাঁচতে হয় শেখাই। আম

গাছগুলোয় মুকুল এল। ওষুধ মিশিয়ে 'ফিচকিরি' মেরে ধুইয়ে দিতে এখন হাড়েগোড়ে আম ধরেছে। এস ডু সাহেব দারুণ খুশি। আগে যে হেড ওয়ার্ডার ছিল সে নাকি খুব মারত আর চাল আটা ডাল তেল চুরি করে বেচত বাইরের লোকদের। লোকদের হড়হড়ে পাতলা জল-ডাল, গরুর চামড়ার মতো হালসানি গন্ধ কাঁচা আটার রুটি চারখানার জায়গায় দুখানা আর সস্তার আলু-বেগুন-ঘন্ট দিতেন। আলুর ভেতরে পচা-কানা থাকলে তা আর ফেলে দিতে দিতেন না। আমি সেসব বাতিল করেছি। যতটা পারি ভাল জিনিস দিতে চেষ্টা করি। সপ্তাহে একদিন মাছ আর একদিন মাংস। যাকে অপরাধের জন্য মেরেছি তাকে আবার আদর-যত্ন করে খাওয়াই। সাব জেলেই পড়ে আছি কারণ জেলাটা ভাগ হলেই এটাই সেন্ট্রাল জেল হবে। তাই সাজিয়ে-গুজিয়ে যেন নতুন করে বউটি বানিয়েছি।'

গোলকচাঁপা পাশ ফিরে শুয়ে সব শুনছিলেন। জেগেও ছিলেন। জেলখানায় তিনি কখনো না গেলেও ছবিটা শতবার শুনে শুনে সব পরিষ্কার।

সদানন্দ বললেন, 'ঘুমোলে নাকি? এ শালা মেয়েটা একেবারে চর্বির পিপে। খাবে আর ঘুমোবে। এতক্ষণ বকেই মরলাম।'

সদানন্দ বাইরের বারান্দায় গেলেন। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের মেলা। ভুতুড়ে গাছের মূর্তি। ধান কাটা মাঠের গর্তে ল্যাজ ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁকড়া টেনে বার করে খাবার পর মহানন্দে শিয়াল ডাকছে। রহস্যময় স্বরে কুব্‌কুব্‌ করে ডাকছে বাঁশবনের মধ্যে কানাবক।

আবার বিছানায় ফিরে এলে হঠাৎ গোলকচাঁপা বললেন, 'গত রবিবার এলে না যে?'

'আরে তুমি তাহলে ঘুমোওনি! গত রোববার আসব কি, কামড়ে দিলে পাগ্‌লীটা!'

'পাগ্‌লীটার সঙ্গে তুমিও পাগ্‌লা হয়ে আছ না?'

'ছি! এসব কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে? তোমাদের দেখছি শালা মা-মাসি জ্ঞান নেই।'

'পাগ্‌লীটা তোমার মা না মাসি?'

কথা বলেন না সদানন্দ। যেন জালে আটকা পড়ে গেছে একটা চতুর খরগোস। হঠাৎ সে ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়ে বলল, 'তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দিই? তোমার পা টিপি বসে বসে?'

'নারায়ণ!' -বলে উঠে বসলেন গোলকচাঁপা। গলা ঝেড়ে থুথু ফেলতে বারান্দায় গেলেন। সেখান থেকে বি. এ. পাঠরতা কন্যা মধুমিতার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জেলখানায় ফিরে এলে সাব-জেলার বিভুপদ সরকার জানালেন, 'বাংলা-দেশের যে সব মাছশিকারি এখানে জেলে আছে তাদের সম্বন্ধে আজ কাগজে খবর বেরিয়েছে, দেখেছেন? তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের একটি মাছধরা

ট্রলার নিখোঁজ হয়ে যায়। তার কোথাও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কাকদ্বীপ থেকে একটি ট্রলার গিয়ে ভারতীয় সমুদ্রের এলাকায় মাছ ধরতে থাকলে তাদের ধরে আনে।—এই দুটি খবরের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?'

হেসে উঠে সদানন্দ বললেন, 'এ যেন এক বিখ্যাত মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মতো। বিষয় থেকে বিষয়ে তিনি বিচরণ করেন। কারো সঙ্গে কারো সামঞ্জস্য নেই।'

দুজনে জেলখানার ভেতরে এলেন। বাংলাদেশের লোকগুলোকে আমগাছের বেদীর কাছে ডাকলেন। বেগুন, নটেশাক, কুমড়ো ইত্যাদি শাকসবজির পরিচর্যারত লোকগুলো এসে জড়ো হলে জেলার একজন দাড়িওলা জেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম তোমার ? কোত্থেকে এসেছ ? দলে কতজন আছে ?'

'আমার নাম সেখ আহম্মদ আলী। বাড়ি চট্টগ্রাম। আমরা সমুন্দুরের ধীবর আছি। দলে ১৩ জন ছিলাম। মাস্টার সমেত ৩ জন ছাড় পেয়ে গেছে।'

অন্য একজন পাথর-কালো-চেহারা মুখফাঁকা কপচানো দাড়ি গেঁড়ামতো লোক বললে, 'মোর নাম মহঃ নুরুজ্জামাল। পটুয়াখালি ডিসটিকে বাড়ি। ধরা পড়ি ৩/৩/৮৮ তারিখে। মোদের ট্রলার ডুবিয়ে দেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর ফোর্স। বর্ডার না জানার ফলে ধরা পড়েছি। পতাকা নেই—কি করে বুঝব ? ধরার পরে ঝড় হয়। জোরসে ড্রেজার টেনে আনার সময় ট্রলার (মেশিন সমেত) ভেঙেচুরে ডুবে যায়। সুতোলির বড় বড় কামারে বঁড়শিতে মুরগির নাড়িভুঁড়ি গেঁথে হাঙর ধরি মোরা। একটা পাঁচ কেজি থেকে ৫ মণ পর্যন্ত হয়। ৩০০ বঁড়শি থাকে সুতোলিতে। হাঙরকে ১০ থেকে ২০ টুকরো করে কেটে নৌকোর ভারায় টাঙিয়ে দিয়ে শুকতে হয়। পচাগন্ধে টেকা যায় না। অত দূরে সমুন্দুরে কিভাবে যে মাছি পেঁছে যায় তাল তাল বলা মুশকিল। প্যাটের দায়ে মোরা কাজ করি। মহাজনের ট্রলার। ঘরে মাগছেলে আছে কে দেখবে ? আল্লা দেখবে।'

একজন লম্বামতো জেলেই বলল, 'আল্লাই তাহলে তোমাকে আপদে ফেলেছে ?'

'সবই নিয়তি। হাঙর মুসলমানরা খায় না। খায় উপজাতি লোকরা। ঘর মোর আছে খ্যারের। মহাজন এখন কিচ্ছু দেবে না। ট্রলার গিয়ে এমনিতেই তার মাথা খারাপ।'

আর একজন নাবালক। মহম্মদ মিরাজ। হেঁটে হেঁটে এসেছিল সুতাহাটায়। একজন বন্ধু সেজে সব টাকা ছিনতাই করে নেয়। তার নিরাপত্তার জন্য পুলিস ধরে এনে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়।

মাথায় রক্তঝরা পটিবাঁধা নতুন একজন কয়েদী এলো জেলে। তাকে ডেকে নিয়ে সাব-জেলার চলে গেলেন খাতাপত্রে নাম নথিভুক্ত করতে।

সদানন্দ বললেন, 'স্যার, পাপিয়ার ঠিকানার কোনো খোঁজ পেলেন ?'

হাত নেড়ে বিভূপদ চলে গেলেন।

পাপিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন সদানন্দ। সাতদিনের বেশি সাব-জেলে কোনো আসামীকে রাখার হুকুম নেই। ভারী শাস্তি হলে সেন্ট্রাল জেলে চলে যাবে। ৫টা সেন্ট্রাল জেল আছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

রাবণের চুল্লি জ্বলছে। পাতলা ডাল রান্নার ওপরে পোড়া লঙ্কার টুকরো ভাসছে। সদানন্দ হাতা ডুবিয়ে নেড়েচেড়ে তলায় ডাল আছে কিনা দেখলেন। চালের কাঁকরগুলো আসামী মেয়েদের দিয়ে বাছানো হয় এখন। নইলে একসঙ্গে চিৎকার ছাড়ে হলঘরের মধ্যে পুরুষ আসামীগুলো খেতে বসে ঃ 'পাগলাগারদ নাকি এটা!' সদানন্দ মোটা বেত নিয়ে একদিন বীর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সান্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে। তারপর পিঠ পেতে দিতে হয়েছিল একে একে সবাইকে। বলেছিলেন, 'স্মরণ করো ইংরেজ আমলের কথা। তখন আসামীদের খাওয়ানো হত কাঁটানটেচচ্চড়ি আর ধান-কাঁকর-মেশানো ভাত। ডাল ছিল কলেরা রোগীর দাস্তের মতো। চুলোয় যাও শালারা। চুপ করে থাকো। বদমায়েসী করলেই সেলে ঢুকিয়ে আচ্ছা করে ফাটাব। মেয়াদও বেড়ে যাবে।'

গাছ থেকে লেবু তুলে এনে নিজের হাতে সরবত করে পাপিয়াকে খাওয়াতে গেলেন সদানন্দ। দুপুরেও নিজের হাতে খাইয়ে দেন। আজ পাপিয়া হাসছে মিটিমিটি। বলল, 'আনন্দ।'

'হ্যাঁ, আমি তোমার আনন্দ!'

'মেদিনীপুর যাব।'

'হ্যাঁ, নিয়ে যাব আমি।'

'বাবা মারবে।'

'না, মারবে না।'

ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল পাপিয়া। সরবতটা নিয়ে মেঝেয় ঢেলে দিলে।

আবার সরবত করে আনলেন সদানন্দ। হাতে একটা ছড়ি। মাটিতে আছড়াতে লাগলেন।

'খা, খেয়ে নে।'

খেল পাপিয়া। তারপর থু-থু করে ফেলে দিলে। দিলে সদানন্দের মুখের ওপরে। হিহি করে হাসতে লাগল। মাথা মুখ ধুয়ে ফেললেন সদানন্দ।

আড়ালের দিকে ধরে এনে স্নান করালেন পাপিয়াকে। ওর নগ্ন শরীরে যৌবনের ঢেউ। সাবান দিয়ে বুক কোল রগড়ে দিতে গেলে পাপিয়া শরীরে অজগরের মতো আড়মোড়া ভাঙে। চিৎকার করে। শর্টপ্যান্ট পরিয়ে তার ওপরে শাড়ি ব্লাউজ পরান। মাথা আঁচড়ে দেন কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে। তারপর এনে ভাত খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যান।

সন্ধ্যার আগেই সমস্ত আসামী চলে আসে চারকোণা মোটা গরাদে। লোহার দরজা লাগিয়ে চাবি আঁটা ঘরের মধ্যে। এক জায়গায় অনেকে থাকে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়-ভাব হয়ে যায়। আবার মারামারিও

লাগে। সবাই প্রায় ভয়ঙ্কর মানুষ, মেয়েগুলোও হীন অপরাধে জড়িত।

হঠাৎ মাঝরাতে মেয়ে ওয়ার্ডের ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। তিনজন ওয়ার্ডারের দুজন পুরুষদের দেখার ভার পেয়েছেন। তালা ভেঙে কাঁধে কাঁধে উঠে পাঁচিল টপকে আসামীরা পালাতে পারে। তাই অন্য দুজন নড়ে না।

সদানন্দের ঘুম ভেঙে যেতেই বেল্টটা পরে রিভলবার গুঁজে চাবির গোছা মোটা বেত আর টর্চ নিয়ে ছুটলেন। এসে দেখেন মেয়েরা পাগলী পাপিয়ার কাছ থেকে কি যেন কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। একটি বছরখানেকের বাচ্চা। সে চিলচিৎকার দিচ্ছে। দোর খুলে ভেতরে ঢুকতেই সান্ত্রী দুজন তৈরি হয়ে রইল। মেয়েরা সরে গেল। বাচ্চাটাকে বুকের ভেতর থেকে বার করলেন পাপিয়ার। কেড়ে নিয়ে বাচ্চার মাকে দিয়ে দিলেন।

'ওলাউঠিকে মেরে ফেলে দাও বাবু। বড্ড ঢ্যামনা! একটা ছেলে পয়দা করে দ্যাখ না কত কষ্ট! কি হয়েছিল রে বাবা? না, বাবা কাঁদে না।......'

পাগলীটার চুল ধরে টেনে তুলে ঝাঁকানি দিতে লাগলেন সদানন্দ। আঁচড়াতে কামড়াতে গেলে এক-ঘা বেত কষালেন। পাপিয়া ছড়ি ধরে ফেলল। ওর গায়েও ভীষণ জোর। কাপড় খুলে গেলে মেয়েরা চোখে হাত চাপা দিল। শর্টপ্যান্ট পাগলী কখন খুলে ছিঁড়ে পায়খানায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। পায়খানা প্রস্রাব লাগলে কখনো নিজেই চলে যায়, নয়তো মেয়ে ওয়ার্ডার সাহায্য করে।

হঠাৎ ছড়িটা হাতে পাক দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে সবাইকে মারতে তাড়া করলে মেয়েরা সবাই কোণঠাসা হয়ে যায়। সদানন্দ তাদের আটকাতে গেলে তার পিঠে পড়ল বাড়ি। তিনি ক্ষেপে গেলেন। মহিলা ওয়ার্ডার পালিয়ে গেছে ভয়ে। তাকে একেবারে দেখতে পারে না পাপিয়া। কোথায় আবার সেঁটে দেবে মাথায়!

আর এক ঘা মোক্ষম বাড়ি খেলেও দু-হাত সমেত জড়িয়ে ধরলেন সদানন্দ। চাগিয়ে তুলে নিয়ে গেলেন সেলের কাছে। চাবি দিতে সান্ত্রীদের একজন তালা খুলে দিল। ভিতরে নিয়ে যেতেই আবার চাবি আঁটা হয়ে গেল। পাপিয়াকে ছেড়ে দিয়ে অন্তর্বর্তী সেলটার চাবি খোলার জন্যে রিংটা সান্ত্রীরা ফেলে দিতেই তা কুড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। নাচতে লাগল। ইসারা করতে সান্ত্রীরা সরে গেল।

একসময় চাবির রিং ছুঁড়ে মারতে যেতেই লুফে নিলেন সদানন্দ। ভেতরে সেল খুলে ফেলে পাপিয়াকে টেনে নিয়ে চাবি এঁটে দিলেন। দড়ি দিয়ে পা দুটো টানা বাঁধা করে বেঁধে ফেললেন হাঁটুর কাছে। ভেতরে অন্ধকার। বাইরের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে মেঝের এক জায়গায়। হাতদুটোকেও দুদিক থেকে বাঁধলেন। বালা পোঁতা আছে চারদিকে চারটে। নিরাবরণ পাপিয়া তবু কোমর তুলে তুলে দাপাচ্ছে। সান্ত্রীরা টহল দিলেও বাইরে থেকে কিছু দেখার উপায় নেই। টর্চ মারলেন সদানন্দ। কী সুন্দর

চেহারা পাপিয়ার! যেন যৌবনের ডালি। সদানন্দ টর্চ নিভিয়ে খানিকটা পায়চারি করলেন।

রাত এখন বোধহয় দুটো হবে। তাঁর মোটা বউটা এতক্ষণ ঘুমোচ্ছেন। বলেন, 'পাগলীর সঙ্গে পাগলা হয়ে আছ?'

যৌবনকালের ক্ষুধা জেগে উঠল সদানন্দর মধ্যে। ওর জন্যে কত মারও খেয়েছেন তিনি এই বয়েসে। পিঠ পাঁকাল মাছ হয়ে আছে।

আবার টর্চ মেরে দেখলেন। পাপিয়া বলছে, 'আনন্দ, মেদিনীপুর যাব।'

'আমিই তোমার আনন্দ। আমিই তোমার মেদিনীপুর।'

বুকের ওপর পাষাণ চাপল পাপিয়ার।

সে মাথা ঠুকতে লাগল। দাপাতে লাগল। একসময় ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

সদানন্দ তার শরীরের ক্লেদ মুছে দিলেন। তাঁর গা হাত পা কাঁপছে। চাবি খুলে বাইরে এসে আবার চাবি দিয়ে আকাশের দিকে গাল মেলে হাঁপাতে লাগলেন। সান্ত্রীরা টহল দিচ্ছে।

'থাক পড়ে! মশায় খাক! দাপাক! শালা মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিলে ঝামেলা চুকে যায়!' বলে সদানন্দ চলে আসেন নিজের কামরায়। শুয়ে পড়ে থাকেন। ঘুম আসে না আর চোখে। ভোরের পাখিরা ডাকতে থাকে।

দুপুরে পাপিয়া শান্ত। কেবল নীরবে কাঁদছে। নিজেই স্নান করেছে। কাপড় পরেছে। খেয়েছে। এখন ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ চিঠি এল এস ডু সাহেবের। সাব-জেলার সদানন্দকে বললেন, 'ইনি হলেন পাপিয়ার বাবা। মেদিনীপুর বাড়ি। আনুন পাপিয়াকে।'

পাপিয়াকে আনা হলে সে তার বাবাকে চিনতে পারল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকের ওপর। বাবাও কাঁদতে লাগলেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। পাপিয়াও কাঁদছে ফুলে ফুলে।

সদানন্দরও দু'গাল বেয়ে জল গলগল করে ঝরে পড়তে লাগল। তিনি জীবনে কখনো এমন করে কাঁদেননি। বলতে লাগলেন, 'কত মেরেছে, আঁচড়েছে, কামড়েছে আমাকে! কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি ওর জন্যে। এখন নিয়ে চলে যাচ্ছেন—পাপিয়া রে, তুই চলে যাবি?'

জলভরা চোখে পাপিয়া তাকাল সদানন্দর দিকে। স্থির দৃষ্টি।

কাছে এসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হা-হা-রবে পাগলের মতো কেঁদে উঠতেই সাবজেলার কঠোর স্বরে বলে উঠলেন, 'সদানন্দবাবু, এটা জেলখানা! নাটক করার জায়গা নয়!'

পাপিয়া আর তার বাবা গাড়ি করে চলে গেলে এই সাবজেল থেকে অন্য কোনো জেলখানায় স্থানান্তরের নির্দেশ লিখে হাতে গুঁজে দিলেন সাবজেলার।

পাঁজর ভেঙে যেন গুঁড়িয়ে গেছে সদানন্দর। এখানেই বা আর তাঁর

সন্ধি কি আছে ?

চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভ্যাগাবন্ডের মতো টলতে টলতে ফিরে চললেন নিজের বাড়িতে। পাপিয়া ডেকে ডেকে চলে গেল ঃ বউ কথা কও। বউ কথা কও।

ফসল-শূন্য মাঠের পথে চলতে চলতে হঠাৎ হা-হা করে পাগলের মতো কেঁদে উঠলেন সদানন্দ। তাঁর বুকের ভেতরে নতুন কথা জন্ম নিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে গাইতে লাগলেন ঃ

ভালবাসা বড় অপরাধ
ঝরনার মতো ভেঙে ফেলে দেয়
কঠিন শিলার বাঁধ।

জীনের আসর

হিন্দু পাড়ায় ভূত আর মুসলমান পাড়ায় জীন ধরে প্রতি বছর গরম কালটাতে। মুসলমান পাড়ার মেয়েমহলে জোর গুজব জীনে সোমত্ত মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

হেঁতালি দাসী ডিম কিনতে এসে গুজবের আসরে যেন ফোড়ন ছেড়ে দেয়, 'ওলো দিদিরা, পরামাণিক পাড়ায় কাল সন্দেবেলা কী 'চব্বো'! তিনটে কুমারী মেয়ের মুখ বুক আঁচড়ে রাখে নে! বারোটা ছেলে নাকি কামিক্ষে থেকে মন্তর শিখে এসে ভূত-ক্ষ্যাপনা করে গেরাম থেকে গেরামে ছুটে বেড়াচ্ছে। একজনকে ধরে নাকি খুব থেঁতো করেছে সেই শ্যামগঞ্জে। যে প্রথম ধরেছিল তার বউকে নাকি আবার ভূতে ধরেছে। কী জ্বালাতন লো বোনেরা, সাঁজবেলায় হাঁড়িকুঁড়ি গুটিয়ে নে ঘরে দোর দিই। এই গরমে পরান যায়। আমার কর্তা গাছ ছাড়ায়। শুনে বড় গাছ-কাটারি তুলে বলে, 'ভূতকে শালা পাঁঠা-বলি করে ছাড়ব। কই, আসুক দেখি আমার বাড়িতে!'

হেঁতালি চলে যাবার পর রাজ্যের হদিস জানা 'ফুটো কলসী' ময়মুনি বিবি বলে, 'ও সাত-চালানি আন্ডাওলির কথা বাদ দে। ভূত কত রকম আছে! ফোচ্‌কেদের কীর্ত্তি লয়! সাদা ভূত, কালো ভূত, মাম্‌দো, গুঁফো, গেঁড়েল, গুমো, গঘ্‌নো, পেত্নী, আলেয়া, শাঁকচুন্নী, রাক্ষস, দানো, দৈত্য, জীন, কালা জীন, ওবা। মাম্‌দো, গঘ্‌নো, জীন, কালাজীন—এসব মুসলমান-দের ধরে। মাম্‌দো ধরলে 'ক্ষেতি' করে না, তবে হাসতে হাসতে কাপড় খুলে পড়ে যাবে। ছেলেকে দোলা দেবে। স্বামীর জন্যে ভাত বেড়েছ, সে থালা বয়ে নিয়ে যাবে। মাথা বেঁধেছ, সে কোথা থেকে খুব সুগন্ধি ফুল এনে খোঁপায় গুঁজে দেবে। স্বামীর 'সুরত' (মূর্তি) ধরে এসে তোমার সঙ্গে

আস্নাই করবে। কুকুর হয়ে দোরগোড়ায় শুয়ে থাকবে। তবে তোমার শরীর চাটবে রোজ ভোরবেলা। এমন সুড়সুড়ি লাগবে যে নিদ্ পড়ে যাবে। 'শরীল' তোমার সাদা হয়ে যাবে। গঘ্নো ধরলে ময়লা খাওয়াবে। জিন ধরলে চিঁহি চিঁহি করে ছুটবে। কাপড় তুলে নাচবে। আর কালা জীন ধরলে দাঁতে করে পানিভরা ডাবর তুলে নিয়ে যাবে। গাছের মোটা ডাল মড়মড় করে ভেঙে দেবে। যাকে ধরবে তার মুখ দিয়ে রাজ্যের কিছু ব্যক্ত হবে।'

গুজব শুনতে শুনতে হঠাৎ একদিন নুরআলি গাজির বউকে জীন ধরে বসল। গরমে বাইরে শোয়া বন্ধ করেছিল। স্বামীর দরগা আছে সাত-পুরুষের। ঘোড়ায় চড়ে সে গাজিপীরের 'বোস্তানী' গাইতে চলে যায়। ঝোলা ভরা চাল পয়সা আনে। দরগায় যেসব ভক্ত আসে, মানত দেবার পর গোলেনুর বিবির পায়ে 'বোছা' (সালাম) দিয়ে যায়। নুরআলি পাতলা ডিগডিগে মানুষ। ছোট্ট একটু খন্ড-তয়ের মতো দাড়ি। খুব ফরসা রং। গায়ে লাল জামা। মাথায় লাল পাগড়ি। কিন্তু গজল গায় যখন তার তেজি 'জেহেনে' পাড়ার লোকরা জমা হয়ে যায়।

ঘরে ঠিক অভাব না থাকলেও সুখ নেই গোলেনুর বিবির মনে। দশ বছর বিয়ে হবার পর তার সন্তানাদি হয়নি। তার শরীরেও কোনো রোগ নেই। তাহলে তার পুরুষই হলো বাঁজা। তবু কোন ভক্তের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সন্তান না থাকলে দরগার সেবা করবে কে? সপ্তম পুরুষ আগে সেই পাঠান আমলের গোড়ায় বাগদাদ থেকে যে কামেল গাজি পীর ইসলাম প্রচারে এসে এখানে কবরস্থ হয়ে আছেন তাঁর সেবা করবে কে? এতেই তো সংসার চলে যায়। কিন্তু গোলেনুর বিবি স্বামীর বংশ রক্ষাতেও সতীন আনায় সায় দিতে পারে না। স্বামীর বখরা দেবে সে? কোনো মেয়ে পারে?

'ধর্মে এটা বিধান আছে, যদি…'

'রাখো তো তোমার ধর্ম!' খেঁকিয়ে ওঠে গোলেনুর বিবি। আমরা যদি একসঙ্গে তিন-চারটে স্বামী করি?'

'নাউজোবিল্লাহ্!' দাড়িতে হাত বুলোয় নুরআলি গাজি। 'এ মেয়ে-লোককে 'শ্যায়তান' ধরেছে! ধর্মে আছে…'

'আবার বলে ধর্মে আছে! ধর্মে তো অনেক কিছু আছে। মানো সেসব? আরবের খেজুর বাংলার মাটিতে লাগালে কাঁদি কাঁদি মেওয়া খেজুর ফলবে? তুমি বাঁজা হলে গাজিবংশ রক্ষে হবে? আর একটা বিয়ে করবে, মনে কত আসনাই! তাহলে তোমার ঘোড়াসমেত তোমাকে বেহেস্তে পাঠিয়ে দোব।'…

'বোস্তানি' গাইতে বেরিয়ে তিনদিন আর বাড়ি ফিরল না নুরআলি গাজি। তাহলে কি সাদি করে বসল সে?

অথচ মাজারে কোথা থেকে একটা কালো পোশাক পরা চিমটিধারী

লম্বাটে কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। খাবার দিলে খায় কিন্তু অদ্ভুত লোলুপ চোখে তাকিয়ে থাকে আর হাসে। লোকটা নাকি একেবারেই একভরি গাঁজা চড়িয়ে নেশা করে। চোখ দুটো লাল। ভয় করে ওকে দেখলে। রাতকালে যদি উঠে আসে? লোকটা তৃতীয় রাতে মেলা সাকরেদ জুটিয়ে কাওয়ালি গেয়ে আসর মাৎ করে দিলে।

সকালে ফিরে নূরআলি ঘোড়া বেঁধে রেখে মাজারের দিকে তাকাতে কালো পোশাকের লোকটাকে একবার মাত্র দেখতে পেলে, তারপর গায়েব। বাড়িতে ঢুকে শুনলে গোলেনুর বিবিকে নাকি জীনের 'আসর' (ভর) হয়েছে।

স্বামীর আসার সাড়া পেয়ে গোলেনুর বিবি সালাম জানিয়ে হঠাৎ ঘাঘরা তুলে নাচতে শুরু করে দিলে। হাততালি মেরে কোমর দুলিয়ে চোখ ঠেরে ঠেরে গান গাইতে লাগল ঃ

'তোমার জন্যে হলাম হন্যে
একলা জেগে রই—
তুমি এলে ঘোড়ায় চড়ে
চাঁদ-বদনী কই ?'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নূরআলি। যে বউ কখনো নাচত না, তালে তালে পা ফেলে নাচে সে? থালা বাজায়? হাঁড়ি বাজায়? বলে, 'আমি এসেছি তোমার দোস্ত। কালো পীরহান গায়ে আমাকে দেখেছ? আমার কাওয়ালী শুনে গোলেনুর বিবি মাৎ হয়ে গেল। সে আর আমি এখন দুজন নয়, এক!'

স্বামীকে ধরে গোলেনুর সাতপাক দিয়ে ঘোরালে সে 'বাবারে বাবারে' করে চেঁচাবার পর ছেড়ে দিতে তবে যেন প্রাণে বাঁচল।

এরপর বাড়ির উঠোন, খামার, মাজারের চারদিকে চিঁহি চিঁহি করে ছুটতে থাকে গোলেনুর। তার গায়ে এখন প্রচণ্ড ক্ষমতা। বেঁধে রাখলেও চড়চড় করে দড়ি ছিঁড়ে ফেলে। উনুনের জ্বলন্ত আগুনের ভেতরে হাত ঘোরায়।

সবাই বুঝল কালাজীন ধরেছে। জীনের জন্ম আগুন থেকে। তাতে সে পোড়ে না।

জীন ছাড়ানো আদমবারি মস্তানকে আনা হ'ল। ইয়া চাব্বা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। পরের গোস-রুটি-পোলাও-কাবাব খাওয়া ইয়া ভুঁড়িঅলা হেই লম্বা চেহারা। দু'শ টাকা ফিজ। তাকে দেখে গোলেনুর বললে, 'সালা-মালে-কম মিয়াজান! এসো তো দেখি! তোমায় নিয়ে একটু নাচি!'

'চোপ হারামজাদী! জীনের আসর হয়ে লজ্জাশরম খেয়েছিস? আগুনের পয়দাস! তোর দীলে রহম (দয়া) নেই। ভাল চাস তো চুপ করে বস, নইলে জুতো মেরে 'খালবোস' খুলে নেবো। আমার

নাম আদমবারি মস্তান। তোর মতন কত জীনকে আমি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'মোল্লাদের মধ্যে তুমি একটা মোরগ-কোঁকরের কোঁক!'

নূরআলি তার বউকে ধরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মস্তান-মৌলবীর সামনে বসাল। জীন ছাড়ানো দেখতে চারদিক থেকে সবাই ছুটে আসছে। মেয়েরা দাবাতে উঠেছে, ছেলেরা উঠোনে। উঠোনের মাঝখানে মাদুরি পেতে বসেছে আদমবারি।

থাটুমালা হয়ে বসার পর গোলেনুর বিবি বলল, 'উঁ। মিয়াজানের গায়ে ঘামের গন্ধ। দাড়িতে উকুন!' হঠাৎ পাগড়ি খুলে নিতেই চকচকে টাক দেখে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল যেন।

আদমবারি অপমানে চোখ গুলিভাঁটা করে হঠাৎ উঠে পাগড়ি ছিনিয়ে নিতে গেলে গোলেনুর নাচতে নাচতে বলতে লাগল, 'পিঁয়ারা দোস্ত এসেছ যখন তখন তোমার মুখ দিয়ে রক্ত তুলব আমি—আমার নাম বরজাহান কালাজীন। দেখ কত ক্ষমতা ধরি। আনো এক ডাবর পানি।'

ডাবর ভরা জল এনে দিতে দাঁতে নিয়ে তিন বেড় ঘোরাবার পর আদমবারি তার পিছু পিছু মাথায় রুমাল দিয়ে গিয়ে 'এসম্ আজম' পড়ে ফুঁক দিতেই গোলেনুর পড়ে গেল। হাত পা খিঁচতে লাগল। আদমবারি তখন তার চুল ধরে টেনে বসিয়ে পিঠে তিন ঘা চাপড় কষালে খুব জোরে। কাৎরে উঠে গোলেনুর বলে উঠল, 'মাগো!'

'বসো, আমার কথার উত্তর দাও। কেন তুমি নূরআলি গাজির স্ত্রীর ওপরে আসর হলে?'

'আমি যখন গাজিবাবার মাজারে আসি সে আমার দিকে রহমন্দীলে তাকিয়েছিল। কাওয়ালি শোনার সময় সরবৎ পাঠিয়েছিল—তাতে সিদ্ধি মেশানো ছিল।'

'কখন তুমি ভর হলে?'

'ভোররাতে।'

'গোলেনুরের আকাঙ্ক্ষা কি?'

'সন্তান। তার স্বামী 'মওগা', তবুও আবার একটা বিয়ে করে এসেছে ভক্তবাড়িতে।'

নূরআলি গাজি জানালো দুটোই মিথ্যা কথা।

'মিথ্যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লার কাছে। পরস্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার ঘোরতর-অপরাধ। যদি এখনি গোলেনুরকে ত্যাগ করে না যাও তোমার বাপেরও বাঁচোয়া নেই।'

ঝোলার ভেতর থেকে একটা ডিবে বার করে হিং আর বাতাসা গুলে জোর করে খাওয়ালে গোলেনুরকে। গোলেনুর বললে, 'একেবারে পাঁঠার গন্ধ!'

খানিকটা আতর নিয়ে নাকে-মুখে-কাপড়ে ঘষে দিতে খুশী হলো

গোলেনূর। তারপর তালি বাজিয়ে বাজিয়ে কাওয়ালি গাইতে লাগল।

আদমবারি তখন দোয়া-দরুদ পড়ছিল উঠোনে বসে দাড়ি নেড়ে নেড়ে। ফুঁ ফাঁ দিচ্ছিল দূর থেকে। সে যখন মাটিতে মাথা নামিয়ে 'সেজ্‌দা' করছিল, হঠাৎ গোলেনূর লাফ দিয়ে এসে তার ঘাড়ে বসে মাথাটা ধরে খুব করে ঠুকতে লাগল। কে তাকে ছাড়াবে এখন? কামড়ে-আঁচড়ে রক্ত বার করে ছাড়বে!

আদমবারির দাড়িই তার কাল হলো। তাই ধরে তাকে টেনে চিৎ করে যেন ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঘোরাতে লাগল। কিল মেরে দাঁত ভেঙে দিলে। রক্ত ঝরতে লাগল। ছেড়ে দেবার পর বললে, 'এখন বুজরুকি বন্ধ করে এখান থেকে পালাবি কিনা বল। নাহলে তোর পেট ফাটিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দোব। দেখছিস আমার নখ!'

আদমবারি পাগড়ি ঝোলা বগলদাবায় নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

মাজারে আবার সেই লম্বা কালো লোকটাকে দেখা গেল। হাতে তার চিমটি। মাঝে মাঝে 'ইল্ ইল্' শব্দ করে।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা গোলেনূরের মুখচোখ লাল হয়ে গেছে। দাঁত লেগে আছে। মাথায় জল চাপড়ে ভেতরে তুলে নিয়ে গেল নূরআলি। এমন খাপসুরত বউ তার কেন এমন হয়ে গেল! দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা শোনানো বোধহয় ভুল হয়েছে। স্ত্রীর পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল নূরআলি। কাঁদতে লাগল সে। লোকজন সবাই চলে গেল। কেউ কেউ বলতে লাগল, 'এ মাজারের জীন বড় জবরদস্ত। তাকে তাড়ানো যাবে না। আসলে কালো পীরহান গায়ে লোকটাই জীন।' সে এখন মাজারের মাইকে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে কোরআন শরিফ পড়ে চলেছে।

তাকে তাড়াবার ক্ষমতা নেই নূরআলির। তার অন্ধ-প্রায় বুড়ো মা আর কি করবে?

পরদিন সকালে গেলেনূরকে শান্ত দেখাল। মুখহাত ধুয়ে এসে নাস্তা করল। মাজারে মাংস-পরোটা নাস্তা পাঠাল বরজাহান নামের কালো পোশাকের মুরিদানটার কাছে। সে সারারাত কোরআন শরিফ 'তেলায়ত' (পাঠ) করেছে।

'আমি এখন মৌরিগ্রামে যাব, না গেলে তো সংসার চলবে না গোলেনূর!' নরম স্বরে অনুনয়ে বলল নূরআলি।

'যাও।' বললো গোলেনূর।

পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল নূরআলি। কাজের মেয়েটাকে মুরগি জবাই করে এনে বিরিয়ানি পাকাতে বলে মাজারের পশ্চিমদিকের ফুলবাগান ঘেরা চবুতরায় এসে বসে রইল গোলেনূর। সামনে শানবাঁধানো পুকুর। খুব গভীর। তার ওপারে ফসল ওঠা শূন্য মাঠ। বহুদূরে পাকা রাস্তায় বাস লরি ছুটছে।

লবঙ্গলতার ফুলে চবুতরার চাতালটা ঘিরে আছে। সুগন্ধে বাতাস

ম-ম করছে। শুয়ে পড়ল গোলেনুর। তার গায়ে যেন অসহ্য ব্যথা। মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হচ্ছে হাল্কাভাবে। আগের দিন হচ্ছিল তীব্রতর। খোলা মাঠের বাতাস লেগে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ পরে কে জানে পায়ে যেন কেউ হাত বুলোচ্ছে মনে হলো। ঘুম ভেঙে যেতে তাকাল। সেই কালো পোশাকের লোকটা! তেমনি মানুষের মূর্তিতে বসে আছে মাজার থেকে বেরিয়ে এসে। দু'হাতে তাকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে মুখটা ধরে দেখতে লাগল। বলতে লাগল, 'আমাকে তুমি ঘৃণা করো?'

গোলেনুর নীরব রইল।

'আমি কতদূর থেকে এসেছি। জীবনে কখনো আমি ভোগ-সুখ চাইনি। কেবল তপস্যা করেছি। গোটা পৃথিবীর মসজিদ-মাজার-জিয়ারত করে ফিরেছি। এখান থেকে চীনদেশে চলে যেতাম। তুমি কেন আমার দিকে অমন করে তাকালে? চোখ মেলে তাকাও।'

গোলেনুর চোখ মেলল—বরজাহানের লাল দুটো চোখ দেখতে লাগল। কী সুন্দর সাদা দাঁত! ঠোঁটভরা হাসি! কোলের ভেতর মুখ লুকোলে সে লজ্জায়।

মানুষ যে সুখ দিতে পারে না সেই চরমতম সুখের সমুদ্রে অবগাহন করালে জীন বরজাহান। পুকুরের শীতলজলে স্নান করে বাড়িতে এসে খাটের বিছানায় পড়ে সুখের ঘুমে হারিয়ে গেল গোলেনুর।

নূরআলি ফিরে আসার পর তাকে রাঁধুনী মেয়েটা গোপনে জানাল গোলেনুর মাজারের পাশের চবুতরায় কেমন করে গাঁজাখোর বরজাহান মুরিদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে এসেছে। ঐ লোকটাই যত নষ্টের মূল। ও আসলে একটা কালাজীন।

নূরআলি জাগাল গোলেনুরকে। তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বললো, 'তুমিই 'মাশুক' হয়েছ ঐ বরজাহান কাওয়ালি আলার?'

নীরব রইল গোলেনুর। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, 'তুমি বিয়ে করে আনো। আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রেখো না। জীন হলেও ও আমার জন্যে বাবার মাজারে খাদেম হয়ে থাকবে। তুমি চাইলে অনেক মালমাত্তা দেবে।'

'মালমাত্তা দেবে?'

'হাঁ। অনেক সোনা-রুপো। টাকা-পয়সা। যা চাও তুমি। আর ভিক্ষেয় যেতে হবে না। মাজারেও খুব রমরমা হবে। আমাকে 'জউরো'য় পেয়েছে বলে রটিয়ে দাও, কিন্তু আমাকে তুমি আর ছুঁয়ো না। তাহলে আবার জীন বিক্রম ধরে আমাকে নাচাবে। তোমাকে মেরেও ফেলতে পারে।'

গোসল (স্নান) করতে চলে গেল নূরআলি। এসে দেখল রাঁধুনীটা দোরগোড়ায় পড়ে মুখ রগড়াচ্ছে। আর চৌকিতে বসে খানা পাকাচ্ছে বরজাহান।

তার কাছে গিয়ে নূরআলি বললো, 'কে তোমাকে বাড়ির ভেতরে আসতে

হুকুম দিয়েছে ?'

'গোলেনুর। আমি ভাল রান্না জানি। ডাকো সাতশো মানুষকে। এই বিরিয়ানি খাওয়াও—দেখবে ফুরোবে না। পাতকোঁয়ায় গিয়ে দেখ সব পানি জমে দই হয়ে গেছে। আর চবুতরায় বিশ ডেকচি জর্দা পোলাও (মিষ্টি) আছে, মানুষজনকে ডেকে খাওয়াও।'

গোলেনুর এসে বললো, 'ওর কথা শোন, মাথা গরম করো না। তা যদি করো আমি এই মাজার ছেড়ে ওর সঙ্গে চলে যাব।'

ঘোড়ায় চড়ে নুরআলি বেরিয়ে গেল। আর তার ফেরার সময় খাবার লোভে পঙ্গপালের মতো মানুষ ছুটে আসতে লাগল।

সাতশো মানুষ খেয়ে চলে গেল।

মাজারে তখন কোরআন শরিফ তেলায়ত হচ্ছে। অপূর্ব লীলায়িত স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করে বরজাহান।

কিন্তু প্রতিরাত্রে গোলেনুর চবুতরায় চলে যেতে থাকলে নুরআলি বরদাস্ত করতে পারল না। আড়াল থেকে দেখেছে ওদের কীর্তিকলাপ। অসহ্য।

তাই সে সতেরোজন এলেমদার জীন-ছাড়ানেওয়ালা এনে হাজির করল। তাঁরা দোয়া-দরুদ পড়ে মাজার বন্ধ করলেন। জীন চলে গেল।

কিন্তু চবুতরায় মরা লাস পড়ে রইল গোলেনুরের। তার গালের কষবেয়ে কাঁচা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে।

জীনের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেলেও নুরআলির মনের দুঃখ ঘুচল না। সে একদিন জানল, সতেরোজনের গুণীনদলই জীন বলে প্রচার করা কালো পোশাকের মানুষটাকে মেরে রাতারাতি চবুতরার নিচে গোর দিয়ে দেন আর গোলেনুর এসে আপত্তি করতে গেলে তারও গলা টিপে শেষ করে দেয়।

গোলেনুর নাকি বলেছিল, 'আমি মা হয়েছি—আমাকে মেরো না। আমাকে বরজাহানের সঙ্গে যেতে দাও। দোহাই, ওকে মেরো না। ও মস্ত এক আলেম। খুব বড় গায়ক…'

নুরআলি গাজির গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'ভিক্ষে করে আমি গোলেনুরের মাজার গড়ব—তাকে আমি ভুলতে পারব না।'

মাকড়সা মাসি

শিয়ালদা স্টেশনে গ্রামাঞ্চলের দু'টি ষোড়শী যুবতী বোকার মতো এদিকে-সেদিকে এটা-সেটা দেখে নিজেরা লাজুকভাবে হাসাহাসি করছে বেশ কিছুক্ষণ। নজরে পড়ল রেণুকা দাসের। দুটি মেয়ের পরনে হাল্কা ছাপাশাড়ি। পায়ে হাওয়াই স্যান্ডেল। কারো অপেক্ষায় আছে নাকি ওরা? পান কিনতে কিনতে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখল রেণুকা। গেটের দিকেও এগোচ্ছে না, গার্ড'রা টিকিট চেক করছে। কাছে গেল রেণুকা। বলল, 'কোথায় যাবে তোমরা? কে আছে সঙ্গে? টিকিট আছে তোমাদের?'

দুজনেই যেন ভড়কে গেল। একজন বলল, 'না দিদি, আমার টিকিট ফেলে দিইচি। আমরা দুজনে এসেছি কলকাতায়। আমাদের বাড়ি মন্দির-বাজারে।'

'নতুন এসেছ বুঝি?' কী নাম তোমার?'

'চন্দনা মাইতি। আর ওর নাম রিজিয়া খাতুন। মন্দিরবাজারে ওর মা চাল-ব্যবসা করে, আর আমার মা আনাজ ব্যাচে।'

'তোমাদের যাবার পয়সা আছে?'

'হ্যাঁ, কিছু কম পড়েছে। তাই ওদিকের চেনা লোক কেউ যায় কিনা দেখছি।'

'যদি কোন চেনা লোক না পাও? এভাবে আসো কেন? সারাদিন খাওয়াও হয়নি বুঝি? এসো, দিদি বলেছ যখন খাওয়াই কিছু।'

পুরি, আলুর তরকারি, দুটো করে মিষ্টি খাইয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চন্দনা আর রিজিয়াকে ইলেকট্রিক বাল্ব তৈরির কারখানায় কাজ দেবার নাম করে নিজের বাসায় আনল রেণুকা। তার স্বামী নন্দকিশোর বলল, 'এরা আবার কারা গো? দেশের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের মেয়ে নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমার হাসপাতালে আজ নাইটডিউটি আছে ভালই হল, বোনেদের নিয়ে শুয়ে থাকব।'

রাত্রে রাঁধাবাড়ার সময় অনেক কথা বলল রেণুকা। কত মেয়েকে সে কোথায় কোথায় চাকরি পাইয়ে দিয়েছে। তারা এখন রোজগার করে খাচ্ছে। পুরুষরা এখন চাকরি করা মেয়েদেরই বিয়ে করতে চায়। যা বাজার পড়েছে তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বলল, 'তোমাদের মতো গরিবঘরের মেয়েদের বিনাপণে কি আর কোন রোজগারি ছোঁড়া বিয়ে করবে? কত মেয়ের কত বয়স হয়ে গেছে, বিধবা কি কুমারী বোঝাই যায় না।'

চন্দনা হাসে রেণুকাদির কথা শুনে।

রিজিয়া একসময় বলে, 'আমার মা এতক্ষণ ইস্টিশনে বসে আছে। কত খোঁজ করতেছে আমার। গেলে খুব মারবে।'

চন্দনা বলল, 'আমাকেও।'

রেণুকা বলল, 'মারলেই হল। যাব আমি সঙ্গে। ভয় নেই তোমাদের।'

ঘুম হল না, প্রায় সারারাত জেগে রইল চন্দনা আর রিজিয়া। কলকাতা শহরে কতরকম শব্দ। রেণুকাদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

সকালে দুজনকে চা খাইয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কাজের কথা বলতে যাচ্ছি, যতক্ষণ না আসি বাইরে যাবে না। শহরে নানারকম খারাপ স্বভাবের লোক আছে। ঢুকে পড়ে তোমাদের সর্বনাশ করে যেতে পারে। তোমরা কাউকে চেনো না। তাই চাবি দিয়ে যাচ্ছি।'

বন্ধ ঘরে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল কলকাতায় হঠাৎ এমন করে এসে পড়ার জন্যে। এবার কি হবে? যদি রেণুকাদির বরটা এসে অত্যাচার করে?

রেণুকা এলো একেবারে দুপুরে। বলল, 'আমার দেরি হয়ে গেছে রে বোনেরা। চাকরি বলে কথা! সহজে কি হয়? কত মেয়ে লেখাপড়া শিখে ঘুষ দিয়েও এখন চাকরি পায় না। ওবেলা দুজন লোক আসবে তোমাদের দেখতে। তারাই টুনির কারখানার মালিক।'

রিজিয়া বলল, 'না দিদি, আমরা বাড়ি যাব।'

ধমক দিলে রেণুকা, 'তুমি থামো তো! কচি খুকি, বাড়ি যাবে। আমি লোককে কথা দিয়ে এলাম!'

রান্নার পর ভাল করে স্নান করিয়ে আহারাদি করাল ওদের রেণুকা। তারপর চুল বেঁধে দিলে। খোঁপায় ফুল গুঁজে, কপালে লাল ফোঁটা, নখে পালিশ লাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তোদের আমি বিয়ে দেবো। তোরা আসলে বর-পাগলা হয়েই পালিয়ে এসেছিস! এই বয়সে এই রকম হয়। আচ্ছা, তোদের যদি সত্যিই আমি বিয়ে দিই?'

চন্দনা লজ্জায় হাসতে থাকে। রিজিয়া কিন্তু গম্ভীর।

দুজন বুড়ো মত লোক এলো বিকালে। ঘরের মধ্যে আনল তাদের রেণুকা। পরিচয় করিয়ে দিলে।

এক বুড়ো বললে, 'আমার নাম আছে শ্রীবাস্তব। দেশে আমার জমিন আছে। আউর ভইসা আছে। এখানে বি কারখানা আছে। ও লোগ বি আছে নন্দকুমার। ও আমার পরজা আছে। কারখানার ম্যানেজার আছে। তোমরা দুজনায় কাজ চাইছ তো?'

রেণুকা বলল, 'হ্যাঁ, কাজ চায় বৈকি। কত করে মাইনে দেবেন আপনি তাই বলুন?'

'এখন লতুন বি আছে, কাম শিখতে হোবে। দুশো রুপিয়া মাহিনা দিব আমি।'

রেণুকা বলল, 'দুশো টাকায় খাবে কি, থাকবে কোথা? বাড়ি গেলেও

ট্রেনের ভাড়ায় মাইনে শেষ। চারশো টাকা দিতে হবে। আর এখন কিছু অ্যাডভ্যান্স চাই। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।'

'এ লো—দুশো রুপিয়া।'

দুজনকে দুশো টাকা হাতে গুঁজে দিলে বুড়ো শ্রীবাস্তব।

নিলে ওরা। রেণুকা বিস্কুট মিষ্টি আনলে। রেণুকার বর এসে সব দিয়ে গেল।

শ্রীবাস্তব বললে, 'রেণুকাদেবী, একটা বাৎ আছে। আমার কারখানা এখন এক হপ্তা বন্ধ থাকবে। আমরা দোনো ভি দেশে যাচ্ছি।'

রেণুকা বললে, 'নিয়ে যাবেন নাকি আমাদের ?'

'হাঁ, হাঁ। বহুৎ আনন্দের কথা। চলুন আপনি। এদেরও নিয়ে চলুন। বেড়িয়ে আসবে। ট্রেনের ভাড়া আমি দিব।'

'কি করবি রে মেয়েরা, যাবি ? কত নদী, পাহাড় দেখবি। আমি সঙ্গে থাকব। আমার হাসপাতালের কাজ অবশ্য কদিন কামাই হবে।'

শ্রীবাস্তব জানাল, 'আমাদের ভইসার দুধ খাবে। পেঁড়া খাবে। মকাই খাবে। লিচু, আম, আঁজির খাবে। কত তামাকের ক্ষেতি, ইক্ষুর ক্ষেতি দেখবে। চলিয়ে না, কিছু ডর নাই।'

রেণুকা চন্দনা আর রিজিয়াকে আড়ালে এনে বলল, 'টাকার কুমীর ঐ দুজন। ওদের কারখানায় কত মেয়ে আছে, কাউকে নিয়ে যেতে চায় না। গেলে তাদের ভাগ্য খুলে যাবে।'

চন্দনা বলল, 'তুমি একবারও গেছ দিদি ?'

'কি বলে, যাইনি ? শ্রীবাস্তব যখন হাসপাতালে ছিল তখন পরিচয়। ভাল হয়ে পাঁচশো টাকা, একটা হার আর একখানা বেনারসী শাড়ি দিয়েছিল আমাকে। আমি তো নার্স। চল বেড়িয়ে আসি, আর দ্বিধা করিস না। বসে থাকলে ভাগ্য খোলে না। শহুরে মেয়েরা দৌড়ঝাঁপ করে, তাই তাদের এত উপায়। ভয়ও কাটবে তোদের। ভেবে দেখ তোরা। আমি চলে যাব—তোরা থাকবি কোথা ? কারখানাও চিনিস না, পরে কোথায় আসবি ? তাই টাকা ফেরৎ চেয়ে নিতেও পারে। বাড়ি যাবি তোরা কি দিয়ে ?'

দুজনকে কিছুক্ষণ ভাবতে দিয়ে রেণুকা শ্রীবাস্তবের কাছে চলে এলো। বলল, 'কোনটাকে আপনার পছন্দ ?'

শ্রীবাস্তব বললে, 'ঐ ফরসা রিজিয়া খাতুনকে। ওর নাম পাল্টাতে হবে।'

নন্দকুমারের চন্দনাকে অপছন্দ নয়।

পরদিন পাঁচজনে ট্যাক্সি চড়ে হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। ট্রেনে ওঠার ধস্তাধস্তির সময় শ্রীবাস্তব যেন জোয়ান মানুষের মতো বগলদাবায় পুরে নিয়ে দুটি মেয়েকে সিটে বসাল। টাকা দিল রেলকুলিদের।

শ্রীবাস্তবের পাশে রিজিয়া। নন্দকুমারের পাশে চন্দনা। রেণুকা রিজিয়াকে বলে দিলে, 'তুমি নাম বলবে পাপিয়া রায়।'

ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। রিজিয়া কাঁদতে থাকল। বলল, 'না, আমি

যাব না। মা কত কাঁদবে। ভাইরা কাঁদবে। আমি যাব না।'

রেণুকা হাতের সেপ্টিপিন ফুটিয়ে দিল। বলল, 'কাঁদবে না একদম! লাথি মেরে ফেলে দোব তাহলে!'

কলা দিতে চন্দনা নিল না। সেও মুখ আড়াল করে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

খড়গপুর ছাড়িয়ে গেল।

রেণুকা ওদের নিয়ে কাছে বসে গল্প করতে লাগল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘুগনি, ডালপুরি, শোনপাপড়ি, নলেনগুড়ের সন্দেশ খাওয়াল। বুড়ো দুজন ঘুমোতে লাগল।

রেণুকা বলল, 'কাঁদতে থাকলে পুলিশ ধরবে। তখন আর খারাবির শেষ থাকবে না। নিয়ে গিয়ে তুলোধোনা করবে। মানইজ্জতের আর কিছু বাকি থাকবে না।'

পাটনার পর লোকাল ট্রেনে মজঃফরপুর। তারপর হাঁটাপথে রাত বারোটার সময় একটা গ্রামের মধ্যে শ্রীবাস্তব আনল।

মোষগরুর খাটাল। ইটের পাঁচিলের গায়ে টালির চাল নামানো। সেই ঝুপড়িই নাকি পাকাবাড়ি। খাটিয়ায় পড়ে আছে লোকজন ময়লা কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে। খড় বিছিয়ে 'বিস্তারা' পাতল শ্রীবাস্তব মাটির মেঝের ওপর। মশার রাজ্য। এত কড়া শীত জীবনে কখনো অনুভব করেনি চন্দনা বা রিঙ্কিয়া। তারা থরথর করে কাঁপছিল। লেপকাঁথার মধ্যে ঢুকে পড়ল তিনটি মেয়ে।

পরদিন সকালে দুটি মেয়েকে দুই বাড়িতে বন্দী করে রাখা হল। সন্ধ্যায় নাকি বিয়ে হবে বুড়ো দুজনের সঙ্গে। তাদের জোয়ান জোয়ান ছেলে বউ আছে অনেকগুলো করে।

রেণুকা দু'হাজার করে চার হাজার টাকা নিয়ে চলে এলো মোষের গাড়িতে চড়ে। লোকাল ট্রেনে পাটনায় এসে কলকাতাগামী ট্রেন ধরে চারদিন পরে বউবাজার বস্তিতে এসে পৌঁছল। সারাদিন ঘুম দেবার পর চাঙ্গা হয়ে উঠে আবার সাজগোজ করে মেয়ে শিকারের খোঁজে বেরুল। অনেক সময় সে বজবজ, নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং—নানান জায়গায় চলে যায়। অভাবী, মোটামুটি দেখতে ভাল, যৌবন-পরিপুষ্ট মেয়ে দেখলেই চাকরি পাইয়ে দেবার কথা বলে। বাসায় এনে রাখে দু-একদিন। তারপর চালান করে পাটনা, গয়া, বারাণসী, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর, শিলিগুড়ি, গৌহাটিতে।

আগের জীবনে সে গোসাবার পল্লীতে এক চাষীর বাড়িতে জন্মে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। অনুকূল পাল নামের একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে তার কুটুমবাড়িতে কদিন ঘোরাঘুরি করার পর ট্রেনে চড়ে বোম্বাই যেতে গিয়ে পুলিশের হাতে বিনা টিকিটের দায়ে ধরা পড়ে। তারপর কত হাত ফিরি হয়ে খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জের পতিতালয়ে

এক মাসির কাছে আশ্রয় পায়। মাসিরা বেশিদিন এক জায়গায় তাদের রাখে না। এক মাসি আর এক মাসিকে দশটা মেয়ে পাঠায় আর দশটা নিয়ে আসে। নতুন মুখ না দেখলে খদ্দের আসে না ভাল।

কুড়ি বছর পতিতাবৃত্তির পর এখন মেয়ে পাচারের ব্যবসা তার। নিজের নাম বলে নানারকম : মন্দাকিনী, রেণুকা, অহল্যা, কল্যাণী, সোমা ইত্যাদি। সব সময় উপাধিটা রাখে দাস। কারণ এটা বাবার উপাধি। তার বুড়ো মা বাবার কাছে যায়ও সে। ভাইরা দূর-ছি করে। কিন্তু আপেল, লেবু, কলা, মিষ্টি, কাপড়-চোপড় কিছু কিছু টাকা দিতে থাকলে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বুড়ো বাপকে একখানা ইটের ওপর টালির ছাউনি ঘর তৈরি করে দিয়েছে রেণুকা। ব্যাঙ্কে তার এখন হাজার আটান্ন টাকা জমেছে। লাখ টাকা হলেই এই মেয়ে শিকারের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দিকে জমি কিনে ছোট দু কামরার একটা পাকাবাড়ি বানাবে। ছেলেমেয়ে তার প্রথম দিকে দু-তিনটি গর্ভে এসেছিল কিন্তু পৃথিবীর আলো আর তারা দেখতে পায়নি। তারপর তার ক্যানসার হতে হাসপাতালের লেডি ডাক্তার জরায়ু কেটে তুলে ফেলে দিলেন। এখন কেবল তার একটি পুত্রসন্তানের বাসনা। কিন্তু ছেলে চুরি শক্ত ব্যাপার। মেয়ে চুরি গেলে কিছুদিন মানুষ খোঁজে। তারপর চুপচাপ হয়ে যায়। ঝাড়ের বাঁশ বেরিয়ে গেছে যাক! কে আর তাকে ঘরে তুলবে?

বছর খানেক পরে শিয়ালদা স্টেশনে চন্দনা এসে পুলিশের কর্তার সঙ্গে দেখা করে তার জীবনের দুঃখের কথা জানাল। আর রেণুকা দাসকে দেখিয়ে দিল।

ধরা পড়ল রেণুকা। তার পিঠের কাপড় সরিয়ে ধরে রাখল দুজন মহিলা পুলিশ। আর একজন মরদ-কা-মাফিক হেই জওয়ান মহিলা পুলিশ দু-হাতে গায়ের জোরে যখন রুলবাড়ি কষালেন, রেণুকা 'বাবারে' বলে আছড়ে পড়ল। তার ব্যাগ থেকে ব্যাঙ্কের পাশবই পাওয়া গেল। ঠিকানায় গিয়ে তার ঘর সার্চ করে যে ডায়েরি মিলল তাতে একান্নটা মেয়ের নাম পাওয়া গেল। নানান দিকে তারা আছে।

যেন একটা হাওড়া স্টেশন রেণুকা দাস নিজে। পঞ্চাশটা লাইন চলে গেছে। খুঁজে আনো এবার মেয়েদের। রেণুকার টাকাকড়ি সিজ হয়ে গেল।

এতগুলো মেয়ের ব্যবসা করেছিল। তার জন্যে পুরস্কারের বদলে এই পুঁতিগন্ধ সমাজের শাসনে নেমে এলো কিনা কারাবাস।

রেণুকা স্মৃতির ট্রেন ধরে এক একটা মেয়েকে নিয়ে এখন কেবল চলে যেতে থাকে মজঃফরপুর, পাটনা, গয়া, কাশী, পুরী······

একদিন সে স্বপ্ন দেখল : একান্নটা মেয়ের মা এক জায়গায় গুড়ের কলসীর মতো বসেছে কান্নাগোলের মিটিংয়ে। আর সভানেত্রীর মতো বক্তৃতা করছে রেণুকা, 'শোনো মায়েরা শোনো···'

শুকাগাটির মহাজন

জুনপুটের চরে শুঁটকিমাছ ব্যবসায়ীরা ছামাড় বা দরমার ঘর বেঁধে বসে আছে প্রায় শ'আড়াই। কার্তিক থেকে মাঘের শেষ পর্যন্ত এই শীতকালের চার মাসটাই যা রোজগার। দীঘা থেকে জুনপুট, কাঁথি, রসুলপুর, এমন কি নরঘাট, নন্দকুমার পর্যন্ত এলাকার গ্রামগুলোর বাসিন্দা এরা। ছৈ-ঘেরা কুঁড়ের ভেতর খাটিয়া বা বাঁশের পাড়নের মাচায় কাঁথা-কম্বলমুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে হয় রাতকালে। বঙ্গোপসাগরের হু-হু করে বয়ে চলা উদোম ক্ষ্যাপা হাওয়া যেন বড় বড় নখ আর দাঁত বের করে পাগলের মত হিমেল নিঃশ্বাস ফেলে কামড়াতে আসে। দূরের ঘরে বউ ছেলেরা পড়ে থাকে। মাছের পচা গন্ধে যেন মাথা ধরে থাকে। পেট গুলোলে আঁষটে গন্ধে বমি হবে। ভাত বাড়লেই কালো মাছিতে ছেঁকে ধরে। নোনা হাওয়ায় পুরনো তেঁতুল-জল নুন দিয়ে গুলে ভাত খেয়ে নাও সপাসপ। নইলে 'পেট নাবালে' রাতকালও পার হয় না। মাত্তর আড়াই ঘণ্টার ভেদবমির পর চরের বুকে চিতা জ্বলে ওঠে। কেবল মেদিনীপুরের রোদ-পোড়া সাগরজলে মানুষ হওয়া কালো কালো মানুষরাই এই নোনা হাওয়া সইতে পারে।

সমুদ্রের পাড়ের ওপর দোকানপাট, টিউবওয়েল, ফ্রন্ট সরকারের তৈরি করা মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর্মশালা। পাকা দালান কোঠার বিশ্রামশিবিরে জাল বোনে জেলে। নৌকো গড়ছে বলাগড়ের মিস্ত্রিরা। 'বর' উপাধিধারী ছেলের মেয়েরা বাড়তি সময়ে 'অসারিকা' হয়ে জাল বুনছে; বোনা শেখাচ্ছে নতুন মেয়েদের। আড়াইশ টাকা মাইনে ওদের। লঞ্চের তেল রাখার গোডাউন। ছ-মাইল লম্বা মিহি-মাঝারি-মোটা জাল পেতে বড় বড় জেলে মহাজন সমুদ্র থেকে যেসব 'বাগদা খাড়ি' চিংড়ি তুলে আনবে তার রক্ষণাবেক্ষণের জায়গাও করা হয়েছে। সরকার থেকে সেই মাছ নেবার বাবুও বসে আছেন একটি অফিস ঘরে। তিনি গ্রুপের কয়েকজনকে ঋণ দিয়ে মোটর সমেত প্রায় লাখখানেক টাকার বড় আর উঁচু বাড়ের ১১/১২ লাইন কাঠের নৌকো গড়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন। পশ্চিমদিকে তীরের অবক্ষয় বন্ধের জন্য ঝাউবন তৈরি করা হয়েছে।

চরে নেমে এসে দেখলে ধোঁয়াটে দক্ষিণ আকাশের তলায় সেই বহুদূরে সাগরের জল। এখন আর পাহাড় ভাঙা ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জন নেই। জলের কিনার ধরতে গেলে দু-মাইল হেঁটে হেঁটে নেমে যেতে হয়। জোয়ার নেমে যাবার পর ঢেউয়ের নকসা-কাটা দাগ। 'খাঁজে খাঁজে' জল জমে আছে।

ঝির ঝির করে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। মরা নীলাভ সুন্দর ঝিনুক পড়ে আছে। ক'টা আর কুড়োবে তুমি।

বেলা তিনটের সময় ভাঁটা পড়তে মাছ উঠেছে। পাড় থেকে দেখলে মনে হবে জলের কাছাকাছি যেন মেলা বসেছে। অনেক লোকের নড়াচড়া। সবুজাভ তাঁবু খাটানো আছে যেন তার কাছেই।

সার্কাস বসে ওখানে? তা নয়। বাঁশ পুঁতে চারকোণা মশারির মতো দু-মানুষ উঁচু জাল পাতা ঘর তৈরি করা আছে। জোয়ার এলে মাছ ঢুকে যাবে এই ঘরের নিচের চোঙার ভেতরে। আর বেরুতে পারবে না। ভাঁটা পড়লে ঘেরি জেগে উঠবে চড়ায়।

অনেক নৌকো ভিড়ে আছে জলের কিনারে। শুঁটকি ব্যাপারী মহাজনরা নেমে এসেছে মাছ কিনতে। নৌকো থেকে 'ক্ষ্যাপা' (জালতি) ভরা মাছ নামিয়ে নিয়ে এসে চরের জল-কাদার ওপরে বাঁক থেকে চপাৎ করে ফেলে দেয়। চারপাশ থেকে মানুষ ছেঁকে ধরে। নৌকোর লোক দাম হাঁকে: 'ষাট টাকা (দুই ক্ষ্যাপা)।'

'তিরিশ' 'চল্লিশ' 'পঁয়তাল্লিশ' পর্যন্ত অকসনে দাম ওঠে। এক এক ক্ষ্যাপায় কেজি পনেরো কুড়ি মাছ। নানারকম। দশ কিলোর ক্ষ্যাপাও থাকে। তার দাম কম।

আকাশের দিকে হাত তুলে সিঁথি-কাটা বাবরি চুল, মাথায় নতুন লাল গামছার পক্কড় বাঁধা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, লুঙ্গি পরা, এলো-গা ইয়ামিন লস্কর তার ছ'ফুট উঁচু দোহারা তামাটে চেহারার মতই দাম হেঁকে দেয় 'পঞ্চাশ'।

মালটা নিয়ে নেয় সে। কুড়িটা মাল ধরেছে আজ একাই। প্রতিজ্ঞা করেছে যেন নিজে লোকসান খেয়েও বড়লোকদের ভুঁষিমাল আট-দশজনকে সে কোণঠাসা করে দেবে। ভাড়াটে নৌকোওলারাও একটু বেশি দাম পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু ওরা মন্তব্য করে, 'রাজার পার্টি' এখন ওকে টাকা যোগাচ্ছে।' ...

মাছ বাছাই করছে নানানা বয়সের মেয়েরা। ফ্রক পরা যুবতী কুমারী মেয়ে, সঙ্গে আছে মা, মাসি, পিসি, বোন। অল্প অল্প কাদাজল। তাই থেবড়ে বসা যায় না। উবু হয়ে বসে বসে কাঁকাল-পিঠ ধরে যায়। ছোট ছোট বাচ্চারা থলি হাতে মাছ কুড়িয়ে বেড়ায়। এক কেজি আধ কেজি হয়েছে কারো কারো। মাছ ঢালার পর ছড়িয়ে ছিটকে গেলে তারা নেয়ো পাতে বিড়ালের মত। তাড়া খায়। গরিবের বাচ্চারা।...

মাথা থেঁতো-করা বিরাট বড় সমুদ্র-হেলে কাদাজলে পড়ে গা ফোলাতে থাকে। 'বহুৎ বিষ' আছে নাকি এর। আর জলের কিনারে বর্ষাকালে ফেনার লাড্ডু জমে আছে দেখে একটা সট মারলেই তার ভেতর থেকে সাদা-কালোয় বিনুনী ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে পড়ে তড়তড় করে ছুটে যাবে জলের ওপরে। তারপর ডুবে যাবে। জেলেরা বারণ করবে—ও সাপের সঙ্গে লেগো না। তাহলে পাড় পর্যন্ত আর উঠে যেতে হবে না।

মেয়েরা গল্প করতে করতে মাছ বেছে আলাদা করে জমাচ্ছে। তারই মধ্যে হাসাহাসি। কোন্ পুরুষ কেমন। কিভাবে তাকায় কার দিকে। নানান রং ধরে। সস্তায় গরিব মেয়ের সর্বনাশ করার ধান্ধা।

বড় বড় ভাত-সাদার ওপরে হাল্কা আলতা মাখা নিহেড়ে বা দোল বা বাবলা মাছ। ফ্যাঁসা মাছ চ্যাপটা রুপোর মতো। ছুঁচমুখ তুলে বেলে। খোকা ইলিশ, চ্যালা, চাঁদা, মৌরালা, পারশে, বাঘা চেঙো, কুকুরজিভে, সাদা চিংড়ি, লাল গরানে চিংড়ি। এসব মাছ শুকিয়ে গেলে নাম যায় পাল্টে। ফ্যাঁসা হয়ে যায় 'তেল-চাপটি'। নিহেড়ে হয় 'বোমলা শুঁটকি'। চ্যালা হয় 'রুপোপাটি'।

চারশ জেলের মধ্যে মাত্র চল্লিশ জন মুসলমান। বাকি সবাই হিন্দু। শুঁটকি ব্যাপারীদের জ্বালায় জুনপুট, কাঁথি বাজারের পাজারীরা মাছ ধরতে পারে না। যাদের কম কম মাছ পড়ে চরের ওপরে শুকোপটির কাছে নিয়ে গিয়ে পথের পাশে ফেলে লাইন দিয়ে। কুড়ি থেকে তিরিশ টাকায় ক্ষ্যাপা বিক্রি হয়।

কাঁচা মাছ খুচরো দরে কিনে নিয়ে গিয়ে হাটে-বাজারে বসে বেচে পাজারীরা।

'ইয়া আলী!' বলে হাঁক মেরে উরুতে চাপড় মারে ইয়ামিন লস্কর। এক হাতে শূন্যে তোলা তার চার কেজি ওজনের 'সোনা বাম'। কামড় দিলে আধ কেজি মাংস তুলে নেবে। সোনার মতো গায়ের রঙ। কালো মিশমিশে চোখ দুটোয় আলো জ্বলজ্বল করছে। সাগর বান বললেও মনে হয় এ মাছ সমুদ্র-কৃকলাশ, যাকে 'কাঁকলে' মাছ বলা হয়। চেহারায় এর ভয়ঙ্করতা। শিকার করে বেড়ায়। ছোট মাছ শিকার করতে এসেই চোঙার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওকে বার করে আনতে গিয়ে ষাট বছরের হাড়-পাকা বুড়ো জেলে মহাদেব বর ওর কামড় খেয়ে রক্ত ঝরিয়ে এখন নৌকোতে হাত টিপে উপুড় হয়ে পড়ে উ-আহ করছে।

সাগর বান কালো চকচকে গোলাকার, ৪/৫ ফুট লম্বা। মাত্র দু-চারটি পুরুষ-বান থাকে মেকসিকোর উপকূলে। এরাই এক বিশেষ মরশুমে গোটা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোয় ঘুরে ঘুরে প্রজন্ম-প্রেরণায় স্ত্রী-বানদের সঙ্গে মিথুন-লীলা সাঙ্গ করে আসবে।

ভারীরা বাঁকে করে মাছ নিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে। দীঘার দিকের আকাশতল থেকে দুজন ভারী বাঁক কাঁধে দুটো করে বাজরা ঝুলিয়ে নিয়ে ক্রমাগত তালে তালে হাত দুলিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে কালো রেখার মতো। তারা তখন মাইল দেড়েক দূরে আছে।

উরুর ওপর কাপড় তুলে জোয়ান চেহারার পাজারী মেয়ে মাথায় মাছের বাজরা নিয়ে কনুই দোলাতে দোলাতে কাদাজল ভেঙে ছুটে চলেছে। তার কোমর দোলানী ঢঙ দেখলে খ্যাপা দুর্বাসা মুনির চোখের তারা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এ মেয়ে এখন ভাংখোর ভোলার পেটে পা তুলে দিয়েও ছুটে চলে যাবে।

কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেননা পেটের দায় আছে তার। কাঁথির বাজার ধরতে হবে তাকে। মস্করা করলেই ওড়িয়া-বাংলা-মেশানো বচন শুনতে হবে। নতুবা চরাৎ করে চোখে ফেলে দেবে গুণ্ডিপানের পিক।

হঠাৎ 'সোনা বাম'টা পড়ে গেল ইয়ামিন লস্করের হাত থেকে।

আমোদে হাততালি দিলে গহরজান বিবি, 'মিনসের বড্ড কেরদানী। ধরো দেখি এবার।'

চারদিক থেকে মারাত্মক মজা দেখতে ঘিরে ধরলো সকলে।

উবু হয়ে মাছটার কাছে বসল ইয়ামিন। মাছটা ড্যামড্যাম করে তাকিয়ে আছে। চুপ করে ভাবছে বোধহয় মাছটা, কোথায় তার সেই ছুটে যাবার অনন্ত জলরাশি? এরা কোন্ পৃথিবীর প্রাণী?

হাতে করে জল তুলে তুলে মাছটার চোখের ওপরে ঢেলে দিতে দিতে তয় তয় পিছন থেকে হাতটা বাড়াতে থাকে ইয়ামিন।

ভয়ার্ত স্বরে গহরজান বলে, 'ঐ দিলে কামড়! লে মন্দোর 'কোলজে' ছিঁড়ে!'

দাঁতে দাঁত রেখে ইয়ামিন তখন টপ করে মাছের গর্দানটা ধরেই শূন্যে চাগিয়ে তুলেছে। হাতটা কাঁপছে তার। গহরজানের দিকে হঠাৎ ফেলে দেবার ভয় দেখাতেই সে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে ধমাস করে পড়ে গেল। কাদায় তার পিছনটা গেল ভরে। সে কৃত্রিম রাগে সবার সামনে অপমানিতার মতো সাগরজলে নেমে গিয়ে নাকিস্বরে ঘ্যানঘ্যান করতে করতে যেন সব কলঙ্ক ধুয়ে ফেলতে লাগল।

ঘণ্টা আড়াই পরে সবাই যখন জলের কাছের মাছের মেলা থেকে উঠে এসেছে, গহরজান তার থলি নিয়ে মাছকুড়োনো ছ-বছরের বাচ্চাটাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ইয়ামিনের শুঁটকিগোলায় এসে দোল মাছের গাল হাঁ করিয়ে তার মধ্যে কাঠি গলাতে বসে। সারি সারি মাছ কাঠিতে ঝুলতে থাকে। বাঁশের ভারায় শুকোতে দেয়। সারি দিয়ে। সুন্দর দেখায় সেই ঝুলন্ত মাছের সারি। বালি ভরা মাটিতে মেলে দেয় অন্য সব মাছ-গুলো। আরো চারজন মেয়ে কাজ করছে।

টাটে বসে চা খায় মহাজন ইয়ামিন লস্কর। শুঁটকি মাছের পাইকের আসে। কাঁচা মাছের ডবল দাম শুঁটকিতে। বস্তা ভরে রাখা আছে ঘরের চারদিকে। পচা গন্ধ সহ্য হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে যেতে ডিবরি জ্বালে মেয়েরা। মহাজনদের এক একজনের এক একটা চত্বর। চরের জমি কারো বাপকেলে নয়, তবু পার্টি'র লোকদের খবরদারি আছে। তাদের চাঁদা দিতে হয়। হিংসা করে কেউ কুঁড়েয় আগুন লাগিয়ে দিলে, মারামারি বাধলে, মেয়ে নিয়ে গণ্ডগোল করলে তারা বিচার করবে, দেখবে। মাঘ মাসে হিন্দু জেলেরা মা-গঙ্গার পুজো করে তো মুসলমানরা করে বাবা মসলন্দরী গাজি পীরের মেলা। ইয়ামিন অবশ্য ধর্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষ।

'হ্যাঁগো গহরজান বিবি, এই জাড়ের বেলা তুমি গায়ের একটা চাদরও লিয়ে আসনি ?' শুধোলে ইয়ামিন।

গহরজান বলে, 'গরিবের আবার জাড় কিসের ? তুমি বিশ হাজার টাকা লোন পেয়েছ, মোটা টাকার মানুষ, একতলা পাকা বাড়ি করেছ দু'কামরা। সমুন্দুরের জাল করেছ তিন রকম। ভাড়া খাটাচ্ছ। তুমি বালাপোষ মুড়ি দিয়ে শোও ভাই। আমার চাদর কিনে দেবার লোক মরেছে।'

চারকোণা লম্বা চৌহদ্দির শেষে অন্য মেয়েরা বাতি জেবলে বেশ খানিকটা দূরে কাজ করছে।

কুঁড়েঘরের বাইরের চালায় বসে কাজ করছে গহরজান। খাতাকলম নিয়ে হিসেব করতে বসে ইয়ামিন। বলে, 'তোমার বর তো মরেনি।'

'হ্যাঁ, মরেছে। দু'চুলোর 'প্যাটে' গ্যাছে। তার কথা আর বলনি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাজ করে যায় গহরজান। তারপর বলে, 'অত বড় মাছটা তুমি বেচে দিলে ? কী স্বাদের মাছ! বাড়িতে পাঠালে পারতে।'

'দু-কেজি বেচে দিয়ে এক-কেজি পাঠিয়েছি। আমারই জালে পড়েছিল মাছটা। ভাড়ার দাম কাটা যাবে। আট টাকা করে কেজি। এক কেজিটাক রেখেছি। তুমি এক কাজ করো। মাছটা গোস্তর মতন করে কষে ফেলে বাগিয়ে রাঁধো। তুমিও খাবে।'

'আর বাবলা মাছ গাঁথবে কে ?'

'সে সারারাত পড়ে আছে।'

'সারারাত আমি থাকব নাকি ? সারাদিন কাজ করেছি!'

'থাকলে বাড়তি কাজের টাকা পাবে। গায়ের চাদর আননি কেন ? নাও এটা গায়ে দাও।' লতাপাতা ছবির একখানা খদ্দর সুতোর লেডিজ চাদর গহরজানের গায়ের ওপর ফেলে দেয় ইয়ামিন। মাছ-হাতটা ধুয়ে ফেলে গহরজান মহাজনের শুঁটকি-গন্ধ চাদরটা মুড়ি দেয়। কুঁড়ের মধ্যে 'সোনা বামে'র বড় গাঁতাটা নিয়ে রান্না করবার যোগাড় দেখতে গেলে ইয়ামিন বলে, 'মাঝরাতের পর আবার মাছ উঠবে। তখন একবার যেতে হবে। ক্ষ্যাপা বওয়া ভারীরা মাছ দিয়ে যাবে। তুমি থেকো। নইলে টাকাপয়সা মাল-জাল চুরি হয়ে যাবার ভয় আছে। কুঁড়েতেও কেউ আগুন লাগাতে পারে।'

'না ভাই, আমাকে ঘরে যেতে হবে। বাচ্চাটা কাঁদবে। আমার বুড়ো মা চোখে ভাল ঠাওর করতে পারে না। তাকে বাচ্চাটা 'মা কেন আসনে' বলে নাকি বড্ড মারে। বাচ্চাটা মোর কোলের কাছে শুয়ে থাকে নুটি মেরে। এখনো দুধ খায়। সারা বেলা কাদায় ঘুরছে। সর্দি গড়াচ্ছে। জবর না ওঠে। তার গায়ে মোর পুরোনো চাদরটা মুড়ি দিয়ে গলায় বেঁধে দিইচি। চলে যাব ভাই।'

'সে যাও যাবে'খন। বাঁধ থেকে মাইলখানেক দূরেই তো বাড়ি।'

স্টোভ জেবলে রান্না বসায় গহরজান। শব্দ হয় হু-হু করে।

চারজন মেয়েকে ডেকে এনে আগে নিহেড়ে মাছগুলোকে হেপাজত

করার কথা ব'লে দিতে তারা এসে কাজে বসে। গহরজান আর ওরা সবাই প্রতিদিন সাগরজলের কাছে গিয়ে মাছও বাছাই করে দেয়।

যাতে শিয়াল, খ্যাঁকশিয়াল, মাছ-বাঘরোল, ভোঁদড় গর্ত বা পুরোনো কবরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মাছ চুরি করে নিয়ে না পালায়, তার জন্যে মাঝে মাঝে চেরা বাঁশের ফটাস দড়ি টেনে টেনে শব্দ করতে হয়।

বাইরে এসে দাঁড়ায় ইয়ামিন লস্কর। কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক। আকাশ সমুদ্র পৃথিবী সব এখন একাকার।

দু-মাস পনেরো দিন বাড়ি থেকে এসেছে সে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে তার। একটু অবস্থাপন্ন বনেদী ঘরের মেয়ে, নিরোগ সুঠাম চেহারা বলে গ্যাদা-গুমোর আছে, শুকো ব্যবসাকে ঘেন্না করে, তাই স্ত্রী হালিমা একদিনও আসেনি এখানে। সাত মাইল দূরে বাড়ি। রাতে বড় একা লাগে। চোর-ডাকাতের ভয় করে। হাঁক মারলে অবশ্য অনেকেই বেরিয়ে আসবে লাঠি শড়কি নিয়ে। আগে গেরস্তর ভয়ে চোর-ডাকাত পালাত, এখন চোর-ডাকাতের ভয়ে গেরস্ত পালায়। কেননা ওদের হাতে থাকে আগ্নেয়াস্ত্র।

চারজন মেয়ে যখন টাকাপয়সা নিয়ে চলে যাবে গহরজানও চলে যেতে চাইল।

'যাবে ?' শুধোলে ইয়ামিন।

'হ্যাঁ। তোমার ব্যবসায় কি আমার শরিক আছে যে রাত জেগে বসে থাকব!' বাঁশের দোরের আগড়ে গোলগাল তন্বী চেহারায় হেলান দিয়ে বলল গহরজান।

'তাহলে ভাত-তরকারি নিয়ে যাও।' অনুরোধের সুরে বলল ইয়ামিন।

'তুমি খাও তো—'

পালাতে যাচ্ছিল গহরজান। বাধা দিয়ে ইয়ামিন বললে, 'নিয়ে যাও। নাহলে আমি সব ফেলে দোব। জানি তোমার সারাদিন খাওয়া হয়নি।'

মেয়েগুলোকে একটু দাঁড়াতে বলে গহরজান একটা জামবাটিতে ভাত-তরকারি বেঁধে নেয়। ইয়ামিনের হাত থেকে টাকা নিয়ে হঠাৎ ইয়ারকি করে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসে রইল ইয়ামিন। কাছের পল্লীর ধানজমিতে কাঁকড়া খেতে এসে ডাকছে শিয়ালরা।

আবার আলো জ্বালল ইয়ামিন। খেয়ে নিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকাল। পনেরোটা বস্তায় কত মাছ আছে, কত দাম পাবে, কত খরচ হয়েছে মনে মনে হিসেব জোড়ে। যেন তল-কূল পায় না।

আরো দেড় মাস থাকতে হবে।

স্কুল ফাইনাল পাশ করলেও পড়াশুনো বেশিদূর হল না। বাপ সোঁদরবনে কাঠ কাটতে গিয়ে আর ফিরল না। ভেদবমি হয়ে মারা গেল।

মাটি ধরে উঠছে সে। সরকারী ঋণ করেছিল, তা শোধ প্রায় হয়ে এসেছে।

ছেলেটা নাইনে পড়ে। আর একটু বড়মতো হলে এখানে ওকে রেখে একরাত বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারত। দু-তিনটে জন নিয়ে বিঘে আড়াই কেনা জমির ধানটা অবশ্য তুলে গাদা দিয়েছে সে ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর। ছেলেটা আজ এসেছিল, তার হাতেই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। হালিমা চিঠি লিখেছে, 'তুমি পারলে আর একবার এসো। খুব দরকার আছে।'

দরকারটা কী তা জানে ইয়ামিন। হালিমার টেপা ঠোঁট। ফরসা রঙ। তিলফুলের মতো খাড়া জটাবাঁকা নাক। চোখ দুটো যেন পতপত করে ডানা-মেলা প্রজাপতির মতন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনের গভীর পর্যন্ত দেখতে পায়। এত বছরের পরিচয়।

যাবার সময় নেই। রাত-জোয়ারের মাছটা ধরবে কে? ছেলে দাম ধরতে পারবে না। লোকসান করে ফেলবে। তাছাড়া একা ভয় পাবে। মহাশূন্য ধু-ধু-চর। রাত জোয়ারের মাছ ওঠার পর অন্ধকারে প্রেতের মত আলো নড়াচড়া করে।

চোখে নিদ আসে না ইয়ামিনের। বিবেক হঠাৎ ফণা তোলে, 'গহরজানকে তুমি রাত্রে থাকার কথা বলেছিলে কেন?'

'এমনি। কাজের জন্য।'

'চালাকি! এক ছেলের মা, যৌবন নেই ওর? গরিব কাজের লোককে নিয়ে ইয়ার্কি? তোমার দুর্বলতার সুযোগ নেয় যদি? যদি বদনাম রটায়? ওকে নিয়ে রাত কাটালে যদি সন্ধান পেয়ে আর পাঁচজন ধরে অপমান করে নিকে পড়িয়ে দেয়? হালিমা আর তার ছেলেমেয়েরা কী মনে করবে তখন? ব্যবসা করতে এসেছ, বুঝেসুঝে পা ফেল। এই চার মাসের কষ্টই গোটা বছরের রোজগার।'

কানমলা খায় ইয়ামিন লস্কর। একশো বার।

দোরের শেকল ঝনঝনানির শব্দ হল হঠাৎ।

'কে? গহরজান ফিরে এলো নাকি? উঠে টর্চ মেরে দেখেই আক্কেল হাঁ হয়ে গেল ইয়ামিনের। সাদা শাল মুড়ি দিয়ে রিকশায় চড়ে এসেছে হালিমা। তাকে বিদায় করে দিয়েছে টাকা দিয়ে। ঝনঝন শব্দ করে যাচ্ছে রিকশাঅলাটা।

ইয়ামিন তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিয়ে হালিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি!'

কড়া সেন্ট মেখে আসা হালিমা কিছু বলল না। প্রজাপতি-চোখ তুলে শুধু হাসল। তার ঠান্ডা মুখটা উত্তপ্ত বুকের তলায় চেপে ধরল ইয়ামিনের।

ইয়ামিন বলল, 'যাক রাত-জোয়ারের মাছটা ধরতে যাবার ভাবনাটা গেল।'

হালিমা বলল, 'কে তোমাকে যেতে দিচ্ছে? আজ তোমার ছুটি।'

ডাকাত

সোমনাথ বাকুলীকে রোজ সাতটা মিষ্টির দোকানে পঁয়ত্রিশ কেজি ছানা যোগান দিতে হয়। একটা মোষ আর তিনটে গাইগরু আছে। দুটো গাই দুধ দেয়। একটা কিছুতেই গাবিন হচ্ছে না। তাই পাউডার দুধ এনে ছানা কাটাতে হয়। স্পঞ্জের রসগোল্লায় খাঁটি দুধের ছানা না দিলে নাকি ফেটে যায়। চারফুট লম্বা মাথা ছোট পাতলাটে চেহারার সোমনাথের ছানায় পাউডার দুধের সঙ্গে কতটা মোষ বা গাই দুধ ভেজাল থাকে সে ছাড়া জানে কেবল একজনাই। সে হল তার বিশাল চেহারাবতী অর্ধাঙ্গিনী দক্ষবালা।

সকালে দুধ দোয়ার পর পাউডার গুলে ভেজাল দিয়ে বাবলাকাঠ ধরিয়ে উনুন জেবলে দুধ ফুটিয়ে, সাজা দিয়ে ছানা কাটিয়ে কাপড়ের পুঁটুলিতে করে বেঁধে যে পুকুরের ভরায় ডুবিয়ে রাখে তাতে মাছ দেখলেই মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। বড় বড় সিলভার কার্প বিশখানা ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য তেলাপিয়া। পোনাও আছে বিস্তর। ছানা ধোয়া জল খেয়ে মাছগুলো বেশ বড় হয়। জাল ফেললে হালাসিগাঁথা হয়ে যায়। সোমনাথ একবার জেলেদের মতো মাথা ঘুরিয়ে জাল ফেলার পর তাকে মাছেরা টেনে নিয়ে যেতে থাকলে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, 'ওগো বউ, দৌড়ে এসো গো! তোমার মা-বাপের পায়ে গড়। দৌড়ে এস। মাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে!……'

দক্ষবালা মোটা মানুষ। হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনে। জালটাকে টেনে তুলে যত মাছ ছিল সবই নিয়ে নেয়। খায়ও সে অনেক। দেড় কেজি আটার রুটি আর দেড় কেজি ঘন দুধ চাই তার রাত্রে। দুপুরে সে যত ভাত তরকারি খায় চারদিনেও সোমনাথ খেতে পারবে না। পাট কিনতে এসেছিল যে পাইকেররা তাদের কাঁটা পাল্লায় তুলে বসিয়ে দেখেছে দক্ষবালার ওজন মাত্র সাড়ে তিন মণ। এক-খানা উরুর মাপ যা সোমনাথের বুকের মাপ তাও নয়। সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু ফরসা চেহারা যেন ফেটে পড়ছে। একটু রোদে বসে যদি মাঠের জোয়ান কিংবা উচ্ছে তোলে তো গাল দুটো আপেলের গায়ের মতো রাঙা হয়ে যায়। দুটো মেয়ে হবার পর ঐরকম মোটা হয়ে গেল। ডাক্তার খাওয়া কমাতে বললেও শোনে না। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণের গোলমাল থেকে নাকি ওরকম মোটা হয়ে গেছে।

ছানা বেছে পাকাবাড়ি করেছে সোমনাথ। মেয়ে দুটোকে বিদায় করেছে রাজ্যের সোনা আর টাকাপয়সা খরচ করে। দুই জামাইয়ের ব্যবসা আছে পৈতৃক। বড়র দুধছানার। ছোটর সুকো বিড়িপাতার।

বারো মাসে তের পার্বণ পালন করে সোমনাথ। সারাদিন জয়ঢাকের মত মাইক লাগিয়ে তার ঘরের জানালায় ক্যাসেট বাজে। দুজন ছোকরা রিক্সাভ্যানে করে ছানা দিতে যায় বাজারের দোকানগুলোতে। সোমনাথ টাকাকড়ি সেধে এনে পকেট উল্টে সব কিছু দিয়ে দেয় দক্ষবালাকে। একটা ছেলে হল না বলে সোমনাথের দুঃখ।

রাত্রে বাতের যন্ত্রণায় ককাতে থাকলে রোজই সোমনাথের ডিউটি হল দক্ষবালার পা-হাত গা-গতর টেপা। গরমকালে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিগম্বরী হয়ে পড়ে থাকে দক্ষবালা। গতরে তার বস্ত্র থাকে না, আপনা-আপনি খুলে যায়। ঘুমের ঘোরে যদি সে একখানা ঠ্যাং তুলে দেয় প্রিয়তমের শরীরের ওপরে অমনি গাঁক গাঁক করে সোমনাথ। তাই দু-পাশে দুটো মোটা মোটা বালিশ থাকে। দক্ষবালা যখন ঘুমোয় তার নাক ডাকে সিংহের গর্জন তুলে। প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে যে মেয়েটা বিছানা জুড়ে পড়ে থাকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকে এক বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বলে মনে হয় সোমনাথের। তবে এটাও ঠিক, দক্ষবালার দিক থেকে দেখতে গেলে বিরাট একটা মধুর পাত্রে তার স্বামীরত্নটি যেন একটি ডেওপিঁপড়ে মাত্র। স্বামী হলেও আদুরে এক স্নেহে সোমনাথকে ভালবাসে দক্ষবালা। সোনারুপোর মাদুলি দু'হাতের বাজুতে ভরিয়ে তুলেছিল সে একসময়। ডাক্তার রহমান যখন বললেন, 'না মা-জননী, তোমার আর সন্তানাদি হবার সম্ভাবনা নেই—চর্বিতে তোমার গর্ভকোষ ঢেকে গেছে, তার আর বাড়বার ক্ষমতা নেই।' তখন থেকে সব মাদুলি খুলে রেখেছে দক্ষবালা।

দুটো মেয়ে আছে পাড়ার। তারাই পাটঝাঁট, কাচাকুচি, রাঁধাবাড়া, ধানসেদ্ধ শুকনো করা, গোয়াল সাফ, খড় কুচোনো, জাবনা দেওয়া ইত্যাদি সমূহ কাজ করে। করিম আছে নাগাড়ে জন। ডাঙায় কোপকাপ দেয়। জনেদের নিয়ে খাটে।

দক্ষবালা বসে বসে হুকুম চালায়।

একদিন সকালে মাথায় পাগড় জড়িয়ে ছ-ফুট উঁচু ও প্রস্থে তেমনি বিশাল চেহারার বিখ্যাত পালোয়ান বলদেব পাল এসে হাজির হলেন। তাকে দেখতে এল যত রাজ্যের ছোঁড়ারা। সবাই বলে, 'বাপ রে! কী বিশাল চেহারা!'

সোমনাথ চেয়ার এনে দিতে বসতে গিয়ে তাতে ধরল না বলদেবকে। তাই জলচৌকি এনে দিতে হল। সাতগজ কাপড় লাগে নাকি বলদেবের জামা করতে। জমি দখলের সময় একশো টাকায় ভাড়া করে নিয়ে যাও বলদেবকে, সে লাঠি ধরে দাঁড়ালে একাই একশো। পাঁয়তারা

কথলেই সবাই ভাগলবা।

বলদেব বলে, 'সোমনাথের গরু মোষ দেখতে এলুম। আমারও একটা ছোটমত ডেয়ারি ফার্ম আছে। তা মোষটা তোমার কত দুধ দেয় ?'

সোমনাথ বলল, 'পনেরো কেজি এখন দিচ্ছে।'

'বেচে দেবে ? তিন হাজার টাকা দাম দোব।'

'না ভাই। আমার লক্ষ্মী মোষ এটা।'

'গাই দুটো ?'

'ওদেরও বেচব না।'

'তবে যে খবর পেলুম তুমি বেচে দেবে !'

হঠাৎ দক্ষবালা বেরিয়ে আসতে যমের মতো তাকিয়ে রইল বলদেব। বলল, 'এ কে ?'

'আমার স্ত্রী।' বলল সোমনাথ।

'তোমার স্ত্রী ? হাসালে তো! তোমার মতো ক্ষুদে লোকের এই চমৎকার স্বাস্থ্যবতী বউ ! ভারি মজা তো !'

'যার ভাগ্যে যেমন আছে !' তবুও বলল সোমনাথ।

'তা বেশ। চার হাজার টাকায় মোষটা দেবে ? নারকোল-ছোবড়া দাও তো, একটু তামাক খাই !'

সোমনাথ ছোবড়া এনে দিয়ে কাছে বসল। দক্ষবালাকে ভেতরে যেতে বলেছে। লোকটা ডাকাতের সরদারও। গরু মোষ কেনার মতলবে হয়তো ডাকাতির সন্ধানে এসেছে। গা-ভরা সোনাদানাও দেখে ফেলেছে দক্ষবালার।

রুপোর সাঁপি লাগানো কোলকেয় একেবারেই একভরি গাঁজা চড়িয়ে ফসফস করে টানতে টানতে হঠাৎ চোঁচা টান মারে বলদেব। তারপর সোমনাথের মুখের ওপর হু-হু করে আঁষটে গন্ধঅলা নীলাভ ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বলে, 'আমরাও গোয়ালা। সোমনাথ বোধহয় জানো না, তোমার বাবার মামাতো ভায়ের ছেলে আমি। তাহলে সম্পর্কে তুমি আমার দাদা।'

সোমনাথ মহাখুশি। মাথা নাড়ে ঘন ঘন। বলে, 'সে আমি জানি। কলাগাছিতে তো বাবার মামার বাড়ি ছিল। অনেকদিন যাতায়াত নেই। ওখানে অনেকঘর গোয়ালা আছে।'

'তাহলে স্বীকার করলে আমি কুটুমবাড়ি এসেছি !'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। থাকো ভাই তুমি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবে।'

'চলো তবে বাড়ির মধ্যে।' বলদেব চলতে লাগল। সোমনাথের হুকুমের সে পরোয়া করে না। পিছনে পিছনে গেল।

বলদেব হাঁক মারল, 'কই বৌদি, আরে বাস ! কি দারুণ চেহারা ! যেন মা জগদম্বা ! পেরনাম হই ঠাকরোন। রক্তের সম্পর্ক আছে আমার সঙ্গে সোমনাথ-দার।'

দক্ষবালা বললো, 'বসো ভাই। গরিব হলে বড়লোক আত্মীয় কি খোঁজ রাখে ?'

'কি রকম ? আমি তো খুঁজে খুঁজে এলুম !'

'তাহলে মোষ কিনতে আর্সান ভাই ?'

'নাঃ। না দিলে কি করে কিনব? লক্ষ্মী মোষ নাকি তোমাদের। সব্বাইকে তাড়াও তো। একটা গোপন কথা আছে। চলো ঘরের ভেতর।'

সোমনাথ ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়ে বলদেবের সঙ্গে ঘরের মধ্যে এল। তার স্ত্রীও এসে দাঁড়াল। তার শরীর যেন ভয়ে অথবা কিসের জন্যে কে জানে কাঁপছে। বলদেবের বড় বড় চোখে কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি!

বলদেব বলল, 'শোন সোমনাথদা, আজ রাত্রে তোমার বাড়িতে ডাকাত পড়বে। আমার কাছে খবরটা পেঁছিনোর পর গতরাত্রে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, নয়নচক গ্রামে আমাদের কোন আত্মীয় আছে? মা তখন সব জানাল। তোমার বাবা শ্রীকান্ত বাকুলী আমার বাবার পিসতুতো ভাই। যাক সে কথা, যে ডাকাত দল ডাকাতি করতে আসবে তারা আমার বিরুদ্ধ দল। একজন মুসলমান আছে সরদার। তার নাম কাল্লু খান। ভয়ঙ্কর নির্দয় মানুষ। বাচ্চাদের ঠ্যাং ধরে ফেড়ে ফেলে। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করে। তা তোমার ঘরে লাখখানেক টাকা আর ভরি পঞ্চাশ সোনা আছে নাকি। এটা কি সত্য?'

স্বামী-স্ত্রীতে মুখ-চাওয়াচায়ি করে। তারপর সোমনাথ বলে, 'না না, এসব মিথ্যে কথা। জমিজমা কিনলুম। পুকুর কাটলুম। টাকা তো ব্যাঙ্কে। সোনা ঐ যা পরে আছে। দুটো মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি।'

'না, সত্য কথা বলছ না। তোমার বাড়ির কোন দাসী এ খবর দিয়েছে। সে যাক, মায়ের হুকুম, তোমাকে রক্ষে করতে হবে। সে আমার জীবন যায় যাবে। নইনে শালা এখানে আমি খুঁজতে খুঁজতে আসব কেন?'

দক্ষবালা ভয়ে যেন কাতর হয়েই অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, 'তবে ভাই তুমি যেও না। আমাদের বড় ভাগ্য তুমি এমন দুঃসময়ে এলে। নইলে লুট, খুন হয়ে গেলে আত্মীয়রা কেউ বেরুবে না। খুব হিংসে। তুমি দেওর হও বললে, তোমার কাছে আর লজ্জা কি! হাতে ধরে বলছি, তুমি থাকো।'

বলদেব রয়ে গেল। দুপুরে সে একঝোড়া লুচি, একমালসা মাংস, কেজি দুই রসগোল্লা, এক ডাবর জল খেয়ে মোষের মতো পড়ে ঘুমোল।

মাঝরাত্রে সত্যই ডাকাত পড়ল। পাঁচিল টপকে লাফ দিয়ে দুজন নেমে এসে সদোর খুলে দিতেই দশ-বারোজন ঢুকে এল। বলদেব শুধুমাত্র একখানা সার্টপ্যান্ট পরে ভারি মজবুত কাঠের তসলা হাতে নিয়ে উঠোনে নেমে গিয়ে বিরাট হাঁক মেরে সুটিয়ে সুটিয়ে ফেলে দিলে কয়েকজনকে। কাল্লু খান তলোয়ার নিয়ে ছুটে এসে মাথায় কোপ বসাতে যেতেই তসলা মেরে তার হাত ভেঙে দিলে। তলোয়ার ছিটকে পড়ল গোয়ালধারে। আলো জেবলে দিয়ে তখন দক্ষবালাও একখানা বড় রামদা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। হাঁকছে, 'আয় বেটারা!'

ডাকাত দল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

সোমনাথ কিন্তু তক্তাপোষের নিচে ঢুকে থরথর করে কাঁপছে তখন।

কাল্লু খানকে প্রাণে শেষ করতে পারল না বলে বলদেব দুঃখ করতে লাগল।

সকালেই বলদেব চলে যেতে চাইল। মায়ের হুকুম সে পালন করতে পেরেছে কিন্তু কি ভাবে যে তার একখানা পায়ে চোট লেগে গেল তা মালুম করতে পারেনি। তাই দক্ষবালা বললো, 'ঠাকুরপো, তুমি যেও না। পা ভাল হোক। তুমি না থাকলে আমরা প্রাণে বাঁচতাম না। লোক পাঠিয়ে তোমাদের বাড়িতে খবর দিচ্ছি আমরা।'

অগত্যা কয়েকদিন রয়ে গেল বলদেব। দক্ষবালার সঙ্গে গল্প করে আর হা-হা করে হাসে। সোমনাথ দোকানে ছানা পাঠানো, সংসারের পাঁচরকম কাজ নিয়ে পাগল। হঠাৎ একদিন সে ঘরের মধ্যে এসে দেখল তার স্ত্রী দক্ষবালার অতবড় শরীরখানাকে শূন্যে চাগিয়ে তুলে ধরে ঘুরপাক দিচ্ছে বলদেব। আর আনন্দে আটখানা হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে 'পড়ে যাব পড়ে যাব' বলে চেঁচাচ্ছে দক্ষবালা।

সোমনাথ মনে করল এহ বাহ্য। বৌদি-দেওরের মস্করা। কিন্তু তার অন্তর পুড়ে গেল। ঘরে আর আসতে ইচ্ছা করল না তার। বাইরেই খায়, বাইরেই শোয়। হঠাৎ বালতি উল্টে দুধ ফেলে দেয়। চেঁচামেচি বাধায়। তবু দক্ষবালা বার হয়ে এসে খোঁজখবর নেয় না।

বলদেবও আর যেতে চায় না। এই ডাকাতি কি তার পূর্বপরিকল্পিত ছিল? কলাগাছিতে নাকি বলদেবের বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। মাটির বাড়ি। গরুবাছুর আছে ঠিকই কিন্তু বলদেবের সংসার হল না। কোন মেয়ে তার ঘর করতে পারে না। সবাই পালায়।

একরাত্রে দক্ষবালা এই ভরা মাঝবয়সেও বলদেবের সঙ্গে চলে গেল। আশ্চর্য সোমনাথ দেখল, কিছুই নিয়ে যায়নি দক্ষবালা।

কড়ার দুধ উথলে পড়ে গিয়ে উনুন নিভে যেতে থাকলেও কান্না থামে না সোমনাথের।

নাবালক একটা শিশু যেমন তার মাকে হারিয়ে দিশাহারা হয়ে যায় তেমনি অবস্থা হল সোমনাথের দক্ষবালাকে হারিয়ে। বাড়ি থেকে কাজের মেয়ে দুটোকে বিদায় করে দিলে। ছানাব্যবসা বন্ধ করল। বাছুর ছেড়ে রেখে গাই মোষ পিইয়ে দিতে লাগল।

নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ দিয়ে নানা জায়গায় খোঁজখবর নিলে। মেয়ে দুটো এল খবর শুনে। তারা অভিসম্পাত দিতে লাগল। বড় মেয়ে বলল, 'বাবার আবার বিয়ে দোব আমরা!'

কিন্তু সাতদিন পরে মেয়েরা যখন কোন কিছু কূলকিনারা করতে না পেরে যে যার স্বামীর ঘরে চলে গেছে অসহায় বাবাকে ফেলে রেখে—মাঝরাত্রে হঠাৎ সদোর দোরে ঘা পড়ল।—'শুনছ, দোর খোল!'

চমকে উঠল সোমনাথ। সে সবেমাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়বার

জন্যে তৈরি হচ্ছিল। ছুটে গেল দোরগোড়ায়। দক্ষবালার গলা নয়?

শুধোল কান্নাভাঙা গলায়, 'দক্ষ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কে?'

'আমি একা।'

'যার সঙ্গে গেলে সে এখন কোথা?'

'তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি। লোকটা খুনী আসামী ছিল। বদমাস।'

দোর খুলে দিলে সোমনাথ।

গায়ের গহনা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে দক্ষবালা। ক'দিনেই তার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে পড়ল দক্ষবালা। কাঁদতে লাগল, 'আমার এই ঘর ছেড়ে কেন গেলুম! আমার নিষ্পাপ অবোধ স্বামী! লোকটা আমাকে কি ভাবে যাদু করল! .....'

গামছা ভিজিয়ে এনে পা মুছিয়ে দিলে সোমনাথ। তার পায়ে প্রণাম করলে দক্ষবালা। বললে, 'লোকটা নিয়ে গিয়ে তাদের মাটির ঘরে তুলল। দিনের বেলা পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। বাজে লোকজনের আড্ডা। সে বলেছিল, এক সাধুবাবার আশ্রমে আমাকে নিয়ে যাবে। তার কাছে মানত করলে নাকি পুত্রসন্তান হয়। নিয়েও গেল না। মশারি নেই। খাবার নেই। রাতে চলে যায় ডাকাতি করতে। মদ খায়। একদিন আমাকে খারাপ করতে চাইল। আমি তখন মুখে লাথি মারি। সে তখন আমাকে বেঁধে খুব চাবকাল। দেখ, পিঠে দাগ পড়েছে কত! কাল ভোরে আমি লাথি মেরে মেরে বন্ধ দোর ভেঙে ফেলে থানায় চলে যাই। ও তখন ছিল না। তারপর পুলিশ নিয়ে রাতের বেলা এসে ওকে ধরাই। সবাই কত বাহবা দিলে। ওর ভয়ে লোক অতিষ্ঠ হয়ে ছিল। তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি মাঠঘাট পার হয়ে।'

'ও যদি জামিন নিয়ে আবার আসে?'

'ওর বিরুদ্ধে দু'চারশো কেস। জামিন পাবে না।'

'তাহলে সেদিন টাকা নিয়ে গেল না কেন?'

'মাত্র পনেরোশো টাকা দিয়ে বলেছিলাম আর নেই, বিশ্বাস করো, কালীর দিব্যি। তবুও টাকা খুঁজেছিল—পায়নি। মেঝের নিচে আয়রন আছে। তার ওপরে চালের বস্তা। সন্ধান পাবে কি করে? গয়না কটা সব উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ডাকাত পড়াটা?'

'ও তো বলেছিল ওর কারসাজি নয়।'

এখানের সব খবর শুনল দক্ষবালা। ফাঁসির দড়িটা দেখল। খুলে ফেলে দিল। তারপর শানের ঘাটে নেমে মাথা ডুবিয়ে স্নান করে এসে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঠাকুরঘরে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে এসে সোমনাথকে কাছে

টেনে নিয়ে বললে, 'গা-গতর আমার খসে যাচ্ছে। তোমার আদর না পেলে আমার চোখে ঘুম আসে না!'

সোমনাথ দক্ষবালার পা টিপে দিতে থাকলে সে ঘুমিয়ে গেল। বিশ্ব-জয় করে ফিরে আসা বীরাঙ্গনা যেন। তার নাক ডাকতে লাগল।

তার দিকে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে বসে রইল সোমনাথ।

তার দুখের কারবার আবার সে শুরু করবে।

পীর আলি মুন্সী

টিকোলো নাক। পটল-চেরা চোখ। পাকা গমের মতো রঙ। মাথায় বাবরি চুল। ঠোঁট-পালক-ঠ্যাং বার হওয়া আধমরা পাখিভরা প্লাসটিকের জালতি ঝোলা কাঁধে। গায়ে সবুজ রঙের লম্বা কাপড়ের জামা। পরনে সিঙ্গাপুরী ঝর্ণাদার লুঙ্গি। পায়ে কড়েআঙুল বার হয়ে পড়া কেডস জুতো। হাতে ধনুক। কোমরে বাঁধা মাটির বড় বড় গুলিভরা একটা থলে। দীর্ঘাকার চেহারার পীর আলি মুন্সী যেন এক রহস্যময় মানুষ। সন্দেশখালি, পাখিরালয়, সজনেখালি, মোল্লাখালিতে সবাই তাঁকে চেনে। তাঁর আগমন হলেই পাড়ার যত ছেলেরা এসে জোটে কাছে। বনে-বাদাড়ে-বাদায় তাঁকে নিয়ে ছোটে পাখি দেখাতে। পীর আলিকে বাঁশগাছের জটলাইয়ের ওপর বড় ঠোঁটরাঙা সবুজ একটা মাছরাঙা পাখি দেখালেই ধনুকের গুনে-বাঁধা চামড়ার মধ্যে গুলি নিয়ে টান মেরে ছেড়ে দেন তিনি। আর মাছরাঙাটা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচিয়ে উড়ে উড়ে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়।

পীর আলির তাগ ফসকাবার নয়। পাখি যদি মাংস খাবার জন্যে কিনতে চাও, দাও পয়সা। একটা মাছরাঙা এক টাকা। ডাহুক, হরিতাল ঘুঘু, মেছো বক, কাদাখোঁচা, কোকিল, পাপিয়া, ঘুঘু, গোবক, পান-পায়রা এসব পঁচাত্তর পয়সা। ধানখইরি, শালিক, গাঙশালিক, ছাতারে, দোয়েল, বসন্তবৌরি, বেনেবউ পঞ্চাশ পয়সা। মানিকজোড় দেড়টাকা। শামুকখোল দু-টাকা। কেঁদোচুড়া (সারস জাতীয় বক) তিন টাকা। বালিহাঁস আড়াইটাকা।

একটি ছেলে বলল, 'আপনি পাখি মারেন কেন পীর আলি চাচা?'

পীর আলি মুন্সী হাঁটতে হাঁটতে বলেন, 'সব পাখি তো মারি না বেটা। কাক, শকুন, চিল, সেকরা, বাজ, টিয়া, প্যাঁচা, হাঁড়িচাঁচা, নীলকণ্ঠ, পাৎকোয়া বা কুকোপাখি মারি না। এদের মাংস হারাম। কারণ এদের ঠোঁট বাঁকা,

পায়ে ছিঁড়ে শিকার করে খায়। কাকের ঠোঁট অবশ্য সোজা কিন্তু এরা মড়া খায়। কাজেই বুঝতে পারছ, অন্য সব পাখি খেতে আছে—ধর্মে নিষেধ নেই। পাখি আমাদের কি উপকার করে যে মারব না?'

'পোকামাকড় খায়, শিস দেয়, ডাকে—লোকালয়ে যদি পাখির ডাক শোনা যায় তো শহরের মতো তা কাকালয় হয়ে যাবে।'

পীর আলি মুন্সী বললেন, 'বাচ্চা, পাখিরা পোকা-মাকড় খায় ঠিকই কিন্তু ফসলও তো খায়। টিয়াপাখি ভুট্টা ক্ষেত উজাড় করে দেয়। ভুট্টার মতো এমন বসে থাকে যে মানুষ সহজে দেখতেই পায় না। দানা খাবার কট্ কট্ শব্দ শুনে চাষীরা যেই চেরা বাঁশের ফট্কায় আওয়াজ মারে অমনি পঙ্গপালের মতো হু হু করে উড়ে যায়। হাঁড়িচাঁচা, পুরুল, চিচিঙ্গে, বরবটি খায়। ঢ্যাঁড়োসের বীজ বার করে খায়ও টিয়াপাখি। ঘুঘু, শালিক, ধানখইরি ধান খায়।'

'এত জীব হত্যা করেন, আপনার বিবেকে লাগে না?'

'আমি তো আর ভাববাদী কবি নয় বাবা। আমি একজন বাস্তববাদী মানুষ। এবং মানুষের জন্যেই গোটা পৃথিবীর সবকিছু তৈরি হয়েছে। তাহলে মানুষ মাছ, মাংস খাবে কেন? বাছুর খাবার দুধ তাকে বেঁধে রেখে তুমি খাবে কেন? বলতে পারো, পাখি মারলে কমে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির মাল বেন্তমার, ফুরোয় না। দশটা মরে তো বিশটা জন্মায়। পাখিদের জগৎ আছে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায়।'

ছেলেটি বলে, 'শুনেছি আপনি ভাল লেখাপড়া জানেন কিন্তু পেখেরা হয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ান কেন?'

'তুই আমাকে কাঁদাবি দেখছি! আমি তো জমিদারের বাচ্চা ছিলাম। আমার বাবা বা ঠাকুরদাদার সামনে দিয়ে মানুষ গেলে সাইকেল বা পাল্‌কি থেকে নেমে জুতো হাতে করে হেঁট হয়ে যেতে হত। নইলে কাছারিবাড়িতে ধরে এনে বিচার হত। পাঁচ ঘা বেত মারার পর কুড়িপাক ঘানি টানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। ঠাকুরদাদা ইংরেজদের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন 'খান বাহাদুর'। এখনো আমাদের জমিদারবাড়ি বিরান হয়ে পড়ে আছে। সদরে আস্ত আছে কেবল দুটো সিংহ।'

'সিংহ আছে আপনাদের? জ্যান্ত?'

'আরে না, পাথরের!'

'আপনি নাকি ভাল ইংরেজি জানেন?'

'জানি। শেক্সপিয়র আমার সব মুখস্থ।'

বাঁশবন বাগানের মধ্যে দিয়ে পাখির খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে পীর আলি মুন্সী ওথেলো থেকে আবৃত্তি করে যান। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে তার মশলাগুলো ফেলে দিয়ে অন্য কি মশলা ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে থাকেন। ছেলেদের নাকে লাগে একটু যেন আঁষটে কটু গন্ধ।

সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখি শিকার করার পর পীর আলি মুন্সী যার বাড়িতে

আতিথ্য নেন তার যেন মহাভাগ্য। কেননা তাঁর কাছ থেকে মজার মজার গল্প শুনতে পাবে। আরব্যরজনী, ঈসপ্‌স ফেবল্‌স, পঞ্চতন্ত্র, উপনিষদ, গ্যালিভার ট্রাভেলস, নবীকাহিনী যা শুনতে চাও শোনাবেন। পীর আলি মুন্সী গজল গাইতেও পারেন চমৎকার।

বর্ষাকালে যখন পথে কাদা, সারা দিনরাত বৃষ্টি ঝরে, তখন তো আর পাখি শিকার করা যায় না, পীর আলি মুন্সী সম্ভ্রান্ত চাষীর বাড়ির খেপলা জাল সেরে দেন। একবার যার সঙ্গে পরিচয় হয় তার নাম তিনি বহুকাল ভোলেন না।

'আপনার পরিবারবর্গ কেউ নেই?' একথা জিগ্যেস করলে বলে, 'না, কেউ নেই। ছিল এককালে সবাই। তাঁরা তাঁদের আত্মাকে ঈশ্বরের ঝোলায় জমা দিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।'

হাজার পীড়াপীড়ি করলেও নিজের সংসারজীবনের কথা বলেন না পীর আলি।

কেউ কেউ মনে করে ছিটগ্রস্ত। কেউ মনে করে লোকটা অহঙ্কারী, দাম্ভিক। চাকরি নেওয়াটাকে জমিদারী মেজাজে এখনো ঘৃণা করেন। কেউ আবার ভাবে, পীর আলি মুন্সী আসলে একজন পীর। তাঁর সম্পর্কে নানারকম গল্প আছে। যেমনঃ মুন্সীজীর চোখ পড়ে যে পাখির উদ্দেশে, দোয়া পড়ে ফুঁক দেবার পর তার প্রাণবায়ু উড়ে যায়।

লোকটা একমণ দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়ার মতো নষ্ট হয়ে গেছেন, কেননা শরা-শরিয়ত নামাজ-রোজার ধার ধারেন না। নেশা-ভাং করেন।

মুন্সীজী সুন্দরবনের গভীর দিয়ে জঙ্গল-বন্দনা করে চলে যান। বাঘ তাঁকে দেখে বিড়ালের মতো নেয়ো পেতে শুয়ে পড়ে পায়ের কাছে। 'বাচ্চে বাচ্চে'—বলে তার মাথায় থাবড়া মেরে ঝোলা থেকে বড় রাজহাঁস কিংবা শামুকখোল পাখি ফেলে দিয়ে চলে যান।

পাঠানখালির বুড়ো ইসমাইল মাঝি বলেছে, 'একবার নৌকো বেয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। প্রচণ্ড জোর ঝড়-তুফান উঠল। নৌকো মোচার খোলার মতো তখন এই ডোবে এই ডোবে। হঠাৎ দেখি একটা হালকা পালোয়ার বেয়ে কোমরে উড়ানী বেঁধে মুন্সীজী একাই তীব্রবেগে চলে যাচ্ছেন। আর আমাদের হাঁক দিয়ে বলে গেলেন—'চলে যাও, ভয় নেই'। আমরা এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় এই রকম ভরসার কথা শোনাতে আর কাউকে দেখিনি।'

ঈশানগাজি গাঁয়ের বর্গাদার চাষী নজমু আখতারের বাড়ি মুন্সীজী সন্ধ্যার আতিথ্য নিলে চালের আটার রুটি, শিকার করা বালিহাঁসের ঝোল, ফিরনি খাওয়ানোর পর কর্তা বিনয়ের সঙ্গে হাতখানা চেপে ধরে বলেন, 'হুজুর, মসলন্দরী পীরের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেকথা আমাদের শোনান।'

পীর আলি মুন্সী একদৃষ্টে তাঁর পটলচোখ মেলে সরল ধর্মবিশ্বাসী লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, 'হিজলী-কাঁথির দরিয়ায় যে আসমান

সমান গাছ উঠে পড়ে যায় আছাড় খেয়ে, আর তার বেগে তুফান ওঠে, তা বাবা মসলন্দরী পীরেরই মহিমা। আমি তাঁকে একবার ফিট জোছনা রাতে সোনার খড়ম পায়ে দিয়ে দরিয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে দেখেছি। আর একবার দেখেছি তিনি দরিয়ার পানির ওপরে মাদুরী বা 'জায়নামাজ' পেতে নামাজ পড়ছেন।'

'মারহাবা! মারহাবা!' বলে উঠলেন দাড়িঅলা বুড়ো নঈম আখতার। পীর আলি মুন্সীর পা চেপে ধরে ভাবে গদগদ হয়ে যান তিনি। তাঁর ছেলে ইউসুফ আখতার অনেক রাত পর্যন্ত শেক্সপীয়রের অদ্ভুত জীবনকথা শোনে। সে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

হিন্দুবাড়িতে থাকলে পীর আলি মুন্সী বলেন, 'রায় দক্ষিণ রায় বাঘের পিঠে চড়ে জঙ্গলের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। তিনি আমাকে একটি শিকড় চিবিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমাকে আর সাপে কাটে না। বাঘে ছোঁয় না। জঙ্গলে গিয়ে আমি রাজা দক্ষিণ রায়ের শেখানো মন্ত্র পড়লে আমার গা থেকে তুলসীর গন্ধ বের হয়। মধুর চাকের কাছে যাই তখন আর সেই গন্ধে হু-হু করে মৌমাছি উড়ে পালায়। তখন করুণাময় ঈশ্বরের দয়ায় অভাগার সামনে লৎলৎ করে মউভরা চাক খসে পড়ে। আমি খাঁটি মধু যতটা পারি পান করে নিই। খাঁটি মধু বেশি খেয়ে রোদে বেরুলে গা-জ্বালা করে। মাথা ঘোরে। নেশামতো হয়। বাকি মধু আমি জঙ্গলের বাঘ-বাঁদর-হনুমানের জন্যে বিলিয়ে দিয়ে আসি। এই হেঁতালের ধনুকবাবা দক্ষিণ রায়েরই দান। তিরিশ বছর আছে আমার কাছে। তেল মাখিয়ে মাখিয়ে একে লাল করে ফেলেছি।'

পীর আলি মুন্সী ধনুক হাতে নিয়ে সারা লাটঅঞ্চল টহল দিয়ে বেড়ান। কেউ কেউ বলে, আসলে উনি 'খোয়াজ খেজের' কিংবা 'বদরগাজি'। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। লোকটি এই আছেন সন্দেশখালিতে, লঞ্চে এসে পরে দেখ মোল্লাখালিতে টাবুরে বেয়ে গেঁয়োগরান-বালি-হিজল-করোমচা-সুন্দরীর তলা দিয়ে গজল গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছেন!'

কেউ কেউ বলে, অনেকদিন আগে অতি সুন্দর একটি ছেলেকে নিয়ে বাঁকা লতার লাঠি হাতে সত্তর তালি-দেওয়া নকশীকাঁথার ঝোলা কাঁধে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করতেন পীর আলি মুন্সী। ছেলেটা ওঁর গানের দোয়ারকি গাইত।

সে ছেলেটা নাকি ওঁর নয়। বাড়িতে যে হিন্দু ঝি থাকত তার। এখন সেই ছেলেটি এম-এ পড়ছে। পাখি মেরে বিক্রি করে তার খরচ যোগায় পীর আলি মুন্সী।

লোকটার সব কিছুই রহস্যজনক।

বর্গাদার নঈম আখতারের ছেলে ইউসুফ আখতার পীর আলির আশ্রয়ে পালিত সুন্দরলাল নামের ছেলেটির সঙ্গে পড়ে। যখন কোন গোঁড়া মোল্লাকে বলতে শোনে, 'সুন্দরলাল ওর জারজ পুত্র'—তখন ইউসুফ আখতার জিভ কাটে। বলে, 'হিন্দু মেয়েটিকে উনি যে কন্যারূপে পালন করে বিয়ে

দিয়েছিলেন। ঐ মেয়েটার মা বাড়ির দাসী ছিল। বুড়ী ওকে রেখে মারা যায়। পালিতা মেয়ের স্বামী সুন্দরবনের ডাকাতদের হাতে মারা পড়ে। তখন মেয়েটি ছিল গর্ভবতী। তার ঐ বাচ্চাটি। যার নাম সুন্দরলাল। ছোটবেলায় ওকেই নিয়ে নাকি ভিক্ষে করতেন। সেও মাত্র বছরদুয়েক। আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি। ভাঙা পোড়ো ভিটে। সামনে দুটো পাথরের সিংহ আছে। ঝাউগাছ আছে দুটো বড় বড়। আসলে লাটের জমিদারী দেখার ঐ বাড়িটা ছিল ওঁদের কাছারিবাড়ি। আসল বাড়ি ছিল কলকাতার জানবাজারে। ছেচল্লিশ সালে যখন দাঙ্গা বাধে তখন কয়েকজন হিন্দুকে বাড়িতে লুকিয়ে রাখার অপরাধে পীর আলি মুন্সীর দুই যমজ ছেলে আকুশামা আর আবুলামা হিন্দুস্থানী মুসলমানদের ছোরার ঘায়ে নিহত হয়। দুটি ছেলেই ছিল সুন্দর দেখতে। যেন একই রকম। তারা তখন বি-এ পড়ত। পীর আলি ছিলেন সুন্দরবনের বাড়িতে। সেই দাঙ্গায় মুন্সীজীর স্ত্রীকেও লুটেরারা লুটে নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি ছিলেন কাশ্মীরী মেয়ে। অসাধারণ সুন্দরী। পীর আলি মুন্সীর খানদানরা ছিলেন বসরার লোক। তাই ওঁকে অত সুন্দর দেখতে।

দাঙ্গায় তাঁর রত্নতুল্য দুই পুত্র নিজের সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হওয়ার জন্য পীরআলি মুন্সী মুসলমানদের ওপরে অভিমান করে নাকি শরা-শরিয়ত নামাজ-রোজা ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্রের শোকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ান।'

সুন্দরলাল বলে, 'উনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নন। কখনো কখনো বেশ ভাল থাকেন। কখনো উন্মাদ হয়ে নিজের জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে ফেলেন। মা তখন ওঁকে বেঁধে রাখেন। বলেন, বাবা, তুমি সব কথা ভুলে যাও।···এরকম হলে মা ওঁর মাথা কামিয়ে ঘৃতকুমারীর পাতার শাঁস মাথায় লাগিয়ে দেন। ঠিক একচল্লিশ দিন উনি পড়ে পড়ে আরবীতে কিসব দোয়া-দরুদ পড়েন। তারপর ভাল হয়ে গিয়ে পাখি-শিকার করতে চলে যান। একমাস পরে ফিরে এসে প্রায় পাঁচ-ছশো টাকা কোমরে বাঁধা গেঁজে উল্টে আমাকে নামিয়ে দেন। আমি ওঁর বাড়িটাকে আস্তে আস্তে মেরামত করছি। যে বাগান দুটো আছে তাতে অনেক সুপারি-নারকোল হয়। বাকি সব ধানজমি উনি ভাগচাষীদের বিলিয়ে দিয়েছেন।'

সারা লাটঅঞ্চল ঘুরে পাখি শিকার করে মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় মাতলা নদী বেয়ে পালোয়ারে করে আসার সময় কয়েকজন ডাকাত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পীর আলি মুন্সীকে ঘিরে ফেলে। পীর আলি মুন্সী হাঁক মেরে বলেন, 'তফাৎ যাও। নইলে সবাই মরবে।'

কিন্তু তারা শোনেনি। পীর আলিকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যেই তারা জঙ্গলে উঠেছে অমনি দুটো বাঘের পাল্লায় পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

পালোয়ারে দাঁড়িয়ে তখন পীর আলি মুন্সী হা-হা করে হাসছেন, আর বলছেন, 'শোভান আল্লাহ্! শোভান আল্লাহ্!'

লক্ষ্মীডাবর

গাধার পিঠে থালা-বাটি-বাসন-কোসন সাজিয়ে নিয়ে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াত ঠ্যাং-ফ্যারকা ভরত টঁ্যাটারি। মাত্র পঞ্চান্নটাকা আট আনায় ইটখোলার মাল-বওয়া বাতিল পিঠে ঘা-অলা ঘোড়াটাও ধনুষ্টংকার হয়ে মারা গেল—তাই হেঁটে হেঁটে পেরেশান। বাতিল ঘোড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনটে ঘোড়া পনেরো বছর পিঠ দিয়ে আকবর বাদশার মতো পা দুটো প্রথম বন্ধনীর আকারে বাঁকা করে দিয়ে গেলেও পয়সা কামিয়েছে তুলসীর মালা গলায়, মাথায় চাঁদি-ফাঁকা, ট্যারা চোখ ভরত দে। দশ বিঘে জমি কিনেছে আর চার-কামরার একতলা পাকা বাড়ি বেঁধেছে। আগে সে স্রেফ ধোঁকাবাজির ব্যবসা চালাত। পুরনো পেতল বা ভরনের ফাটা-কাটা থালা-বাটি নিকেল করিয়ে এনে ভাল কাঁসার জিনিসের সঙ্গে দামের বিনিময়ে বদল করত। বলত, 'কাঁসার থালা ঘষে মেজে পাৎলা হয়ে এই যে ধার ফুটে গেছে লম্বা হয়ে এর আর মুরোদ কি? একে গালিয়ে আবার অন্য জিনিস বানাতে হবে। খরচ অনেক। এর বদলে এই সম্মানী বগিথালাটা নাও, ঠাকুর বা জামাই এলে ভাত দিলে খুশি হবে।'

কাঁসার দাম যখন চৌষট্টি টাকা কেজি তখন পুরনো মাল বলে দাম ধরলে পঁয়তাল্লিশ টাকা আর ভরনের থালার দাম পঞ্চান্ন টাকা। কাঁসার কেজিতে আঠারো টাকা আর ভরনে দশ টাকা। আটাশ টাকা এক আনা থালা বেচে লাভ। এ পাড়ায় আর আসবে না ভরত ট্যাঁটারি। কেননা সম্মানী চকচকে বগীথালায় মাত্র সপ্তাখ নেক মাজলে নিকেল উঠে গিয়েই ফাটা কাটা দাগ বেরিয়ে আসবে। বন্ধকী দোকানদার হারু মোড়ল বলেছিল, 'এই থালাটা ফেলেছিল ডাকাতরা, পাকাবাড়ি ঠাকুরঘর লুঠ করে ফেরার বেলা গ্রামবাসীরা হল্লা করে ছুটে এলে ছুঁড়ে মারার সময়। হয়তো ইট পাথরে পড়েছিল, গরু বাঁধতে গিয়ে পায় এক বিধবা মেয়ে।'

ভরতের হাঁটুতে গেঁটে বাত, বাতিল ঘোড়াও পাওয়া যায় না, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুদ্ধের মাল বইতে সেসব নাকি ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে সরকার বাহাদুর। তাই তিরিশ বছরের চালু টঁ্যাটারি ব্যবসাটা বসে গেল ভরত দের। থালা-বাসনের কাঁড়ি জমে পড়ে রইল। বড় ছেলে আশিস চুস্ত পাজামা পিরহান পরে দাড়িগোঁফ রেখে মাথায় টুপি দিয়ে মুসলমানদের মত ঘুরে বেড়ায়। জানা গেল সে নাকি মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ভরত চেল্লাতে থাকে, 'ঠেঙিয়ে বার করে দোব বাড়ি থিগে শালার বেটাকে। মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করলে মুসলমান হতে হয় জানে না?'

আশিষ বললে, 'জোবেদা খাতুনের জন্যে আমি সব হোতে পারি।'

করিম খোন্দকারের একমাত্র মেয়ে জোবেদা খাতুন—সব টাকাপয়সা বাড়িঘরের মালিক হব আমি। গরু তো আমি পরোটা আর চালের আটার রুটি দিয়ে কতবার খেয়েছি, একবার কলমা পড়ে মুসলমান হতে দোষ কী! তেমনি খাসা সুন্দরী খাতুনে-জিন্নাত মোসাম্মাৎ জোবেদা বিবিকে বেগমরূপে পেয়ে যাব। সে আমার কাছে বেহেস্তের সরাবন তহুরা।…

ভতর দে ছেলের মুখে এরকম বেপরোয়া বাৎচিৎ শুনে বলল, 'নরকের কীট! হিন্দি সিনেমা দেখে গোল্লায় গেছিস তুই। তোর মুখ দেখাও পাপ…'

এরপর আশিষ দে হয়ে গেল আসফ আলি দে। সে কাঁসারির দোকান ফাঁদল বেশ বড়সড় করে। শ্বশুর করিম খোন্দকার দোকান সাজিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। মেয়ে দিয়ে একজন মুসলমান বাড়ানোর জন্যে সমাজে তাঁর বাড়তি সম্মানও জুটে গেল। আর যত মুসলিম ধর্মনিষ্ঠ বোকা খদ্দের এলেই হাতে হাত মিলিয়ে মোসাবা করবার পর আসফ আলি ইমানদারী ব্যবসাতে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। বাবা ভরত দে তার পেতল-কাঁসাগুলো দোকানে দিয়ে যেতে সেসব বেচে তাদের সংসার চালাবার আলাদা একটা কর্ড লাইন বার করে রেখেছে আসফ। শ্বশুর তা জেনেও আপত্তি করেননি। জোবেদাও স্বীকার করে, 'বাবা-মাকে দেখতে হবে বৈকি!'

কিন্তু বাবার দেওয়া একটি লক্ষ্মীডাবর তাদের সংসারে যে বাড়তি উপায় নির্ধারিত করে রেখেছে সেটা শ্বশুর বা গুণের বিবিজান বরদাস্ত করতে পারেন না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী শ্বশুর করিম খোন্দকার বলেন, 'ইমান ঠিক রাখো বাবা! মানুষকে জেনেশুনে ঠকানো পাপ। মুসলমান হয়েও তুমি ডাবর-পুজো করো?'

'ওটা এই একশো উনচল্লিশ বার খদ্দেরের হাত থেকে ফেরত এলো আব্বাজান! আর একবার হলেই গালিয়ে ফেলতে দোব।'

'না, আর একবারও নয়। জামাই হয়ে এভাবে ঠকালে আমারও বদনাম! আসলে এখনো মনে মনে তুমি 'পৌত্তলিক' আছ। ভাবছ ডাবরটার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাই বামুন ডেকে জবাফুলের মালা পরিয়ে গঙ্গাজল ভরে পুজোও করেছ পয়লা বৈশাখ হালখাতার দিনে।'

দাড়িভরা গম্ভীর মুখখানা যেন ক্ষোভে দুঃখে ভাংচুর হয়ে যায় করিম খোন্দকারের। চশমার ওপর দিয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

আসফ আলির কথায় 'হরতনের টেক্কা' বিবি জোবেদার মতলবে বাবার 'লক্ষ্মীডাবর' বাবাকে ফেরত দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে দোকানে বসে খাতায় লাল কালিতে 'ওঁ-দুর্গা' বারো বার লেখার পরেই ডাবর কেনার খদ্দের এসে গেল।

দাড়িঅলা ইমানদার এক মৌলবী খদ্দের সাচ্চা কাঁসার ডাবর কিনতে চাইলেন। লোকটাকে যেন চেনা-চেনা লাগল। মামাতো শালীর বিয়েতে এসেছিল। কোন পক্ষের লোক কে জানে। বড় মামাশ্বশুরের বড় মেয়ের বর বোধহয়। টুপি খুলে রাখল আসফ আলি। টুপি মাথায় দিয়ে অন্যায়

কাজ করা নাকি অবৈধ ! বয় আনন্দকে বলল, 'যা খাল থেকে জলভরে আন এই খাঁটি কাঁসার ডাবরটায় ।'

জল আধটা ভরে এনে বসিয়ে দিল আনন্দ। মৌলবী বললেন, 'ভরে আনল কই ? এতটা ফাঁক রইল যে ?'

'খালে অনেক নিচুতে পানি মিয়া-ভাই, হেঁট হয়ে হুমড়ি খেলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাবে। সন্দেহ হয়, আপনি যান—পানি ভরে আনুন। আমার দোকানে দু-নম্বরী মাল পাবেন না। সে রকম বিজনেস আমি করি না। সত্যের জন্য আমি ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হয়েছি।'

আর কোন কথা না। মৌলবী বেবাক খুশি। তিনশো পঁচাত্তর টাকা নব্বই পয়সা দিয়ে ডাবর কিনে নিয়ে চলে গেলেন।

'আল হামদো লিল্লাহ !' বললে আসফ আলি দে।

বৌভাতের দিন নিমন্ত্রণে গিয়ে নকল রুপোর একটা রেকাবি দান করে এলো সে মামাতো শালীর লৌকতায়। ডাবরটাকেও দিতে দেখল সেই মৌলবী চেহারার মামাতো ভায়রাভাইকে। জয়জয়কার যেন তাঁরই। শালীকে ডাবর দিয়েছেন। বড় ভগ্নিপতিকে এটা দিতে হয়।

'কত ভগ্নিপতি শালা এরকম আমার হাতে নিকেশ হল।' মনে মনে বলতে বলতে মোটরবাইকে চড়ে ফিরে ফিরে দাড়ি উড়িয়ে চলে এলো আসফ আলি।

দোকানে বসে সে কেবল অপেক্ষা করতে লাগল ডাবরটা কবে ফেরত আসবে—'হে মা-লক্ষ্মী ডাবর, তুমি ফিরে এসো।'

মাসখানেক কেটে গেল।

মামাতো শালী আবার ঘর করতে গিয়ে ডাবর ভরে রাখতেই সারারাত ধরে চিনচিন করে জল বেরিয়ে মেঝে ঢেউ হয়ে গেল !

শালীর মন খারাপ। তা বরের মেজাজও নাকি যানে খারাপ হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত মৌলবী মামাতো ভায়রাভাই একদিন বিকালে সেই ডাবরটাকে হাতে নিয়ে দোকানে এসে হাজির হয়ে বললেন, 'আচ্ছা ইমানদার মুসলমান হয়েছেন আপনি ! শেষ পর্যন্ত আমার মত একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান বান্দাকেই বেকুফ বানালেন ফুটো ডাবর গছিয়ে !'

'ফুটো ডাবর ! বলেন কি মিয়া-ভাই ! তোবা তোবা !' আকাশ থেকে পড়ল যেন আসফ আলি।

'খোঁজ নিয়েছি, বারো বছর আগে আপনার বাবা ভরত দে কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে গাধার পিঠে থালাবাটি সাজিয়ে পাড়ায় গিয়ে আমার বউকে কাঁসার থালা নিয়ে ফাটা ডাকাতে বগিথালা গছিয়ে এসেছিলেন। আপনি মুসলমান হয়েছেন শ্বশুরের টাকা আর তার রূপবতী মেয়ের লোভে, ইমানদার এখনো হতে পারেননি।' সত্যভাষণের মত গজগজ করে বললেন মৌলবী মিয়া-ভাই।

'এতো কথা আসছে কোথা থেকে ? বহু মালের মধ্যে একটা মাল কি কানা-ফাটা হতে পারে না ? আমি তো অস্বীকার করিনি। প্রথমত আপনি রশিদ দেখাননি। বেইমান হলে বলতে পারতাম, এ মাল আমার নয়। অন্য কোন

দোকান থেকে কিনেছেন। এই কোম্পানির মালই আমি তুলি না। যাক গে, আপনি টাকা ফেরত নিন। কত যেন দাম পড়েছিল?'

'তিনশো পঁচাত্তর টাকা নব্বই পয়সা।'

ওজন দেখে দাম কষে আসফ আলি বলল, 'তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা নব্বই পয়সা—পঁচাত্তর নয়।'

'না, কখনো নয়। তিনশো পঁচাত্তর······আমার ঠিক মনে আছে···আমি আপনার মত ঠক নই···খালে জল ছিল না···বেইমান কোথাকার!' মৌলবীর রোষকষায়িত নেত্র।

'চেঁচাবেন না।' কর্কশ স্বরে বলল আসফ আলি। 'দিন কুড়ি টাকা পালিশ-খরচ। আপনার দামই ফেরত দিচ্ছি।'

কুড়ি টাকা কেটে নিয়ে ফেরত দিতে মৌলবী সাহেব যেন কল্লাকাটা মোরগের মত ডিগবাজি খেতে খেতে বাজার থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিসে যেন ঠক্কর খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেও রয়ে গেলেন।

টুপিটা মাথায় চড়িয়ে আসফ আলি বললে, 'আল হামদো লিল্লাহ!'

মামার বাড়ি থেকে ডাবর বিক্রির ফন্দীবাজের কথা কানে এলো জোবেদা খাতুনের। রিকসাভাড়া দিয়ে মামী এসে মায়ের কাছে জানিয়ে গেলেন, 'এমন জামাই মানুষ করে? ঠক্ জোচ্চোর! তাও কেউ জেনেশুনে আত্মীয়-কুটুমবাড়িতে এই কাজ করে? আবার পালিশের কুড়ি টাকা কেটে নিয়েছে? ডাবর ফেরত দেবার সময় দশটাকা আবার দাম কমও বলেছিল। ছি! এমন মানুষের ছায়া মাড়ানোও পাপ!'

জোবেদা খাতুন কুড়িটা টাকা নিয়ে মামীর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা ফেরত দিও মামী বড় দুলা-ভাইকে।'

মামী তা নিয়েও গেলেন।

শ্বশুর করিম খোন্দকার এত রেগে গেলেন যে বলতে লাগলেন, 'কি অপমান! আত্মীয়বাড়িতে ফাটা মাল গছিয়ে দিয়ে জামাই তার পালিশ-খরচা নিলে? তারা বলছে, অমুকের জামাই এইরকম চরিত্রের লোক! জোবেদা, তুই এক কাজ কর মা, আমার সংসারটাকে শান্তিতে থাকতে দে—তোরা যেখানে পারিস থাক গিয়ে। দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, এখন তো আর বলতে পারি না জামাইকে তুই তালাক দে!'

ভাবতে লাগল স্বামী রত্নটিকে কেমনভাবে নেবে আজ জোবেদা খাতুন। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন হয়ে থাকে তেমনি থমথমে হয়ে রইল সে।

রাত্রে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বললে, 'লক্ষ্মী-ডাবরটাকে নিয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত এইরকম অলক্ষ্মী কান্ড করলে? আব্বা আমাদের অন্যত্র গিয়ে থাকতে বলছেন।'

'ঠিক আছে, চলে যাব। তুমি যেতে চাও চলো, আমার বাপের কি ঘর নেই?'

'আমি ওবাড়িতে গিয়ে থাকতে পারলেও তোমার ধর্মগোঁড়া পৌত্তলিক মা-বাবা কি আমাকে সহজ মনে মেনে নিতে পারবেন? আমাকে হেঁসেলে

ঢুকতে দেবেন ? তোমাকে ধর্মত্যাগ করনোর জন্যে বরং আমাকে গালমন্দ করতে পারেন। তার চাইতে বরঞ্চ অন্য কোথাও ঘরভাড়া নাও।'

বিছানায় পড়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ভাবতে লাগল আসফ আলি দে। এই বৈজ্ঞানিক যুগেও ধর্মগোঁড়ারা এখনো পৃথিবী ছেয়ে আছে।

জোবেদা খাতুন বললে, 'তুমি ঐ লক্ষ্মীঘড়াটা দরিয়ায় ফেলে দিয়ে এসো তো আগে, তারপর আমি দেখছি।'

'জানো ওটায় একশো চল্লিশ বারে কত উপায় হয়েছে ?'

প্রশ্নালু চোখে তাকাল জোবেদা খাতুন।

'আড়াই হাজার টাকা। ওর আলাদা খাতা আছে। একশো দশজন হিন্দু আর মাত্র তিরিশজন মুসলমান ঠকেছে ওটাকে কিনে নিয়ে গিয়ে। সবাই পালিশ-খরচা দিয়েছে দশ টাকা পনেরো টাকা থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত। বাবার কাছে ছিল দশ বছর আর আমার কাছে আছে দশ বছর। প্রত্যেক খদ্দেরের নাম ঠিকানা লেখা আছে। এমন উপায়ের জিনিসটাকে নদীতে বিসর্জন দিয়ে আসতে বলছ তুমি ? অর্থনৈতিক বুদ্ধি থাকলে একথা বলতে না।'

জোবেদা যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'তুমিও যেমন মেকি, তোমার ভালবাসাও মেকি। আমাকে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলে, ধর্মত্যাগ করেছিলে তো শুধু স্বার্থের জন্যে!'

'কে ধর্মত্যাগ করেছে শুনি ?' বলল ব্যঙ্গস্বরে আসফ আলি। 'আমি এখনো সেই আশিস দে-ই আছি। জন্মসূত্রে যা লাভ করা যায়, মানুষ তা কি সহজে ত্যাগ করতে পারে ?'

'তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার ঘরকন্না করাই মুশকিল!'

'করবে না। আমি কালই আবার ন্যাড়া হয়ে টিকি রেখে হিন্দু হয়ে বাবার সংসারে ফিরে যাব। থাকো তোমার বাবাকে নিয়ে।'

'আর তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। এক রাতও নয়। দয়া করে তুমি তোমার স্বাধীন পথে চলে যাও। তোমার মত স্বামীর জন্যে আর আমার অহঙ্কার করার কিছু নেই।'

শান্তস্বরে কথাগুলো বলাতে আসফ আলির আবার আশিসে পরিণত হতে দেরি হল না। বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আর টিকি রেখে মুড়িয়ে ফেললে মাথাটাকে। গোবর গিলে প্রায়শ্চিত্ত করলে। পৈতা পর্যন্ত দিয়ে দিলেন হিন্দু সমাজের উদ্যমশীল নবতম রক্ষকরা। নামাবলী গায়ে দিয়ে কাঁসারি দোকানে বসল আশিসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু মাত্র একবেলা তার এই দোকানদারী। লোক জমে গিয়েছিল তাকে দেখতে।

দুপুরের বন্ধ দোকান বিকালে খুলতে এসে দেখলে 'মডার্ণ এম্পোরিয়াম' —যার প্রোপাইটার জোবেদা খাতুন—সে নিজেই দুটো মজবুত তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে। দোকানের মালিকানা স্বত্ব কাগজে কলমে জোবেদা খাতুনের নামে। রোমান্টিক মন আগে অত সচেতন হয়নি আশিসের। ভেবেছিল

সে নিজেই যখন জোবেদা খাতুনের জন্য ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করছে, তার নামে ব্যবসা থাকলে ক্ষতি কি ? তাতে দাম্পত্য-প্রেমটা অন্তত খুব নিবিড় করে পাওয়া যাবে।

থানার বড়বাবুর কাছে শরণাপন্ন হয়েও আশিস তেমন কিছু করতে পারলে না। মালিকানা যে তার স্ত্রীর নামে। স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক নয়।

জোর করে তালা ভেঙে অধিকার কায়েম করতে গেলে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। আশিস বা আসফকে নিয়ে দু-দলের গোঁড়ারা এখন আড়ালে বসে গা ফোলাচ্ছে হুলো বেড়ালের মতো।

এর মধ্যে ভরত দে হঠাৎ একদিন মারা গেল। আশিসকে মুখাগ্নি করতে দিল না তার অন্য ভাইটি। বাবার আত্মা নাকি অশান্তিতে ভুগবে তেমন স্বৈরাচার করলে।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে নিজের হাতে টিকিটা কেটে ফেললে আশিস। আবার সে মুসলিম বেশ ধারণ করল। কিন্তু ছোট ভাই অনিমেষ জানাল, 'ধর্মত্যাগ মৃত্যুসমান। তোমার মৃত্যু হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি বা তার বাড়িতে তো তোমার থাকা হবে না। এ বাড়িতে ঠাকুরবাকুর আছে, এখানে তোমার আল্লা আল্লা করে নামাজ পড়া চলবে না।'

আশিস বুঝল অনিমেষ যখন স্বার্থের গন্ধ পেয়েছে, তাকে ধমকে বা মারধর করে এখানে নিজের অধিকারে আর এখন থাকা কঠিন। প্রায়শ্চিত্ত করে স্বধর্মে ফিরে আসাতে বাবা-মা সন্তুষ্ট হলেও অনিমেষ হয়নি। সে গোঁড়া হয়ে হঠাৎ যেন ধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে গেল। কারণ এই পথে দাদাকে কোণঠাসা করতে পেরে পৈতৃক সবকিছু দখল করতে পারবে। তাই বাবার মুখাগ্নি পর্যন্ত করতে দেয়নি।

অথচ এটাও ঠিক, জোবেদাকে বা তার কাছে থাকা বাচ্চা দুটির মায়া সে ত্যাগ করতে পারবে না। জোবেদার স্মৃতি এখনো তাকে পাগল করে তোলে। কেননা জোবেদার শরীর এখনো হড়পা-বান-ডাকা নদীর মতো যৌবনজোয়ারে উথালপাথাল হয়ে আছে।

নদীর ধারে সারাদিন বসে বসে ভাবে আর চোখের জল ফেলে আশিস। তার হাত এখন একেবারে শূন্য।

ভেবে দেখে, বাবার পথ ঠিক পথ নয়। বাবা ফাটা-কাটা থালা-বাটি পালিশ করিয়ে এনে দু-নম্বরী ব্যবসা চালিয়ে বাড়ি আর বিঘে দশেক জমি করে গেছে। তার লিক-হয়ে থাকা ডাবরটা বেচে পালিশখরচ আদায় করাটাও অন্যায়। অবশ্য সোজাপথে এত তাড়াতাড়ি বাবার পক্ষে মাটি ধরে ওঠাও কঠিন ছিল।

তবে জোবেদার যুক্তিটাই ঠিক। জেনেশুনে তার আত্মীয়কুটুম্বকে ঠকানো উচিত হয়নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর শ্বশুরবাড়িতে এসে

নিজের বাচ্চাদের ডাকলে, জোবেদা এসে হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে টানতে থাকল। কাঁদতে লাগল আশিস। তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে জোবেদাও নীরবে কাঁদতে লাগল। জোবেদার বুক বেয়ে নেমে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল আশিস, 'ক্ষমা করো আমাকে, ক্ষমা করো।'

পরদিন জোবেদা গিয়ে দোকানের তালা খুলে দিতে আসফ আলি খোন্দকার লক্ষ্মীর ডাবরটাকে হাতুড়ি মেরে মেরে বেঁকে-দুমড়ে একদিকে ফেলে দিলে। তবুও জোবেদা সেটাকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে বললে, যাতে বিক্রি করে তা থেকে আর কোনোরকম মুনাফা না করতে পারে আসফ আলি। বললে, 'লক্ষ্মী-ডাবর থেকে মুনাফা করা টাকাগুলো সমস্ত গরিব ভিখারিদের বস্ত্র কিনে দাও। বাবার হাতে যেসব টাকা গেছে তাও তোমার পিতৃঋণ মনে করে দান করে দাও, তাতে মানসিক শান্তি পাবে।'

আসফ আলি বলল, 'আল হামদো লিল্লাহ। দাও তাহলে আড়াই হাজার টাকার চেক লিখে। তোমার হাতে আমার সবকিছু। তুমি ছাড়া আমি তো পথের ভিখারি।'

চেক কেটে দিলে জোবেদা খাতুন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেবার পর জোবেদা নিজেই কাপড় কিনে আনল সমস্ত টাকায়। নিজের হাতে তা বিতরণ করে দিলে গরিব ভিখারিদের।

জোবেদা ডিমের আকারের পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে দীপ্ত দীঘল দুটি চোখ, তিলফুলের মতো সুন্দর খাড়া নাক, টেপা পাতলা ঠোঁট আর থুৎনির ওপরের বড় আকারের তিলটি মিলে ন্যায়ের দৃঢ়তার যেন কেমন এক অচেনা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল—আসফ আলি দেখে অভিভূত হল।

মসজিদে মগরেবের আজান হচ্ছে শুনে অজু করে নামাজ পড়তে চলে গেল সে। চোখে জল এসে গেল তার প্রার্থনার সময়।

হিন্ডোলিয়াম আর স্টিলের থালা বাটি গ্লাস জগ ইত্যাদিতে আবার নতুন করে দোকান সাজিয়ে স্বামীর নামে দোকানের বোর্ড পালটে দিলে জোবেদা খাতুন। ব্যাঙ্কের সমস্ত ডিপোজিটও ট্রান্সফার করে দিলে এবার।

স্পঞ্জের গদিতে বসে পাখার হাওয়ায় সেন্টের গন্ধে ঘুম পেতেই তন্দ্রার মধ্যে যেন শুনতে পেলে কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে আশিসের বাবা ভরত ট্যাঁটারি গাধার পিঠে থালাবাসন চাপিয়ে নিয়ে বিক্রি করতে চলেছে গ্রামগঞ্জের পথে। আর হাঁক দিয়ে বলছে, 'নতুন থালা-বাটি নিয়ে পুরনো ফাটা-কাটা থালা-বাটি বদল করবে গো!...'

তারপর আবার চিতার আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

জোবেদা খাতুন হঠাৎ এসে মাথায় হাত দিলে। বললে, 'দোকানে বসে ঘুম! ভেতরে গিয়ে ঘুমোও। আমি তোমার দোকান দেখছি।'

আসফ আলি বলল, 'আল্ হামদো লিল্লাহ! আব্বা এলে বলো সে আবার চৈতন রেখে হিন্দু হয়ে গেছে।'

জোবেদা খাতুন বলল, 'দুষ্টু কোথাকার!'

নাজিয়ার চোখের পানিতে

এবং দাড়ি রাখল কদম রসুল মোল্লা। সুন্নতি পোশাক পরল। জালিদার আরবী টুপি, লম্বা পীরহান, খাটো পাজামা।

মহল্লার মোল্লাকি পাবার পর থেকে আল্লা আল্লা করে তার দিন কাটে। একজন গায়েবি ক্ষমতাসম্পন্ন পীরের কাছেও সে মুরিদ হয়ে এসেছে। গোপন মনে একটা মতলব রেখেছে, ভবিষ্যতে সেও একজন কামেল পীর হবে।

কেতাব-কায়দাও জোটাল সে মেলা। পানিপড়া, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদি দিতে লাগল। সব রকম নামাজ আদায় করতে লাগল। পাড়ায় একটা উদ্দীপনা আনল দ্বীনি-ইসলামের। কিন্তু এহেন মুসাল্লির বিবি নাজিয়া খাতুন শয়তানী ফেরেবে পড়ে নামাজ-রোজা কিছুই করে না, বোরখা পরালে 'ভূত' বলে হেসেই খুন।

সুরমা-টানা চোখ বার করে ধমক মারে কদম রসুল, 'খিল-খিল হাসি থামাও, বেয়াদপ মেয়েমানুষ! বোরখা পিঁদতেই হবে।'

'হাঁ, আমি গরমে মরে যাব!' বলে নাজিয়া খাতুন আদুরে গলায়।

'গরম ছাড়াবে যখন ফেরেস্তারা, কব্বরে গেলে? পর-পুরুষকে চেহারা দেখাবার অছিলা। বাপের বাড়ি থেকে তুমি টকি-বায়েসকোপ দেখে, যাত্রা-'ভাইয়ে' গান শুনে গোল্লায় গেছ! আজ স্বপন দেখনু, মুই যেন একটা ফুলের বাগানঅলা ভেসতি মাকানে ঢুকছি আর (কথাটা যে মিথ্যা এবং বানানো তা তার মনই জানে—তাই আড়চোখে একবার তাকিয়ে নেয় বিবির দিকে) কে যেন মোর পীরহান ধরে টানছে—যেতে দিচ্ছে না—দেখি তুই—আমার বিবি নাজিয়া খাতুন!'

চাল বাছতে বাছতে নাজিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, 'মৌলবি-পীর-ওলিরা বড্ড স্বপন দেখে! পরের মুরগী খেয়ে তো তাদের 'প্যাট' গরম হয় বেশি—তিন-চার কাপ চা খাও না, কত রকমের স্বপন দেখবে সারারাত!'

'বলি, তুই নামাজ পড়িসনি কেন তাই বল্ না?'

'কি করে পড়ব, কখানা কাপড় মোর? ছোট ছেলেমেয়ে দুটো বিছেনে মোতে, কাপড় নোংরা হয় আর ...'

'আর নামাজের সুরাগুলো এখনো মুখস্থ হয়নি! যে চায় সে যেমন করে হোক করে—তোর একিন্ নেই। আসলে সে রক্তের আওলাদ তুই নয়। তোর তো আদ্দেক হিঁদু, আদ্দেক মুসলমান! ইস্কুলের মাস্টার, তাই ধুতি পেঁদে। দাড়ি রাখেনে—আল্লার চেয়ে খাতির করে হিঁদু-বন্ধুদের।

আমি সাফকথা কয়ে দিচ্ছি বিবি, যদি পাঁচ-ওকত নামাজ না পড় তো মেরে তোমার খোলে লউ ফেলে দোব, নাহয় আমার বাড়ি ছাড়, দোসরা বিবি আমি ঘরে লেসব।'

'লেস লেস! নাহলে মোল্লাকির গরম কাটবে কেন? ছিঃ, দু-দুটো ছেলেমেয়ে যার তার আবার বে করবার কথা বলতে লজ্জা পায়নে!'

বাইরে কে তখন ডাকছিল মোল্লাজীকে। তাড়াতাড়ি মাথায় টুপি পরে গায়ে ঝাড়ন দিয়ে বেরিয়ে এল ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কলমা-দরুদ পড়তে পড়তে কদম রসুল।

দুজন লোক এসেছে দূরের গ্রাম থেকে। ঘোলাচোখ, ময়লা পোশাক। তাদের ভেতরে এনে বসিয়ে চা-পানি দিতে বলল।

একজন বললে, 'আপনার নাম শুনিচি বাবা, মস্ত কামেল লোক আপনি। মোদের গেরাম বন্ধ করে দিয়ে এসবে চল। খুব কলেরা লেগেছে। চারজন লোক মরে গেছে।'

হাঁক মেরে উঠল কদম রসুল, 'আরো মরবে। গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। 'ওবা' এসেছে। তাকে তাড়াতে হবে। 'খাঁজে-খতম' করতে হবে। অনেক খরচ।'

'কত খরচ হবে বাবা মোল্লাজী?'

'তা হাজার টাকা। আমি গোটা কোরআন শরীফ খতম করব দুদিনের মধ্যে। আমাকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে। আর পাঁচশো লাগবে লাল নিশান, যত ঘর আছে ততটা নতুন সরা, আলোচাল, ছোলা, ফল-পাকড় কেনার জন্যে। আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপপানি কিনতে হবে। যে কব্বর খারাপ হয়েছে তার আবার নয়া কাফন দিতে হবে।'

চা-মুড়ি দিতে এল নাজিয়া খাতুন। মাথায় ঘোমটা নেই তার। সে গ্রাহ্য করেনি লোক দুটিকে। তারা তাকিয়ে আছে ওর খাপ-সুরতের দিকে। নাজিয়াকে দেখতে ভাল, পাতলা খাড়া নাক, টানা-টানা বড় চোখ, দীর্ঘ ভুরু, ফরসা রং, মাঝারি গোলগাল চেহারা।

চট করে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে নাজিয়াকে ডেকে তার চুলের মুঠি ধরে এক হেঁচকা মারল কদম রসুল। বলল, 'তোর বাবা-খুড়ো ওরা, হারামি, বে-সরম। মাথায় কাপড় কই তোর?' কদম রসুলের চাপা স্বর যেন বোড়া সাপের হিসহিসানি।

নাজিয়া এক ঝটকা মেরে খসমের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'কোথাকার কে সব বাজে বোকা লোক—তাদের দেখে আবার মাথায় কাপড় দাও!'

'এ শালীকে কি বোঝাব, বাজে বোকা লোকই তো চাই—এরাই আমাদের পুঁজি। টাকা আদায় করতে হবে না? সংসার চলবে কেমন করে?'

গজগজ করতে করতে বেরিয়ে আসে নাজিয়া, 'চাকরি করবে না, ধর্মের নামে ব্যবসা! প্রতিবাদ করলেই আমরা কাফের শয়তান!'

লোক দুটোর কাছে এসে আবার বসে কদম রসুল। গল্প ফাঁদে: 'একবার ভগবানপুর গাঁয়ে গেলাম আমি, সে সোঁদরবনের ওদিকে, লোকোতে

করে দুদিনের পথ—গাঁ উজাড় হয়ে গেছে কলেরায়—হাড়িয়া-তাড়ি-খেনো মদ খায়—'ওবা' তাড়াতে যেয়ে দেখি—একটা মড়া মালসা গিলছে।'

'বল কি বাবা। ভয়ে যে মোর কোলজে পর্যন্ত কাঁপতেছে গো।'

'হাঁ, মালসা গিলেছে।' বিকৃত স্বরে বলল কদম রসুল।

লোক দুটোকে অনেক 'আজান' গল্প শোনাল সে। তারা পঞ্চাশ টাকা পায়ে রেখে দিয়ে চলে গেল।

কদম রসুল বুক-বুক খুশি। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাগ হাতে নিয়ে কসাইখানায় গেল। মাংস আনল তিন কেজি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে কষে মশলাপাতি দিয়ে রান্নাও করল নাজিয়া। বড় ছেলে গহরকে নিয়ে খেলে কদম রসুল কোমরের 'থামি' আলগা করে। জোহরের নামাজ পড়তেও পারল না। শুয়ে নাকডাকিয়ে ঘুমোল, যখন উঠল তখন আসবের সময়। তাড়াতাড়ি কাজসহ নামাজ আদায় করে টর্চ আর ঝোলাঝাম্পি নিয়ে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, 'ফিরতে রাত হবে।'

স্বামীর খাওয়া হয়নি, তাই না খেয়ে রাত জাগতে জাগতে একসময় ঘুমিয়ে গেল নাজিয়া। ছোট মেয়েটা কাঁদলে ঘুম ভেঙে যায় তার। বন্ধ ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। চাচাত দেওর-ভাসুরদের কুকুরটা কি জানি কি দেখে ডাকে খুব। লোকটার ভয়-ডর নেই—কবরের মধ্যে তিন দিন তিন রাত থাকল। নাজিয়া জানে আগে থেকে, গোটাদশেক নারকেল-ডাব ও কবরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল আর খানিকটা দূরে একটা ভাঙা কবরের মধ্যে দিয়ে ছোট জানালার মত ফুটো করে রেখেছিল, নইলে কি আল্লার জানটা মাজেজা দেখাতে গিয়ে খতম করে বসবে সে। মনে মনে হাসে নাজিয়া।

রাত দুটোর ঘন্টা হয়ে যাবার পর ঘরের লোক ফিরল। দোর খুলে দিল। উঃ, মড়ার গন্ধ! গায়ে রঙ-কাদা-মাটি! পাগলের মূর্তি!

সাবান নিয়ে গা-হাত ধুয়ে এল কদম রসুল। ভাত খেল সে ঘাড় গুঁজে বিকারগ্রস্তের মত। হঠাৎ ভয়ে যেন আঁৎকে উঠে চারদিকে তাকাল। বলল, 'কে?'

'কই কে?'

'শালা, কলেরা রোগী মরলে যে রকম করে দাঁত বার করে থাকে!' গা ঝাঁকরাল কদম রসুল।

'গিয়েছিলে সেখানে?'

'কোথা? না, তোর অত খোঁজখবরে দরকার কি? পাবি খাবি—ছাপোষা মেয়েমানুষ! ঘরে কেউ আসেনি তো?'

'কে আসবে?'

'এলে ফাটাব, কাঠচেলার বাড়ি মেরে সাবাড় করে দেব—রূপসী মেয়েমানুষ আর ফুল একই জিনিস!'

শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকাতে লাগল কদম রসুল। ঘুমে ঘুমে ও কত কি বকে!

ভোরবেলায় নাজিয়ার যখন ঘুম ভাঙল, শুনতে পেল কদম রসুল ফজরের নামাজ পড়ছে।

বিকেলে রিকশা এল। মস্তান, মৌলবি, খাজা, ওস্তাগীর, আল্লামা কদম রসুল পীরহান পাগড়ি পরে লতার লাটি নিয়ে কলেরার অপদেবতা 'ওবা' তাড়াতে বেরুল আজিমপুর গাঁয়ে। সেখানে গিয়ে পাড়ার মাতব্বর মতলেব আশির দলিজে আলিসান হয়ে বসল তাকিয়ে ঠেস দিয়ে। খতম পড়ানো হচ্ছে তখন কয়েকজন মৌলবিকে দিয়ে। ফল-ফলার কুঁচোনো জমা করা আছে কলাপাতায়। ছোলা পড়া শুরু হয়ে গেল। রাত নটার পর কদম রসুল বলল, 'আমি এখন 'ওবা'কে তেড়ে নিয়ে যাব—কেউ যেন না আমার সামনে পড়ে'—বলেই সে ঘোড়ার মত দৌড় মারল। কিছুক্ষণ পরেই 'ইল' শব্দ—দূরের পশ্চিম মাঠে—পরে পুবে—তারপর উত্তরে—শেষে দক্ষিণে।

রাত বারোটার সময় লোকজনদের কাছে এসে ঘোষণা করল কদম রসুল—একটি কবরের মধ্যে এক যুবতী মেয়ে 'খ্যান' পেয়ে তেরো হাত কাফনের কাপড় গিলে বসে আছে।'

হ্যাসাক লাইট এল কবরখানায়। কবর খোঁড়া হল। মস্তানবাবার কথাটা সত্যি! দেখল সবাই। গাঁয়ের হালিমা নামের স্বামীহীনা মেয়েটি কাফন গিলে চোখ-মুখ বার করে বিকট মূর্তিতে বসে আছে। গায়ে তার রক্ত। বীভৎস দৃশ্য। পাড়ার যত লোক ভেঙে পড়েছে।

দুর্ধর্ষ সাহসী লোক, একাই লাস টেনে তুলল কদম রসুল। পেটে পা দিয়ে কাফন টেনে বার করল। গোসল দেওয়া হল। নতুন কাফন পরানো হল। গোর দেওয়া হল আবার।

সবাই ভয়ে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে।

কদম রসুল দোয়া-দরুদ পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করল। নিশান পুঁতল গাঁয়ের চার কোণে। সরা পড়া দিল সব বাড়িতে। সকাল হয়ে গেল। ফজরের নামাজ পড়ে উঠতেই সাড়ে চারশো টাকা তার পায়ের ওপর রেখে দিলে আজিমপুরের লোকরা।

বাড়ি ফিরতেই পশ্চিমাকাশে কালো স্লেটের মত মেঘ দেখা দিল। ঝড় উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

'শোভান আল্লা'—বলে হাতে মুখ মুছল কদম রসুল। আল্লা তার মুখ রেখেছে। বৃষ্টি যখন নেমেছে তখন কলেরার মড়ক চলে যাবে।

নাজিয়া কিন্তু স্বামীর এইসব আধিভৌতিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করে না। তার আব্বা অনেকটা মুক্তবুদ্ধির মানুষ। তার অনেক কথায় নাজিয়াও সব কিছুর কারণ খোঁজে, সত্য খোঁজে। ক্রমে ক্রমে স্বামী পয়সার ধান্ধায় ধর্মের নামে আধিভৌতিক অপদেবতা বনার জন্য স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে দেখে একদিন বলে, 'মাছির মতন লোকজন আসছে, আর আমি তাদের খেদমত করে মরি……'

'বেরোও, বাড়ি থেকে বেরোও, মেয়েমানুষের অভাব আছে?' পিঠে জোরে চাপড় মেরে ঘাড়ধাক্কা মেরে বাইরে বার করে দিতে বড় ছেলেটা কাঁদতে লাগল। তাকেও মারল কদম রসুল। এ ছেলেটাও বোঝে না যে কদম রসুল মারা গেলে তার কবরের ওপর 'মাজার শরীফ' হবে আর পীরজাদা বলে ঐ গহর আলিই সম্মান পাবে মানুষের—তাকে আর খেটে খেতে হবে না। আর কটা বছর ধৈর্য ধরে থাকলেই তো পীরমা হতে পারত নাজিয়া। ম্যাট্রিক ফেল মারার পর কদম রসুল অনেক চেষ্টাই করেছিল স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য কিন্তু পারেনি। ডানপিটে বাপ মারা গেছে তার অনাহারে, রোগে ভুগে। মাও মারা গেল দুঃখের সংসারে। যুবতী বউ নাজিয়াকে ফেলে রেখে সে এখানে-ওখানে পালাত। একবার গরু চুরি করে বেচতে গিয়ে বেধড়ক মার খেল—অবশ্য অন্য গাঁয়ে। তারপর এক পীরের আস্তায় পড়ে রইল মাসখানেক। পীরের কায়দা-কানুন শিখে এল। এসে দেখে ঘরদোর বিরাম হয়ে পড়ে আছে। মা মারা যেতে নাজিয়া নাকি পোয়াতি অবস্থাতেই চলে গেছে বাপের বাড়ি। তাকে আনল সে। শ্বশুর দুশো টাকা আর দু-বস্তা ধান দিল।

নাজিয়া ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে হঠাৎ বাপের বাড়ি চলে এল। বাপকে বলল জামাইয়ের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের কথা। তাকে মারপিটের কথা।

বাপ-মা তাকে আটকে রাখল—জামাই এলে তার ঘাড় থেকে কালাজিন তাড়াবার কথা বলে।

কিন্তু এক হপ্তা চলে গেল কদম রসুল বৌকে আনতে এল না। ভাই-ভাবিদের আদরযত্ন কয়েকদিন পরেই শুকিয়ে গেল। ঘরের অভাব। দাবায় শুতে হয়। ছেলেমেয়ের জ্বর।......

নাজিয়া বড় ভাইয়ের নীতিকথায় বিরক্ত হয়। মুসলমান মেয়েদের নাকি স্বামীভক্তি বলে কোনো পদার্থ নেই। নিজেদের ব্যবহারের জন্যেই তারা সংসার হারিয়ে পথের ভিখারি হয়। সঙ্গে নিয়ে ফেরে গোটাচার-পাঁচেক ছেলে। এইসব ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ কী?

নাজিয়া বুঝল, অপ্রত্যক্ষভাবে বড় ভাই তাকে চলে যেতে বলছে। আব্বাও নীরব। মা বলল, কি বলব মা আমি—যা না হয়, দেখ, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, দুঃখ তো সইতেই হবে।'

কান্নাকাটি করার পর নাজিয়া বাপের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা নিয়ে রিকশায় চড়ে বোরখা পরেই স্বামীর ঘরে এল। স্বামী কদম রসুল তখন ঘর বন্ধ করে কোনো একজন বউয়ের ওপর থেকে জিনের আশর ছাড়াচ্ছে। আরবী শ্লোক উচ্চারণের শব্দ হচ্ছে।

বাইরের দাবায় দুজন মেয়ে-পুরুষ বসে আছে। তারাই এনেছে বউটাকে। মারের চোটে বউটা চেঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে অনেকে উঁকি মারছে। তাদের তাড়া করল নাজিয়া। নাজিয়ার গলার স্বর শোনার পর হঠাৎ কদম রসুলের মনে খটকা লাগল, ও তো এসবে বিশ্বাস করে না, বউটা চিৎ হয়ে পড়ে গাঁজা

তুলছে, দুরন্ত যৌবন মেয়েটার, ওর স্বামী নাকি পাগল-প্রকৃতির, মারধর করে। মেয়েটার চেহারাটা সে দেখেছে বারকয়েক।

নাজিয়া এসেছে।

ছেলে গহর বলছে, 'আব্বা ভূত।'

সত্যি, সে নিজেই তো ভূত। দোর খুলে বেরিয়ে এল।

নাজিয়াকে দেখে বলল, 'বাপের ঘরে জায়গা হল না? এ্যাদ্দিন আমি খাই কি, রাঁধে কে—এসব ভাবনা কোথায় ছিল? যাও এখান থেকে—বেহায়া মেয়েমানুষ তোমারও কালাজিন ছাড়িয়ে দোব।'

বউটার হুঁশ হল তিনঘণ্টা পরে, ওরা পঁচিশটা টাকা দিয়ে গেল। যাবার সময় বউটার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নাজিয়া একটু আড়ালে পেয়ে। ওর বাবা আর শাশুড়ীকে বলে দিল, 'হিসটিরিয়া হয়েছে, ডাক্তার দেখাও, এ সব ওর ফকিকিবাজি! যাও, পালাও সব!'

কিন্তু কথাটা শূন্যে ঢিল ছোঁড়ার মত নিজের কাছেই আবার ফিরে এল নাজিয়ার। চাচাত বোন রান্না করতে এলে তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজের সংসারের কাজ নিজেই করতে লাগল সে। কদম রসুল বাইরে গেছে। লোকগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। পাছে কেউ তার বিরুদ্ধে ভাংচি লাগায়।

ওরা যদি বলে দেয়?

ভয়ে-ভয়েই ছিল নাজিয়া।

রাত দশটার পর কদম রসুল বাড়িতে ফিরে আগে অজু করল। ঈসার নামাজ পড়ল। সতের রাকাত নামাজ। দেরি হয়।

নাজিয়া ঘুমে ঢুলছিল। গলাখাঁকারি দিয়ে কদম রসুল জানান দিল যে তার নামাজ শেষ হয়ে গেছে।

মাদুরি পেতে 'পানি ঢেলে' 'ভাত খসিয়ে' স্বামীকে খেতে দিল নাজিয়া।

খেতে বসল কদম রসুল। তার খণ্ডতয়ের মত বাঁকা দাড়িওলা মুখের ছায়াটাও ছাগলের মত গাল নেড়ে ভাত খাচ্ছে।

কদম রসুল বলল, 'যে বউটা এসেছিল তার মৃগী রোগ হয়েছে তোমাকে কে বললে?'

নাজিয়া কিছু বলল না।

'তুমি কি ডাক্তার? বুকে বসে চোখে ঠোকর মারতে চাও?'

নাজিয়া কিছু বলে না।

'যদি আমার ঘর করতে চাও তো আমার কাজকাম সব মেনে নিতে হবে, নচেৎ কেটে পড়। এক কেজি চাল, একটা টাকা কেউ দেবে? জীবনটা কি জিনিস তুমি জানো? বাঘ যে হরিণের ঘাড় মটকায়, বাজপাখি যে মুরগীর ছানা ধরে, সাপ যে ব্যাঙ খায়—সেসব কি অন্যায়?'

নাজিয়া শুধু অবাক চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। সে যেন কিছু বলতে চায়। মানুষ আর পশুপ্রাণী এক নয়? মানবতার কথা? দৃষ্টিতে ওর তিরস্কার কেন? মেয়েমানুষটার কপালে দুঃখ আছে।

যাক গে, সহ্য সবুরি ভাল। শুয়ে পড়ল কদম রসুল।

অভিমানে বাচ্চাদের সঙ্গে অন্য বিছানায় শুয়ে রইল নাজিয়া। সে চাইছিল স্বামী তাকে আগের মতই একটু আদর করুক, কাছে তুলে আনুক কিন্তু সেটাই তার ভুল।

মৃগীরোগী বউটার যৌবন, তার চেহারা তখন কদম রসুলের মাথার ভেতরে ঘুরছে। নাজিয়ার মধ্যে আর কি আছে? তবু কত অহংকার!

রাত জাগতে জাগতে মাথায় গরম ওঠে কদম রসুলের। সে একাই নানান কথা বকতে থাকে। গালিগালাজ করে। নাজিয়া ঘুমের ভান করে সবই শোনে।

একসময় তাকে হেঁচকা মেরে টেনে তোলে কদম রসুল। মুখে ঘুঁষি মারে। 'মাগো' বলে মুখ চেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নাজিয়া। তার পিঠে লাথি মারতে থাকে কদম রসুল।

কান্না চিৎকার। গহরও উঠে পড়ে কাঁদতে থাকে।

গলা টিপে ধরে কদম রসুল। জিভ বেরিয়ে পড়ে নাজিয়ার। একসময় সে উঠে পালায়। ছুটে গিয়ে কদম রসুল তাকে ধরে মারতে থাকলে নাজিয়া বাঁখারি কেড়ে নিয়ে স্বামীর মাথায় কষিয়ে দেয় জোরে এক ঘা। কদম রসুল চিৎকার করে ওঠে: 'স্বামীকে মারো তুমি, এমন হারামজাদী! আজ তোর একদিন কি মোর একদিন!'

নাজিয়া ছুটতে থাকে পাগলের মত। অন্ধকারে ধানবন, বাঁশবন জঙ্গল ভরা কবরডাঙার ভেতর দিয়ে। কদম রসুলের চিৎকার শোনা যায়। পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেছে। চারদিকে আলো জ্বলছে। কুকুর ডাকছে।

ছুটতে ছুটতে ভোরবেলায় মা'র কাছে এসে পড়ে নাজিয়া। মায়ের কোলে মাথা রাখার পর অজ্ঞান হয়ে যায়। মুখে পাঁজরে তার কাটাকুটি দাগ, কাপড়ে রক্ত। চোখ ফুলে ঢেকে গেছে।

বড় ভাই বলল, 'শালাকে জবাই করে ফেলব!'

বাপ বলল, 'এই তো মুসলমানদের জীবন! তালাক নিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই!'

জ্ঞান ফেরার পর কিছুটা সুস্থ হলে নাজিয়াও জানাল যে সে তালাক নেবে—অমন স্বামীতে তার দরকার নেই, তার চেয়ে একজন চাষাও ভাল। রাখালটা জব্দ হোক বাচ্চাদুটোকে নিয়ে।

কিন্তু ভাবনা তো মায়ের বুক-সমান। গহরটা কেঁদে কেঁদে মাকে খুঁজবে। যদি পুকুরে পড়ে যায়? আগুনে পুড়ে মরে? ছোট মেয়েটাকে কে দুধ খাওয়াবে?

নাজিয়ার মা বলে, 'ও যা জামাই, হয়তো বাচ্চা দুটোকে আছড়ে মেরে ফেলবে। ওর জানে দয়ামায়া নেই। ওর বাপ ছিল খাণ্ডাৎ লোক। একই রক্তের রক্ত!'

কদম রসুল বাচ্চা দুটোকে নিয়ে পড়ল বিপদে। গহরটা তাড়া খেলে

আরও কাঁদে। ভয়ে মুখে হাত চাপা দেয়।

কেবল বলে, 'আমার মা কই ?'

'তোর মা মরেছে—চুপ কর বেটা।'

কচি বাচ্চাটা ককায়। চাচাত বোনটা এসে আবার ঝিনুক পোয়ায়। কালো মোটা চেহারার মেয়ে, দেখতে খারাপ, পণের টাকা দিতে না পারার জন্যে বহু জায়গা থেকে বিয়ের কথা উঠলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি।

এক রাত্রে আহারাদির পর বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে শুলে চাচাত বোন রমিশা খাতুনকে ঘরে শুতে বলে কদম রসুল। ঝড়বাদলের রাত। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মায়ের জন্যে কাঁদছে গহরটা। তাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে এসে তক্তাপোষে নিজের কাছে শোয়ায় কদম রসুল। দেখল ছেলেটার গা গরম, জ্বর উঠেছে। মেয়েটারও নাকি গায়ে জ্বর।

কিন্তু একই ঘরের মধ্যে শোবে কেমন করে রমিশা খাতুন। পাড়ার মেয়েরা তার বদনাম দেবে। এমনিতেই তাই বলছে তুই মোল্লাজীর বউ হয়ে যা।

পরদিন হঠাৎ পুলিস এসে হাজির।

নাজিয়ার বড়ভাই পুলিস তুলে এনেছে। নাজিয়ার নাকি মরমর অবস্থা। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে যাবে তার মামারা।

পুলিস ধরে নিয়ে গেল কদম রসুলকে। লোকে ছি-ছি করতে লাগল। বউ হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে পুলিস তুলল? আর স্বামীর ঘরে আসতে হবে না?

পুলিস দুদিন হাজতঘরে বন্দী করে রাখার পরে ছেড়ে দিল কদম রসুলকে, দুশো টাকা দিতে হল। বাড়িতে ফিরে একাই বসে রইল কদম রসুল। লোকজন আর কেউ আসে না। রমিশাও আসে না—তার নাকি শরীর খারাপ।

নিজেই রান্না করে আর খায় রসুল। মসজিদে যায় নামাজ পড়তে। ঘরে বসে পবিত্র কোরআন হাদিস পড়ে।

মাসখানেক পরে একটা ভিখারী মেয়ের হাত দিয়ে একটা চিঠি এল নাজিয়ার। পড়ে দেখল কদম রসুল। নাজিয়া তার ভুল স্বীকার করেছে। স্বামীকে মারার জন্য শতবার ক্ষমা চেয়েছে। তাকে নিয়ে আসতে বলেছে।

চিঠিটাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল কদম রসুল। তার শালা তাকে পুলিস তুলে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে দুদিন হাজত খাটাল। দুশো টাকা ঘুষ দিতে হল। ঐ মেয়েমানুষটার জন্যে মানইজ্জত গেল।

নাজিয়ার চোখ দুটো মনে পড়ে।

গহর আলির ভাঙা-ভাঙা কথা, তার মায়াভরানড়াচড়া মনকে পাগল করে। কচি বাচ্চাটার হাসিতেও কত মায়া!

চুলোয় যাক সব।

কিন্তু নাজিয়া ছাড়া কেন কোনো কাজেই উদ্যম নেই! ইচ্ছা নেই কিছু করার!

প্রতিদিন সে ভাবে আজ নাজিয়া আসবে কিন্তু আসে না। সে শ্বশুর-বাড়ি যেতে চাইলেও মন পরক্ষণেই বিদ্রোহী হয়ে উঠে বাগড়া দেয়।

একদিন তার সাগরেদ আলি হোসেন বলল, 'মোল্লাজী, তুমি মেয়েমানুষকে নিয়ে অত ভেবো না। ওরা বাবা আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড়ে তৈরী। তুমি আবার বিয়ে কর।'

'মেয়েমানুষকে?'

'সব মেয়েমানুষ একরকম নয়।'

'সবাই তো বাবা আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড়।'

'আমি একটা মেয়ে দেখেছি, দু-হাজার টাকা দেবে নগদ, থালা ঘটি, সাইকেল, আংটি, ঘড়ি দেবে। রাজি থাক তো মেয়ে দেখে আসবে চল।'

টাকা আর নতুন যুবতী মেয়ের লোভে মেয়ে দেখতে গেল কদম রসুল তার মুখভরা দাড়ি আর সুন্নতি পোষাক নিয়ে। মেয়ে পছন্দ হলেও সে কিছু মন্তব্য করল না।

নাজিয়া যেন তার মাথার ওপরে খাঁড়া তুলে আছে!

নাজিয়া সুন্দরী, ভীষণ সত্যবাদী। কিন্তু সংসারে সত্যকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলা কি সহজ ব্যাপার?

ভাবতে ভাবতে আরও একমাস গেল। থৈ-থৈ বর্ষা চারদিকে। আনাজ-ফসল ডুবে গেল, চালের দাম বাড়ল। নাজিয়ার বাবার একার ভরসায় সংসার। মাস্টারির টাকা আসে না। সংসারে অভাব। ভাইগুলো কাজ না পেয়ে জুয়া-তাস পিটে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত নাজিয়া ঠিক করল সে বাচ্চা দুটোকে মায়ের কাছে রেখে চুড়ি বিক্রি করতে বেরুবে পাড়ায় পাড়ায়, কিন্তু ভাবনা হয় স্বামী যদি আবার তাকে নেয়?

একদিন সংবাদ এল কদম রসুল বিয়ে করেছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসল নাজিয়া।

নাজিয়ার দুই ভাই গিয়ে পাড়ার লোকদের ডেকে নিয়ে কদম রসুলের সঙ্গে দেখা করে নাজিয়ার তালাক চাইল।

কদম রসুল জানাল, 'আমি তালাক দেব না, পার তো তোমরা কোরট থেকে তালাক লও যেয়ে—আমি এ্যাকসেপট করব।'

বড়ভাই বলল, 'তার মানে তুমি তালাক দিলে দেন মোহর দিতে হবে, আমরা কেস করলে বাচ্চা দুটোর না-সাবালক-হওয়া পর্যন্ত খোরাকী দিতে হবে এই তো? আমরা কোন কিছুই দাবি করব না, তুমি দয়া করে তালাক দাও।'

কদম রসুল রাজি হল না।

দুই ভাই জানিয়ে এল, 'আমাদের ক্ষমতা থাকে তো তোমাকে পথ থেকে

ধরে বেঁধে এনে পিটতে পিটতে তোমার জিন-ভূত ছাড়িয়ে তালাক নিতে পারি কিনা দেখিয়ে দোব।'

কদম রসুল দিব্যি হাসিমুখে শরিয়তের ফরমান জানাল, 'জোরপূর্বক তালাক আদায় শরিয়তে বৈধ নয়।'

বড়ভাই বলল, 'বিনা কারণে স্ত্রীকে গরুর মত প্রহার করা বুঝি শরিয়তে বৈধ ব্যাপার মোল্লাজী ?'

কদম রসুল বলল, 'বিনা মেঘে আকাশ ডাকে না। তোমার বোন জানে সে কত বড় পাপী—কতখানি অসতী!'

'নাজিয়া অসতী তুমি একথা বললে ? তুমি না বল, মড়া মালসা গিলেছে, মড়ার গাল কত বড় আর মালসা কত বড় ? তুমি না কবরের মড়ার গালে চামচ দিয়ে কাফন ঠেসে দাও, জাফরানের রঙ মাখিয়ে বল, মড়া কাফন গিলেছে। মানুষ মারা গেলে তার গায়ে রক্ত থাকে, না তার কোন ক্ষমতা থাকে ? মিথ্যেবাদী! কবরের ভেতরে ডাব নারকেল লুকিয়ে রেখে অন্য জায়গা দিয়ে ফুটো করে দম ফেলে তুমি তিনদিন দিনরাত তপস্যা করে ভেলকি দেখাও! এসব কি ইসলামে বৈধ ? তুমি নিজেই একটা ভূত, একটা জিন! তোমার মুখে থুথু দিই! থু-থু-থু .....'

চুড়ি বিক্রি করতে করতে বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন পথের মাঝখানে খেজুরকুঞ্জের ছায়ায় দেখা হয়ে গেল নাজিয়ার তার স্বামী কদম রসুলের সঙ্গে। ফকিরী বেশ কালো পীরহান। হাতে বাঁকা লতার লাঠি। গলায় তসবিহ দানার মালা। মাথায় পাগড়ি। লোকটা আড়াআড়িভাবে মাঠের পথ ভেঙে আসছিল। কাঠফাটা রোদ। পাকা খেজুর খেতে ব্যস্ত শালিকের দল কলহ জুড়েছে মাথার ওপরে।

নাজিয়া ক্লান্ত, বিষণ্ণ। স্বামীকে সে দূর থেকে চিনতে পারল। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। ভাবল সে উঠে চলে যাবে। নিশ্চয়ই ও এখানের ছায়ার তলায় এসে দু-দণ্ড দাঁড়াবে। কিন্তু নাজিয়ার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়ে কোন অদৃশ্য শক্তি যেন বেঁধে রাখল। স্বামী কাছে এসে পড়লে সে চুড়ির চ্যাঙারীতে হাত রেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

কদম রসুল দাঁড়াল। ঝাড়নে ঘাম মুছতে লাগল। আপন মনেই বলল, 'উঃ, কী রোদ! বেরুবার সময় যদি ছাতাটা দিত!'

'কেন, নতুন বউ মনের মত হয়নি ?' মনে মনে বলল নাজিয়া।

'এত রোদে তুমি কোথা যাবে গো, কে তুমি, নাজিয়া না ? কী আশ্চর্য, তুমি চুড়ি বিক্রি কর!' বলল কদম রসুল কাছে বসে পড়ে।

চ্যাঙারী নিয়ে উঠে পড়তে গেলে হাত দিয়ে চেপে বসিয়ে দেয় কদম রসুল, বলে, 'থাম থাম বিবি, চলে যেও না, মনের ভেতর কত কথা আছে।'

'আমার কোন কথা নেই, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না।'

'আলবৎ! এখনো তুমি আমার বিবি।' হাত চেপে ধরে বলল কদম

রসুল, 'শালা বিয়ে করে জ্বলে মরছি। নোংরা মূর্খ মেয়ে। গালাগালি করে, মুখখিস্তি পাড়ে। লোকজন এলে ভাগিয়ে দেয়। দুটো মেয়ে বিইয়ে ঢাঁড় গাই হয়ে গেছে।'

অনেক গুণের কথা, অনেক দুঃখের কথা শোনার পর নাজিয়ার দু-গাল বেয়ে চোখের জল নামতে লাগল।

কদম রসুল বলে, 'আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো নাজিয়া, তুমি ঘরে চলো, শালার বেটিকে ঝাঁটা মেরে তায়গির করি।'

'না, তা আর হয় না।'

'কেন হয় না?'

'আমি বাজারে বেরিয়েছি।'

'তা হোক, তুমি আমার লক্ষ্মী ছিলে। তুমি না থাকলে আমার কিছুই হবে না। ভুল করে আমি আবার সাদি করে ফেলেছি।'

'আমি গেলে কি তুমি তোমার নতুন বউকে তালাক দিয়ে দেবে?'

'অবশ্যই।'

'মেয়ে কি তোমাদের খেয়াল-খুশীর ব্যাপার? তাদের জীবনের দাম নেই?'

কদম রসুল কিছু উত্তর দিতে পারে না।

নাজিয়া উঠে পড়ল। চ্যাঙারী কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠে নেমে চলতে আরম্ভ করল। আপনমনে বলতে লাগল, 'আমার ছেলে বড় হয়ে উঠছে, তাকে তো মানুষ করতে হবে—নাকি সেও তার বাপের মতন ধর্মের নামে মিথ্যে ভণ্ড আর একজন কামেল পীর হবে?'

কদম রসুল বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার স্ত্রী চলে যাচ্ছে এই কাঠফাটা রোদ্দুরে মাঠ পার হয়ে দূরের গ্রামের দিকে। সে তাকে বলে গেল 'মিথ্যে ভণ্ড কামেল পীর'! লতার লাঠিটা হাতে নিয়ে সেও এবার চলতে থাকল অন্যদিকে। তার চোখে কেন যে এতদিন পরে এত জল এসে দাড়ি ভিজিয়ে দিতে লাগল সে জানে না। দূরে স্ত্রীর চেহারা অদৃশ্য হয়ে যেতেই মনে পড়ল তার ছেলেটার কথা। তার চোখ দুটো শুধু মনে পড়ে যায়। তাতেও বিষম জিজ্ঞাসা, বাবা, তুমি এমন কেন?

ঠক্কর খেতে খেতে দুর্বল শরীরে পাগলের মত চলতে চলতে একসময় কদম রসুল আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। চারিদিকে যেন ধোঁয়া। পথটা কেমন ট্যারা-বাঁকা হয়ে গেছে।

সে ভাবল, ফিরে গিয়েই নাজিয়াকে তালাক দেবার ব্যবস্থা নেবে—তাকে আর ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই।

মেঘমালা দাদু

আশি বছরের হাড় পাকা বুড়ো, মাথায় টোপর, কোমরে রঙিন গামছা, পায়ে নুপুর পরে মফঃস্বল শহরের ছোটখাটো কোম্পানির সুগন্ধি তেল বিক্রি করেন হাটের দিনে। দাদুর চারপাশে ভিড় লেগে যায়। গ্রামের মেয়েরা হাঁস-মুরগি-ডিম বা আনাজ বিক্রি করার পর ঘরে ফেরার সময় দাদুর 'বাসতেল' কেনে। একশো গ্রাম তেলের দাম চার টাকা আশি পয়সা। নারকেল তেলের সমান দাম। বাড়তি পাওনা সুন্দর শিশিটা। সবুজাভ রঙ তেলের। মেয়েরা অনেকেই প্রশংসা করে। একদম চুল ওঠে না। রাতে ভাল ঘুম হয়।

দাদু নাচতে নাচতে ছড়া কেটে গান করেন ঃ

'মেঘমালা তেলের বড় গুণ
চুল করে মেঘের মতন
ঘুম হবে মাথাধরা যাবে
হাতে হাতে ফল আজই পাবে।'

মেচেদা, পাঁশকুড়া, কাঁকটিয়া, তমলুক, নন্দকুমার, শ্রীরামপুর, ময়না, নরঘাট, কাঁথি, জুনপুট সব জায়গার হাটে-বাজারে 'মেঘমালা' তেল বিক্রি করা কালো মাঝারি চেহারার দাড়িগোঁফশূন্য ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটাকে সবাই চেনে। এত বয়সেও দাদু এমন সঙ সেজে পরিশ্রম করছেন কেন একথা শুধোলে দাদু নিজের কপাল দেখান। বলেন, 'আমার পঞ্চাশ হাজারের ওপর টাকা পাওনা হয়ে কলকাতার ফ্রিডম ফাইটার অফিসে পড়ে আছে। কত বড় বড় নেতার সার্টিফিকেট সমেত ভগবানপুর থানার এই শর্মা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের ছবি জমা আছে। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে কত বছর বাড়ি থেকে পালিয়ে, ঘর-সংসার হাজিয়ে লড়াই করেছি। নিকুঞ্জ মাইতির হুকুমে রাতারাতি পথ বেঁধেছি, পুকুর কেটেছি। বন্যাত্রাণের জন্য খয়রাতি সাহায্য সংগ্রহ করে নানা এলাকার দুর্গত মানুষের সেবা করে ফিরেছি। ঘর-সংসার চুলোয় গেছে। গরিবের মড়া সংকার হচ্ছে না—লোকের পায়ে হাতে ধরে চাঁদা তুলে হরিবোল দিয়ে কাঁধে খাটুলি নিয়ে গিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে দেবার পর রূপনারায়ণে নেমেছি—হঠাৎ শুনি গোরাদের সঙ্গে দেশী লাল-পাগড়ি পুলিশ এসেছে—বন্দুকের ফায়ার হতে থাকলে ডুব মারলাম। সাঁতরে আমরা একেবারে উত্তর নাউপালায় উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে এক চাষীবাড়ি গোয়ালের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রাণ বাঁচালাম। বিশ সাল থেকে চল্লিশ সাল—

বিশ বছর লড়াই করেছি। হয়রান করেছি ইংরেজ শাসকদের। থানা ঘেরাও করেছি। গুলি চলেছে। পুলিশ তেড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে হরদম পিটেছে। মার খেয়ে বনে-বাদাড়ে বসে মশার কামড়ে রাত কেটেছে। চোদ্দটা জোঁক ধরেছে হাতে-পায়ে-গায়ে-কপালে-কানে। পাগলা সেজে বাড়িতে ঢুকলে ফরসা সুন্দরী বউ আঁৎকে উঠে চিৎকার করতে গেছে। কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে গোয়ালঘরের মাচায়। বউও উঠে এসে মই তুলে নিয়ে কোথায় কখন থাকি, কি খাই, কেন দেশের মুক্তির জন্য এমন পাগলামি করছি, বাবার মুদি-দোকানে কেন বসছি না, গঞ্জে গেলে লোক থাকে না, ছেলেমেয়েরা তাদের বাপকে দেখতে পায় না, বাপকে জানে পলাতক, পুলিশ পেছনে পেছনে ঘুরছে, কখন তারা এসে তম্বি করবে তার ঠিক নেই—এসব কথা বলতে থাকে।

জগদীশ ভট্টাচার্য একবার পুরনো দিনের কথা বলতে গেলে তাঁর বাসতেল বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। সঙ সেজে রঙ-ঢঙ না দেখালে এ দেশের রসপিপাসু মানুষের ট্যাঁকের পয়সায় হাত ফেলতে আবার মায়া লাগে।

একশো শিশি তেল বেচলে তবে পঁচিশ টাকা পাওনা হয়। কিন্তু গাড়িভাড়া? রোদে পুড়ে জলে ভিজে হাটে বাজারে ঘুরে ঘুরে গরিবের কাছে দিনে পঞ্চাশ টাকার তেল বিক্রি করা কি সোজা! আর বয়সটা যখন আশি! ৮ সালে জন্ম আর এখন ৮৮। স্বাধীনতা এসেছে ৪০ বছর। চোখে দেখা কত নেতা মন্ত্রী হলেন। কত মানুষের বাড়ি-গাড়ি হল। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের তিরিশ বছর সুখের রাজ্যপাট ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়ল নিজেদের মধ্যে কলহ-কাজিয়াতে। ফ্রন্ট সরকার এসেছে দশ বছর হয়ে গেল। তবুও ফ্রিডম ফাইটাররা অনেকেই অর্ধাহারে অনাহারে মাটিতে মুখ রগড়াতে রগড়াতে মারা গেছেন। আজো কেউ কেউ বয়সের ভারে ধুঁকছেন। ছেলেরা বাবার তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে যখন দুঃখে-কষ্টে মানুষ হয়ে চাকরি বাকরি করছে তখন তাদের বউ ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ চালিয়ে উদ্বৃত্ত বুড়ো বাবাকে টানার মত বাজার কি সদাশয় সরকার রেখেছে? বাবা যাদের মন্ত্রী সেক্রেটারি লাট ম্যাজিস্ট্রেট করার জন্যে নির্বোধের মত জীবন আর সংসার নষ্ট করেছে, তাদের কাছে গিয়ে চল্লিশ বছর ধরে ধুলো ঝাড়ুক। বাঁশবনের কানা ভূতের কাহিনী শুনিয়ে কোন লাভ আছে?

আজকের যুগের ছেলেরা কেমন করে বিশ্বাস করবে এদেশে ইংরেজ সাহেবরা শাসক ছিল? আর যারা হাওড়া ব্রিজের মত অত বড় বিস্ময়কর জিনিস তৈরি করতে পেরেছিল তাদের তাড়িয়ে এদেশের সাধারণ লোকদের হাতে দেশটাকে তুলে দিলে কেন? তাঁরা নিজেদের আখের গুছোতে ব্যস্ত থাকবেন, না কোন গাঁগঞ্জে পড়ে থাকা বুড়োহাবড়াদের খোরাক-পোশাকের ব্যবস্থা করতে গিয়ে অমূল্য সময় ব্যয় করবেন?

ভগবানপুর থানার বাড়ি ছেড়ে জগদীশ ভট্টাচার্য তমলুক শহরের এক বস্তির মুসলিম বাড়িতে একটা ঘরভাড়া নিয়ে আছেন। বারোদিন মাত্র সংসার

করা স্বামী ছাড়া এক গরিব বামুনের মেয়েকে রাঁধাবাড়ার জন্যে বাসায় রেখে বাসতেল বিক্রির ঝোলা ভ্যানে তুলে নিয়ে এসে সঙ সেজে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ান।

পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ এক শিক্ষক অবাক হয়ে শুধোন, 'হাঁটুতে বাৎ ধরেনি আপনার?'

জগদীশবাবু বললেন, 'পাকা হাড়—রোগটোগ আমার তেমনা কিছু নেই। কুড়ি বছর মাঠেঘাটে দৌড়ে বেড়ালে কি আর রোগ থাকে? তবে মাথাটা ঘোরে রোদে বেশিক্ষণ ঘুরলে আর বকমবাজি করলে। রাত্রে শুলে আর হুঁস থাকে না।'

সমাজে যাঁরা একটু প্রভাবশালী মানুষ তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলে জগদীশবাবু বলেন, 'আপনি যদি ফ্রিডম ফাইটার অফিসে গিয়ে আমার ধামা চাপা পড়া কেসটা কংগ্রেসের কর্তাদের ধরে উদ্ধার করতে পারেন তাহলে টেন পারসেন্ট আপনাকে দিয়ে দেব। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি পেয়ে যাব। স্যাংশানড হয়ে পড়ে আছে। মরার পর পেলে তো ভূতে খাবে!...

অনেকে অনেক আশ্বাস দেন। চাকন্দ গাছের ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে সেই পুরনো কালের চিরনতুন চাঁদটা ঝিলিমিলি জোছনা ঢেলে খেলা করে। জানালার পথে তাকিয়ে থেকে বহুদিনের বহু চিন্তা পুতুলনাচের মত ঘুরে ফিরে নেচে নেচে অন্ধকারে সরে যায়। রূপনারায়ণে তখন স্টীমার চলত—সাহেবদের লঞ্চ ছুটে যেত, এখন চড়া পড়ে গেছে। বন্যা আসে মানুষের ঘর ভাসায়—চর জাগে—মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়ে তবু বালি উদ্ধার করা যায় না।

তক্তাপোষের পাশেই মেঝের বিছানায় পড়ে অলকা নিশ্চিন্ত আরামে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকে।

নতুন বউ হয়ে এসে রমলাও এমনি করে ঘুমোত। যতক্ষণ কাছে থাকতেন ঘাম হলে মুছে দিতেন, মশা বা ছারপোকা কামড়ালে মেরে দিতেন। এই লক্ষ্মীর মত বউকে আদরযত্ন করে দেখার মত সুযোগ তাঁর হয়নি। দু-তিন মাস ছাড়া লুকিয়ে একবার এসেই আবার আঁধার থাকতে থাকতেই মাঠ পার হয়ে পালিয়ে যেতেন। ছেলেমেয়ে হত, দাদু মানুষ করতেন। অন্নপ্রাশন, বিয়ে হল ছেলেমেয়েদের, তিনি তখন নেই।

অবশ্য স্বাধীনতার পর তাঁর কোলে মাথা রেখেই রমলা মারা গেছে। তাকে দাহ করে এসেছেন। জীবনটা কিরকম ভাবে যেন ছায়াছবির মত মিলিয়ে যায়।

কখন ঘুমিয়ে যান, ভোররাতে তক্তাপোষে দোল লাগতে থাকলে ঘুম ভেঙে যায়। অলকা তার তক্তাপোষটাকে নাড়া দিচ্ছে নাকি? আরে যা! ভূমিকম্প হচ্ছে যে! উঠে পড়ে শাঁখ বাজাবার কথা বলতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে অলকার গায়ে পড়ে যান। অলকা হাঁউমাউ করে ওঠে। ওর শরীরে এখন ভরাযৌবন। স্বামীটা একেবারে মাতাল পাগল। আবার বিয়ে করেছে।

অলকা উঠে পড়ে মুসলমান বাড়িতেই শাঁখে ফুঁ দিতে থাকে। পৃথিবী তখন কাঁপছে। দোল খাচ্ছে। শাড়ি কাপড় দুলছে। কারখানার আলো পড়া পুকুরের জল চলাক চলাক করছে। বাড়িওলা ডাক্তার রহিম উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানেন। ফরসা সুদর্শন পুরুষ। এককালে মঞ্চে অভিনয় করতেন ইংরেজ সাহেবের ভূমিকায়। দুর্দান্ত বদমাস চরিত্র। নায়িকার শাড়ির আঁচল ধরে টানতে থাকলে দর্শকরা 'মারো শালাকে' বলে কাঁড় ডাব পর্যন্ত ছুঁড়ে মেরেছিল। এটা যে অভিনয় তা ভুলে যেত।

জগদীশ ভট্টাচার্য এই বাড়ির জেঠু এখন বাচ্চাদের। দেয়ালে দেবী দশভুজার ছবি। শাঁখ বাজালে পুজো করলে আপত্তি নেই। ধর্মীয় সংস্কার-মুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বউ ছেলেমেয়েরা। ঋণ করে বাড়ি বেঁধে এখন দেনায় পাগল ডাক্তার। বন্ধক আছে বাড়ি। কয়েকবার নোটিশ এসেছে বাড়ি খালি করে দেবার। এবার ক্রোক হবে নাকি। হয় হোক। এই ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাক সবকিছু।

কিন্তু জগদীশ ভট্টাচার্য গীতার স্তোত্র পাঠ করতে থাকেন। ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত নাকি তিনি সন্তানের পিতা হবার ক্ষমতা রাখতেন। এখনো তাঁর মজ্জায় যা বল আছে, অলকা এক বিছানায় থেকে পদসেবা করলে হয়তো একটা আশ্রয় মিলে যেত কিন্তু সে এই বুড়োর ভাসমান ভেলায় চড়তে নারাজ।

তাছাড়া অন্তরঙ্গ কেউ দ্বিতীয় গিন্নির মর্যাদা অলকাকে দেবার কথা জানিয়ে সাহস দিলে তিনি বলেন, 'দূর হও! মেয়েদের বিশ্বাস নাই। টিউকলে পাড়ার সবাই রোজ ওরা মিটিং করে। এই আশি বচ্ছর বয়সে মানকুল খোয়াব? শুনুন তবে গল্প। এক চাষী বড় অভাবী। কিন্তু তার বউ রোজ গয়নার কথা বলে। গয়না না পেলে স্বামীকে কি করে মনভরে ভক্তি করবে? শয্যাতেও তার সুখ নেই। পুকুরঘাটের ওপারের বউরা কত গয়না পরে। চাষীটি বউয়ের মন পাবার জন্যে একদিন রক্তভেজা একটা বস্তার বোঝা আনল সন্ধ্যার একটু পরে। আর এক থলি টাকা। বললে, একদম কাউকে বলবে না। মানুষ খুন করে টাকা লুটে এনেছি। তোমার মনের সাধ মিটিয়ে গা-ভরা গয়না করে দোব। লাসভরা বস্তাটা উঠোনে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলল চাষের কাজে গতর খাটানো লোকটি। গয়নার থলে ঝনঝনিয়ে কুলঙ্গিতে তুলে রাখল। বউ সেদিন যেন স্বর্গের ফুলশয্যায় দেবতা ইন্দ্রকে সঙ্গদান করল। ভোরবেলায় সই এল ঘাটে। বললে, জানো সই, আমাদের আর দুঃখ থাকবে না।

কেন?

মাথার দিব্যি, বলবে না! আমার 'উনি' মানুষ খুন করে অনেক টাকা লুটে এনেছে। লাসটা উঠোনে পোঁতা আছে। এবার আমার গয়না হয়ে যাবে। তুমি যেন কাউকে বলো না ভাই।

মা কালীর দিব্যি।

কিন্তু সইয়ের সামনে পড়ল চৌকিদারের বউ। সে তাকে গোপনে পেটের কথা বলল আর দিব্যি গালাল। তারপর চৌকিদার শুনল। সে থানার বড়বাবুকে সবিনয়ে জানাল। খুন? ছুটল পুলিশ। চাষীকে ধরল। সে বললে, হ্যাঁ হুজুর, ঘটনা সত্য। উঠোন খুঁড়ে লাস তুলল। বস্তা খুলতে দেখা গেল একটা কুকুরকে কুঁচোনো। কী ব্যাপার? আর টাকার থলে? তাও আনলে। খুলে দেখালে সবই চাকতি।

রহস্যটা কি? চাষী বললে, বুঝে নাও, মেয়েমানুষ কি জিনিস। যদি ঘটনাটা সত্য হত, আমার কি রকম ব্যবস্থা হত!'

কাজেই জগদীশবাবুর মতো হাড়পাকা বুড়ো বামুনের ভাগ্যহারা মেয়ে অলকার সুখের কথা ভাবতে গিয়ে উদারপ্রাণ হতে গিয়ে জুতোর মালা পরবেন এই বয়সে? গালিবের কবিতায় আছেঃ মেয়েটা যতখানি রূপসী, তার অর্ধেক যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে ভিক্ষে করে বেড়াতে হত না। কিন্তু অলকার যে তার সিকিও বুদ্ধি নেই। নইলে ঐ ভুঁইশয্যা হয়? হোকগে।

তাই অলকা রান্না করে দিলে দুটো খেয়ে নিয়ে বাসতেলের শিশির জন্যে কুড়ি মাইল দূরের কারখানায় চলে যান জগদীশ ভট্টাচার্য। বিকালে কাঁকটিয়ায় হাট। মেলা বসে যেন। পানের আড়তদার, ফড়ে, চাষী সবাই নেয় তার 'মেঘমালা' সুগন্ধি তেল।

সরকারের দায়িত্বশীল লোকেরা স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগ করতে প্রাণপণ ব্যস্ত থাকলেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে কি বিবেক বস্তুটা চলে গেছে? বামুন-ঠাকুর-চাকর-ঝি-অনাথদের দেখতে হয় না? তেমনি এই সঙ-সাজা ফ্রিডম ফাইটার জগদীশ ভট্টাচার্যও।

কথায় কথায় জ্ঞান উপদেশের ছড়া কেটে কবিতা শোনাতে পারেন, হয়তো বিদ্যে কম বলে ভুলভাল একটু হয় কিন্তু ভগবানপুর থানায় ভগবানের মতো তিনিই তো একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে সবাই চেনেন অথচ করার কিছু নেই।

ফ্রিডম ফাইটার অফিসের ভগবানরা যদি হাফাহাফি নেন, তাহলেও রাজী জগদীশবাবু কিন্তু পুরোটাই ঘুমন্ত মহাদেবের পিঠের তলায় পড়ে থাকে, তবে আর ব্রাহ্মণ হয়েও পেটের ভাতের জন্য সঙ সেজে না নেচে উপায় কি?

তালে তালে ঘুঙুর বাজিয়ে কোমর দোলানির লাস্যমেদুর ভঙ্গি দেখে মেয়েরা বুড়োর গায়ে 'দূর হও বুড়ো' বলে উল্লাসে যেন ভেঙে পড়তে চায়। বুড়োর চোখেও তেমনি পাকা কাঁটালের গন্ধ পেয়ে পাগলা হওয়া শিয়ালের মতো লোলুপ মেদুর চাউনি।

'দাও বুড়ো, একশিশি তেল দাও। আমার স্বামীর টাকে এত করে তোমার 'মেঘমালা' তেল ঘষি, কই চুল তো গজায় না বুড়ো!'

জগদীশবাবু বলেন, 'হবে হবে। যত্ন নাও। ঘষো—আরো ঘষো। হঠাৎ ফরফর করে গোটা মাথায় যদি কালো মেঘের মতো চুল গজায় একরাত্রেই, তবে তোমার স্বামীকে তো আর তুমি চিনতে পারবে না। অন্য কোনো রসিক যুবতী ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাবে। অতএব ধীরে, বান্ধবী ধীরে।'

এমন রগড়ের মানুষ জগদীশ ভট্টাচার্য হঠাৎ একদিন নাচতে নাচতে থুবড়ে বসে পড়ে মুখ দিয়ে গাঁজা তুলতে লাগলেন।

বয়সটা যে তাঁর আশি বছর। মাথায় সারা দুপুরের রোদ লেগেছে। ৪০ বছরের 'স্বাধীনতা' আর ৮০ বছরের 'ফ্রিডম ফাইটার'—কোন্ দিক থেকে কার সম্মান বাঁচানো যায় ?

মরলে কে কাঁদবে 'মেঘমালা দাদু'র জন্যে ? অলকা ? বাসার ঠিকে-ঝি ?

ভারত সরকারের নেতা-মন্ত্রীদেরও তো সেই একই অবস্থা। আজ আছেন কাল নেই। সবাই যেন তারা ঠিকে-ঝি।

অতএব মাথায় জল চাপড়ে যারা আবার জগদীশ ভট্টাচার্যকে বাঁচিয়ে সুস্থির করে তোলে, তারা যে কি অকাজটা করেছে যদি বুঝতে পারত, তাহলে এইসব 'বাতিল পুরোনো জঞ্জাল' পথে আর সমাজে এত বেশি জমত না।

কিন্তু জগদীশবাবু কি তাঁর ঠাকুরদার মতোই একশো পাঁচ বছর বাঁচবেন ? তাহলে ?

জগদীশ ভট্টাচার্য ঘুঙুর বাজিয়ে তাই নাচতে নাচতে গাইতে থাকেন :

তেল দিয়ে দিয়ে মরে গেলাম
তবু মন ভিজল না—
চলো গোসাঁই এবারে যাই
খুঁজি মরার আস্তানা।

কেউটে নিয়ে খেলা

'সাপুড়ে গোফুর আলির বউ শহরবানু বিবির কল্লায় বড্ড তেজ। সিনা ফুলিয়ে কালকেউটের মত ফোঁসফোঁসায়।'

'বিষ নাই, কুলোপানা চক্কর !'

বেলাভর পাশাপাশি দুই বাড়িতে খিস্তিখেউড়ের ঘূর্ণিঝড় থামার পর স্বামীর হুজুরে ক্ষোভ জানাচ্ছিল শহরবানুর চাচাতো ছোট জা লালবানু বিবি। স্বামী ভ্যান চালিয়ে হাসপাতালের মড়া বয়ে এসে এক ছিলিম গাঁজা টানার পর সাফকথা জানিয়ে দিয়েছে : 'বিষ নাই, কুলোপানা চক্কর !'

'উজ্‌ড়ি' ধুয়ে এনে সেদ্ধ করে ঝিনুক দিয়ে কুরে কুরে সাফ করে বঁটিতে বুটি বুটি করে কেটে আচ্ছাসে পিঁয়াজ রসুন গরম মশলা দিয়ে রান্না করছিল শহরবানু। তার চারটে মেয়েকে নিয়ে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে তালে তালে গাল দিতে দিতে পেছিয়ে এসেছে আবার এগিয়ে গেছে। লালবানুর বাহিনীও তালে তাল বাজিয়ে উরু চাপড়ে দোয়ারকি গেয়ে গালিগালাজ দিতে দিতে এগিয়ে

এসেছে আবার পেছিয়ে গেছে। কোমর ভেঙে দুলে দুলে তারা ছড়ার মত ছন্দ কেটে কেটে গাল দেয়। ঝগড়া শুনতে এসেছে গোটা পাড়ার বউ-ঝিউড়িরা। হাটুরে পথের লোকরাও দাঁড়িয়ে যায়। দুপুরে বা সন্ধ্যায় কর্তারা বাড়ি ফিরলে ঝোড়া চাপা দিয়ে রাখে—কর্তারা কাজে বেরিয়ে গেলে সকালে ঝোড়া তুলে যেখান থেকে যে ব্যাখ্যান গাওনা কি চলছিল শুরু করা হয় আবার।

গফুর মিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সাপের ঝাঁপি নামিয়ে রাখার পর ফতুয়ার পকেট উল্টে খুচরো পয়সাগুলো গুনে গুনে দাবায় থাক দিয়ে বসিয়ে রাখে লম্ফর সামনে। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি ধরায়। সারাদিন দূরের গ্রাম-গঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভেঁপু বাজিয়ে সাপ-খেলা দেখিয়ে মাত্র পনেরো টাকা পঁচাত্তর পয়সা কামিয়েছে আজ। কুড়ি টাকার বেশি হয় না কোনদিন। কিন্তু বুড়ো মা, চার মেয়ে, দুই ছেলে আর দুই মেয়ে-মদ্দ নিয়ে নয়জন প্রাণীর সংসার বাঁচবে কেমন করে? চারদিকে কত দেনা। মুদিঅলা আর ধারে বাজার দেয় না। বাপের আমলের মেটে-দোতলা বাড়ির টালির ছাউনি এত খারাপ অবস্থায় আছে যে তার ওপর ওঠাই দায়। যে-কোন অবস্থায় হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে। একটু বেশি ঝড় হলে টালি খুলে পড়তে থাকে। যেখানে পড়ে যায় সেখানে আর লাগানো যায় না। দু-কামরা ঘরের কাঠামো পাল্টাতে পঞ্চাশখানার বেশি বাঁশ লাগবে। হাজার টাকা দাম। ঘরের ঐ দশা—আর বউটা? গুণ্ডি-পান-খাওয়া তেঁতুলবীজের মতো দাঁত। তাও দু-চারটে ফোগলা হয়ে গেছে। শুকনো ঠোঁট। কোটরে ঢোকা চোখ। বুক তক্তার মত পাটা হয়ে গেছে।

চার মেয়ের দুজনকে এখুনি বিদায় করা দরকার। বড়টার লাবণ্যতা চলে যাচ্ছে। মেচেতা দাগ পড়েছে দুই গণ্ডের ওপরে।

ঘরটা, বউটা আর বড় মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যা। চার গেলাস তাড়ি খেতে গেলেই দু'টাকা দাম। খেলে তবু ঐ বিয়াল্লিশের শহরবানুতেই ধুতরো ফুল ফুটে যায়। তেল-নুনের পয়সাটা তাই গেলেও খেদ থাকে না শহরবানুর। মাতাল স্বামীকে সামলাতে সে তখন ঘুমিয়ে জাগা বড় মেয়েটার দীর্ঘশ্বাস শুনেও কিছু করার থাকে না। আঙুল টিপে ইসারা করে সাপুড়ে স্বামীকে। শঙ্খলাগা শঙ্খিনীর সঙ্গে তবুও গফুর মিয়া দাঁড়াসের মত যেন পাকে পাকে বেড় খায়।

লাল চা আর একমুঠো চালভাজা এনে বসিয়ে দিয়ে শহরবানু কাছে বসে বলে, 'দয়া করে তুমি মদ্দ যেন আবার 'চাসতো' ভাইয়ের কাছে 'গ্যাঁজা' ঢুকুতে যেউনি। মানডাঁটায় লঙ্কাবাটা মেখিয়ে বেশ করে হুড়োছি। তোমার সাধের লালবানু গো! আপন শালী! সৎবুন না হলে এমন করে কাঁচা খিস্তি দেয়? জ্যান্ত খরিশ। ওকে লিয়ে এবেরে বাজারে বেরোও না। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বাহারী চক্কর মেলে লালবানু খুব খেলা দেখাবে। তাবেজ-কবজ করে মদ্দটাকেও তো ভেড়ুয়া করে রেখেছে। আনো একদিন পদ্ম-গোখরো ধরে, ঝাঁপি খুলে ছেড়ে দিয়ে আসব দুই মিনসে মাগীর মাঝখানে।'

গফুর মিয়া বলে, 'তোমাদের শালা নরক গুলজার সব সময়! কী খাও যে এত তেজ রাখো ঝগড়ার সময়?'

'তাই বলে পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করবে? ওদের বক্রি মোদের গাছ খেলে ছোট ছেলেটা দু'ঘা মেরেছে, তাই বলে হাসপাতাল থেকে বাঁজা হয়ে আসা গতরঅলী তোমার শালী আসমান কড়কাড়িয়ে খিস্তি করবে?'

তাড়ির পয়সা নাই কুলুক, হাঁড়ি থেকে একবাটি 'উজড়ি' (উদর, উদরি, উজরি-নাড়ীভুড়ি) রান্না নিয়ে শালীর বাড়ি দরবার করতে আসে গফুর মিয়া।

খানিকটা তোয়াজ তোষামোদ করার পর শালী কাছে আসে। তার বরও। ফিসফিসিয়ে তারা যখন সব কথা বলে, শহরবানুর মেয়েরা পাঁচিলের গায়ে গা লাগিয়ে অন্ধকার থেকে সব শোনে। ট্যাঁকের লুকোনো টাকা হাতে গুঁজে দিলে গাঁজার নেশায় উদার হওয়া চাচাতো ভায়ের ওপরের ভায়রাভাই চলে যায় তাড়ি আনতে।

টিপটিপের বাতিটা আরো ছোট করে দেয় লালবানু। কাঠের ব্যবসায় বড়লোক হওয়া পাশের পাকাবাড়ি থেকে রেডিওর বাজনা এমন জোরে বাজে যে গফুর মিয়া আর লালবানুর সংলাপ কিছুই শোনা যায় না।

পুরো নেশা নিয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরলে শহররানু 'গজরাতে' (গর্জন) থাকে: 'এলে কেন আবার, রাতটুকু থাকতে পারলে নে? কেন, 'বিছানা'তে বুঝি জায়গা কুলোয়নি? সরে যাও—সরে যাও তুমি! আর সোহাগ দেখাতে হবে না!'

চাঁদ উঠছে তখন। ঠ্যাং তুলে তুলে নাচ দেখাতে আর মিষ্টিমধুর হাসিতে চোখ উল্টেপাল্টে গান ধরে দেয় গফুর মিয়া:

> পরাণ সখি লো—
> তোর তরে মুই আনব কিনে ঢোল,
> ঢোলের তালে ঢ্যাম কুড় কুড়
> ঢ্যাম কুড় কুড়—করবি গণ্ডগোল!

গফুর নাচতে পারে ভাল। গাইতেও ওস্তাদ। অনেককাল সুর-মাস্টারি করেছে ঢপওলী নাচানো কবিদলে। তার গান শুনে ছোট ছেলেটা বিছানা থেকে উঠে পড়ে হাঁড়ি বাজাতে থাকে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসে।

শহরবানু আধো রাগে আধো লজ্জায় তির্যক চোখে স্বামীর অবুঝ আমোদ উপভোগ করে।

ঝগড়ার ঝোড়া সট্ মেরে উড়িয়ে দেয় হাসপাতালের মড়া-বওয়া-ভ্যানঅলা চাস্‌তোভাই আহাদ আলি। তার বউ লালবানুও এসে দাঁড়ায় ধানশূন্য সাবেককালের গোলাটার পাশে। চাঁদের আলো পড়েছে চাঁদের মতো গোলাকার লালবানুর মুখে। শহরবানু সেদিকে বিষনজরে তাকিয়ে থাকলে

কি হবে, গফুর মিয়া তার কাছে এগিয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে গান গায় :

দুলিয়ে কোমর লাচবি যখন
গাঙের দু-কূল ভাঙবে তখন
আড়ে আড়ে তাকাস কেন
দিদি তোর ঘোমটাখানা খোল ॥

মানুষের মন গলাতে ওস্তাদ গফুর মিয়া। পাৎলাটে, লম্বা চেহারা। মুখে খন্ডতয়ের মতো ফুচকে সাদা একটুখানি দাড়ি। গোঁফজোড়া কালো। মাথায় বাবরি চুল। সে ক্যারিকেচার করতে পারে। দোলা থেকে পড়ে যাওয়া কচি বাচ্চার কান্না এমন কাঁদে যে মায়েরা ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বলে, দূর হ, বুড়োটা যেন ঢং!

ছাগল, গাধা, শিয়াল, কুকুর ডাকে। টেম্পু, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শোনায়। ঢোলের বাজনার বুলি আর শব্দ অদ্ভুতভাবে নকল করেছে। তার চারদিকে লোক জমা হয়ে যায়। তারপর সে ঝাঁপি খুলে সুন্দর ফণা বিস্তারকারী পদ্মগোখরো বার করার পর নেউল ছেড়ে দেয়। দুটো প্রাণীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। সাপটা যেই ছোবল হানতে যায়, নেউল লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই ঘুরে এসে আবার লাফ দিয়ে ল্যাজে তীক্ষ্ম ধারালো নখ মেরে ল্যাজের কড়া-চারেক অংশ কেটে নেয়। সেই কাটা অংশটা নেউল নিয়ে পালাতে গেলে সাপটা হঠাৎ তাকে তিনপাকে জড়িয়ে ফেলে। দুটিতেই জোর আক্রোশে ফোঁ ফোঁ করে। সাপ ভাঁজে ভাঁজে চাপ দিতে থাকলে নেউলটা চিৎকার করতে থাকে।

একসময় তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপিতে পুরে রেখে গফুর মিয়া বলে, 'এবার আমি বার করছি উদয়নাগ। যার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে এই পিথিমি। যে সাপের ফণায় পা রেখে শ্রীকৃষ্ণ পার হয়ে যান মহাসমুদ্র। ফণা বিস্তার করে যে পুণ্যবান সর্পরাজ শ্রীকৃষ্ণর শরীরে সূর্যের রোদ আড়াল করে থাকে। যে সাপ শিবঠাকুরের গলায় দোলে। মা-মাসিমারা পয়সা বা দর্শনী না দিয়ে এই সাপ দেখবে না কেউ। অমঙ্গল হবে। পেটে যার ময়না-সোনা থাকবে, অন্ধ হয়ে যাবে—যদি না দর্শনী দাও। যদি পয়সা না থাকে সরে যাও। আয় বাবা, উদয়নাগ, বেরিয়ে আয়। এর মাথায় নাকি সিঁদুরের ফোঁটা আছে। শীতের রোদে ফণা মেলে দোল খায়। একদম বাজে কথা। এ শালার তেমন কিছু বাহার নেই। কালচে দাঁড়াসের মতই দেখতে। কেউটে হলেই তার ফণা থাকবে। কোন বোড়ারই ফণা থাকে না। উদয়নাগের মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা বা নক্সা আদৌ নেই। বাবুরা উদয়নাগ চেনে না। এর এত নাম কেন? দেখ কেমন থির হয়ে ফণা বিস্তার করে ভেঁপুর বাজনা শোনে।'

ভেঁপু বাজাতে থাকলে সাপটা সুন্দর ফণা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এক দৃষ্টিতে সাপুড়ের রঙিন ভেঁপুটাকে দেখে। ভেঁপুর বাজনা থামলেই ফণা বুজিয়ে নেমে পড়ে শনশন করে একদিকে পালাতে যায়। ধরে তাকে

তুলে রাখে গফুর মিয়া। তারপর বলে, 'এই সাপটা ছিল এক বিলের ধারে। গর্তের মধ্যে। বর্ষার জল নাবলে মাছ খেতে বেরুত। গর্তের মধ্যে জাত-সাপ থাকলে আমরা তার গন্ধ পাই। গর্তের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কান পাতলে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। গরম হয়ে থাকে হাওয়া। তখন একটা তিজেল হাঁড়ি যোগাড় করে গর্তের ভেতরে পানসিউলি ডাল ঢুকিয়ে দিয়ে পাক দিলে সাপের গায়ে সুড়সুড়ি লাগে। সে ভয়ে মুখ লুকোয়। তখন হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বার করে আনি। এনেই ল্যাজ ধরে মাথাটা বাড়ি দিয়ে চেপে ধরি। তারপর মুখ চ্যালা করে দু-পাশের বিষের থলি কেটে নিই। এই বিষ শিশিতে রাখি। বিক্রি হয়। বিষদাঁত ভেঙে দিই। বিষদাঁত ফাঁপা। ইনজেকশনের ছুঁচের পানা। যখন ছোবল হানে, বিষের থলিতে চাপ পড়লেই ঐ বিষদাঁতের ভেতর দিয়ে ফিনকি মেরে বিষ ছিটকে পড়ে। দাঁতে কাটা জায়গায় লাগলেই রক্তের সঙ্গে বিষে জ্বালা ধরায়। শত্রু নিপাত হয়ে যায়। সাপ খুব ভীতু জীব। টুক্ করে যদি একটু আঘাত দেয় মেরুদণ্ডের গাঁট কেটে যায়। তখন আর হাঁটতে পারে না। তাই আগে-ভাগেই চোট করে শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। বোড়া খলসাপ। লুকিয়ে থেকে ছোবল হানে। কেউটে কিন্তু ফোঁ করে শব্দ তুলে যতক্ষণ না ফণা বিস্তার করে দোল খায়, বড় একটা চোট করে না! কেউটে কামড়ালে রোগী বলবে, জ্বলে গেল,—পুড়ে গেল। বোড়া কামড়ালে বলবে, বরফ চাপানোর মতো কনকন করছে।

'তেঁতুলে খরিশ, ব্যানাফুলী কেউটে, গেঁড়িভাঙা কেউটে বা করাতে, আর এইটা কালকেউটে। এর পেটটা চকচকে শ্যামা কালীর রং। গা কালো। ফণার খুব বাহার। এদের সাপার গোঁফ মতো হয়। তার নিঃশ্বাসে ঘাস পর্যন্ত জ্বলে যায় বলে শোনা যায়—তবে আমি কখনো দেখিনি।'

সাপখেলা শেষ হলে সখির নাচ দেখিয়ে ছড়াগান গেয়ে ছেলেমেয়েদের হাসিয়ে তান-তুবড়ি গুছিয়ে নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে অন্যত্র চলে যায় গফুর মিয়া। সঙ্গে যায় তার যোল বছরের বড় ছেলে কাদের আলি, সাপের ঝাঁপি সাজানো বাঁক বয়ে। কাঁধে তার কড়া পড়ে গেছে। দুপুর-রোদে মাঠ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত পথ পার হয়ে যায়। খিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত কাদের আলি বলে, 'বাজী গো, মোর বড্ড 'ভোগ' (ভুখ) লেগেছে!'

গফুর মিয়া বলে, 'ইস্টিশনে চ—রোজগার করি, তখন মুড়ি আলুর চপ কিনে খাব দুজনে। চপ খেলে সহজে হজম হবে নে। খিদেও পাবে নে।'

'আমার জ্বর হয় পরের দিন—চপ খেলেই। খুব অম্বল হয়।'

'গরিবের 'প্যাট' রে বাবা, পাথর খেয়ে হজম না করতে পারলে দুধ, সন্দেশ, মালাই, মধু পাবি কোথা? যাদের মোরা ভোট দিয়ে রাজা-উজির বানাই তারা ঐসব খায়।......'

সেদিন বাড়িতে ফেরার সময় প্রচণ্ডরকম ঝড় ওঠে। মাঠের মাঝখানে তখন তারা। ঝড়ে তাদের বাপ-বেটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে। কুড়ি

পঁচিশ হাত দূরে ফেলে দেয়। ঝাঁপি পড়ে গিয়ে খুলে গেলে দুটো কেউটে মাঠের ভেড়ির গর্তের মধ্যে চলে যায়। সেই ঝড়ে গাছপালা উপড়ে পড়ে। তবুও ছুটতে থাকে বাপ-বেটায়। তাদের ঘর পড়ে গেছে আজ নির্ঘাত।

এসে যখন দেখল ঘর ঠিক খাড়া আছে, কয়েকটি খোলা পড়ে গেছে আর লালবানুর দাবায় আশ্রয় নিয়েছে শহরবানু আর তার ছেলেমেয়েরা—তখন আল্লার শোকর গোজারি করে গফুর মিয়া।

বৃষ্টিতে ভেজা বোনাই গোফুর মিয়ার শরীর গামছা দিয়ে লালবানু মুছিয়ে দিতে থাকলে শহরবানু আজ আর ঈর্ষার আগুনে পোড়ে না। নিজের আঁচল দিয়ে ছেলে কাদের আলির মাথা মুখ মুছিয়ে দেয়। যখন বাড়ির পাশের বিরাট উঁচু নারকেল গাছের মাথায় প্রচন্ড শব্দ তুলে মেদিনী কাঁপিয়ে বাজ পড়ে—দাদা গো বলে বুকে জড়িয়ে ধরে লালবানু গফুর মিয়াকে।

মনের দুঃখ তখন আর চাপতে না পেরে শহরবানু উঠোনভরা জলে নেমে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়িতে চলে যায়।

একাই সেখানে বসে বসে ভাবতে থাকে, তাদের বাড়িটার অবস্থা খারাপ, স্বামীর ব্যাভার খারাপ, তার নিজের শরীর খারাপ—মেয়ে দুটো বিদায় হবে কি করে? আর লালবানু তার চোখের মণি ঠুকরে খাচ্ছে। ওকে নিচে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে গোরের মধ্যে পুঁতে ফেলা দরকার। ওর বরটা বলে, 'লালবানু খারাপ হতেই পারে না। দাদা ওকে খুব ভালবাসে। বুনের মতন দ্যাখে। ওকে যে খারাপ ভাবে সে নিজে খারাপ।'

হঠাৎ শহরবানু দেখল অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঝপঝপ করে উঠোনের জল ভেঙে গফুর মিয়া চলে আসছে। হাঁক দিল, 'ওই শহরী, কই তুই?'

অন্ধকার দাবার কোণ থেকে সাড়া দিল শহরবানু, 'এই যে এখেনে। তোমার সাপের ঝাঁপির ভেতরে।'

'বাজ পড়তেছে, একলা মরতে এয়েছ এখেনে?'

'আমার আর মরণ আছে!' বলল শহরবানু। গফুর মিয়া তাকে আদর করতে থাকলে আজ আর বাধা দেয় না শহরবানু। সে শুধু কাঁদতে থাকে।

শিকার

হাতিকলে কাজ। জলের মতো ঢেউ-তোলা মেশিন। আড়াই হাত চওড়া সাত হাত লম্বা। ভেতরে সব সময় যেন ঢেউ সাঁতরে চলেছে। তার ওপরে গাঁট খোলা পাটের শীষের গোড়ার দিকটা ধরিয়ে দিলে ভেতরের প্যাঁকাটির কুঁচো-আঁশ গুঁড়ো হয়ে বেরিয়ে যাবে। গুঁড়োগুলো পাটের 'ফেঁসো' বা কুঁচি অংশের সঙ্গে উড়তে থাকে।

নাক-মুখ দিয়ে ধুলো-ফেঁসো ঢুকে যায়। কাজ করতে গেলে কতক্ষণই বা আর গামছা দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখা যায়?

হরিপদ গায়েন মিল পত্তনি থেকে হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় হাতিকলে ঢুকেছিল। কত বছর বদলি শ্রমিক ছিল। মাস-কাবারি হাজিরা কার্ডে সই মেরে দিত লাইনবাবু। যে কদিন কাজ হত তার জন্যে লাইন দিয়ে ফি শনিবারে 'হপ্তা' নিত। তখন আট-দশ টাকার হপ্তায় সাতদিন চলে যেত। মা-বাবা, একটা বোন আর একটা ভাইকে নিয়ে ভাত ডাল মাছ খেয়ে বাপের তৈরি মাটির দেয়াল উলুর ছাউনিঘরে দিন কেটে যেত। হপ্তার দিন এক টাকায় চারটে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরত। বাবা বলত, দিন দিন বাজার কী হচ্ছে রে! এক আনায় একটা ইলিশ মাছ কিনেছি আমরা। মাছ না নিলেও জেলের মেয়েরা জোর করে বাড়িতে ঢেলে দিয়ে যেত। মাছ নোনা করে রেখে খাওয়া হত। ইলিশের আঁশটে গন্ধে থালাবাটিতে কিছু খাওয়া যেত না। মাছ ভাজলে গন্ধে গোটা পাড়া মাৎ হয়ে যেত। মুড়ি দিয়ে কত ভাজাইলিশ খেতুম। এখন সেসব দিন গয়ায় গেল।...

দশ বছর বদলি শ্রমিক থাকার পর 'পারমেণ্টো'র কাজ হল। নিজ কাজ। এখন তিরিশ বছরের শ্রমিক। হরিপদর বয়স এখন পঞ্চাশ। দেখায় যেন পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো লোক। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। কেবল কাশে সে। ধুলো-বালি-ফেঁসো ভরা সর্দি ওঠে। হাঁপায় সে ছুটোছুটি করে কাজ করার সময়। ট্রলিতে করে পাটের গাঁট তুলে এনে যারা হাতিকলের সামনে ফেলে দিয়ে যায় তাদের হাতে-পায়ে ধরে, 'আমার মায়ের পেটের সোদর ভাইরা, তোরা এট্টু টেনে গাঁটগুলো মেশিনের কাছে দিয়ে যা।'

তারা কখনো দেয়, কখনো দেয় না। বড় কাঁটা দিয়ে যখন টেনে আনতে হয় তখন তার হাঁপ ধরে। কাশতে থাকে। একদিন রাতকাজের সময় হরিপদর কফের মধ্যে কাঁচা রক্ত উঠেছে। সঙ্গে যে বদলিঅলা ছোকরা মনসুর মণ্ডল কাজ করে সেও দেখলে। পাটের কুঁচো চাপা দিলে হরিপদ। মেশিনের ঝমঝম শব্দ। হরিপদ হাত নেড়ে হতাশা জানায়। অর্থাৎ এবার তার জীবনটা

গেল। এই কাজের এই তো পরিণতি।

তবুও অভ্যাসের বশে কাজ করে যায় হরিপদ। তাকে বসিয়ে দেয় মনসুর। একাই কাজ করে। ভাবে, তারও এইরকম পরিণতি হবে। কিন্তু করার কিছু নেই। বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে আছে। মা বাবা ভাইবোন আছে। কাজ না করলে সংসারের বেকার অসহায় প্রাণীগুলো খাবে কী?

রাত তিনটের ভোঁ বাজে যখন তখন কাশতে কাশতে বসে পড়ে হরিপদ। তারপর শুয়ে পড়ে। মেলা রক্ত তোলে। সরাখানেক হবে। কাঁচা থকথকে রক্ত।

মিল লকআউট হয়ে দশ মাস বন্ধ ছিল। এখন মাসখানেক হল আবার চালু হয়েছে। কোম্পানি দশ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে।

উৎপাদনে ঘাটতি হলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাবার হুমকি দিয়ে রেখেছে মালিক। পচা বাজে মাল আসছে, সুতো টেকসই নয়, বিদেশে সিনথেটিক চলছে, চটের দাম পড়ে গেছে, তাই নতুন মেশিন না আনলে কারখানা চলবে না। নতুন মেশিন এলেই অনেক লোক ছাঁটাই হবে। তারা কী খাবে? ইউনিয়ন বাধা দিচ্ছে। অনেক লড়াই করছে। বোনাসের পার্সেন্ট বাড়াতে গিয়ে মিল বন্ধ হয়ে গেল। টেড ইউনিয়ন সাতটা পার্টির। তাদের নিয়ে শ্রমিক মালিক ত্রিপক্ষ মিটিং হল বিশবার। কত চাঁদা দিচ্ছে শ্রমিক ইউনিয়নকে। তারা নাকি মালিক আর শ্রমিক দুদিক থেকে জোঁকের মতো চুষছে।

হরিপদকে এসব কথা বলে মনসুর। একই মেশিনে কাজ করলেও মনসুর কংগ্রেসী করে। হরিপদ সি পি এম। মনসুরের নেতার লাখটাকার বাড়ি আর বাস লরি টিভি হয়েছে। মালিক তাঁকে মিলের ইঁট, চুন, সুরকি, সিমেন্ট, রঙ সাপ্লাই, কাটা চট বিক্রি—কত কিছুর কণ্ট্রাক্টরি দেয়।

হরিপদরও ট্রেড ইউনিয়ন নেতার চেহারা পোশাক নাকি এখন বাবুদের মতো হয়ে গেছে। পাকা বাড়ি, টিভি হয়েছে। ব্যবসাদারদের মোটরে চড়ে থানায়, পার্টি অফিসে যান। দামী সিগারেট খান। মনসুরের অভিযোগ।

কিন্তু হরিপদর নাক-মুখ দিয়ে ফেঁসো-ধুলো ঢুকে ঢুকে তিরিশ বছরে এখন অ্যাজমা-টিবি হয়ে গিয়ে কাঁচা রক্ত উঠছে জেনেও পার্টির নেতা একবার আড়চোখে দেখে গেলেন না। মিলের হাসপাতালে সে পড়ে থাকে। তার বউ-ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। চোখের জল ফেলতে থাকে। তাদের চারপাশে দুঃখের অন্ধকার ঘিরে আসছে। বাবা মারা গেছে। বুড়ো মাও মারা গেল গত বন্ধের সময় না খেতে পেয়ে রোগ-দুর্দশা নিয়ে। তিনটে ছেলে, তিনটে মেয়ে। বন্ধের সময় জন খেটেছে। কত দেনা মুদিদোকানে। বোনটার বিয়ে দিয়েছিল এক গাড়ির কণ্ডাকটরের সঙ্গে—এমন বরাত সেও গাড়িচাপা পড়ে মারা গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে বোনটা মিলের গেটে মুড়ি বিক্রি করে কাবুলির কাছ থেকে দেনা করে। প্রতিদিন একশো টাকার বিনিময়ে মুড়ি-

ছোলা বিক্রি হলে কাবুলিকে দিতে হয় একশো তিন টাকা। লাভ হয়তো পনেরো টাকা থাকে। 'দিনকাজ' হলে বোন কুসুমের কাছে গেলে সে পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি দিত ছোলাভাজা মিশিয়ে। দাম নিত না।

বোনটার যৌবন রয়ে গেল, ভোগ পেলে না। ওর চেহারা দেখেই তালে মাছি-বসার মতো খদ্দের জুটত। শহুরে লজ্জাখাকিদের মতো নাই বার করে কোঁচা দিয়ে 'ভাবোন' করে কাপড় পরতে দেখে একদিন রেগে যায় হরিপদ। মুড়ি দিতে গায়ের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। সে দেখেছে, মিলের হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে কুসুম। তার সম্বন্ধে কত কথা শুনেছে। ঐ দারোয়ানটাই একদিন ধরে মেরে তাকে হেড অফিসে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। রাত দশটার পর বি-শিফটের কাজ শেষ হলে মিল থেকে বাতিল পাটের দড়ি বিনিয়ে মোবিল তেলে ডুবিয়ে নিংড়ে প্যাণ্টের পকেটের ভেতরে করে নিয়ে যাচ্ছিল। বাইরের অন্ধকার-পথে জেবলে দোলাতে দোলাতে যাবে—নইলে দু-মাইল সরু বনঝোপ-ঘেরা পথে সাপের ভয়—হড়কানো কাদা—তার আলোয় কত শ্রমিক যেত কিন্তু ঐ শিউচরণ সাহু—মিল-মালিকের শ্রমিক ঠেঙানো দালাল—তাকে ধরে এমন দুটো ঘুঁষি কষালে পাঁজরে-কোলে যে চোখ ধোঁয়া হয়ে গেল! বড়বাবু এক হপ্তা কাজ বসিয়ে দিলে।

সেই শিউচরণের সঙ্গে তার বোন কুসুম ফষ্টিনষ্টি করে? ছই-ঘেরা দোকানের ভেতরে বসে মোচে তা দেয়, খইনি ডলে আর তাগড়াই চেহারা নাচিয়ে হা-হা করে হাসে।

হাসপাতালে পড়ে পড়ে ভাবে হরিপদ। ক-দিন বেঘোরে কেটেছে। নাকে নল দেওয়া ছিল। এখন তার জ্ঞান হয়েছে। লাল কম্বল চাপা শরীর। ভাল বিছানা। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। কত রোগীর পেট কেটেছে। হরদম ইঞ্জেকশন ফুঁড়ছে। চটকলের লোকদের বেশিরভাগই 'গ্যাসট্রাইটিস' রোগী! রাত জেগে বেশি চা, কাঁচা-জলের হালুসে-গন্ধ রুটি, ঝাল তরকারি, তাড়ি আর ধেনো মদ খেয়ে খেয়ে পেটে গ্যাস জমে। পুরোনো আমাশা রোগ আছে। দুধ পায় না এক চামচও। যা হপ্তা পায় চাল-আটা-আনাজ কিনতেই ফুরিয়ে যায়।

হরিপদর বউ নির্মলা এসে বসে থাকে। কাঁদে। ছেলেমেয়েরা কী খাবে? দুধ-ডিম-মাংস-মধু-ফল গরিবদের কাছে স্বপ্নের ব্যাপার!

কাশতে থাকে হরিপদ। রক্তভরা সর্দি ওঠে। সর্দির সঙ্গে গুলি গুলি তাল তাল পাটের কুঁচো আর ধুলো। যতবার কাশে ততবার ওঠে। তিরিশ বছর ধরে ঢুকে ঢুকে যেন রাশীকৃত হয়ে জমে আছে। না মরা পর্যন্ত উঠতেই থাকবে।

দুটো আপেল নিয়ে কুসুম একদিন এল। তার হাতে ধরল হরিপদ। বললে, 'কুসুম, তুই আমার মায়ের পেটের বোন। তুই এ সময়টা যদি একটু না দেখিস আমার বাচ্চাগুলো না খেয়ে মারা যাবে। ডাক্তারি ছুটির রোজ

আমি পাব। টাকা তুললে তোকে দোব। এখন শতখানেক টাকা যেমন করে পারিস যোগাড় করে দে।'

কুসুম বলে, 'কোত্থেকে দোব দাদা। আমারই কত দেনা। ওসমান কাবুলি আজ দেয়, কাল নেয়। দেখি যদি গোটা পঞ্চাশ যোগাড় করতে পারি। ভাইটা তো দেখতেও এল না!'

হরিপদ বললে, 'ঐ ভাইকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলাম। তাঁতের কাজের জন্যে দেনা করে ঘুষ দিয়েছিলাম। বিয়ে দিলাম। বউয়ের কথায় ওঠে বসে। বেড়া দিয়ে 'বাকুল' ঘিরে নিয়েছে। পুকুরের মাছের বখরা নিয়ে ঝগড়া হতে ভাই আমার মাথায় লাঠি মারতে ছুটে এল। যাকগে—সে ভাল আছে, ভাল খাচ্ছে, থাক গে।......'

দু-মাস হাসপাতালে পড়ে আছে হরিপদ গায়েন অথচ পার্টির নেতা ত্রিনাথ ঘোষাল একদিনও তাকে দেখতে এলেন না। কতদিন পার্টি-অফিসের চা, জল, মুড়ি-তেলেভাজা বয়েছে হরিপদ। ময়লা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া খাকি হাফশার্ট গায়ে পার্টির অনুগত লোকটিকে আজ ঘোষালবাবু ভুলে গেলেন সাতরকম কাজের চাপে। কাজের সময় 'হরিপদ কোথায় গেল? পঞ্চাশটা কাঁচা বাঁশের লাঠি দরকার'—কাস্তে-হাতুড়ি-তারা-মার্কা পতাকা পরিয়ে নিয়ে কাঁধে করে বীর বিক্রমে সবাই মিছিল করে যেতে হবে। নিজের ঝাড় থেকে তড়পি বাঁশের লাঠি কেটে ভ্যানে করে বয়ে এনে দিয়েছিল হরিপদ। দাম নেয়নি। বাহবা দিয়েছিলেন ঘোষালবাবু। বলেছিলেন, 'এই হরিপদর মতো মানুষরাই হল দলের একনিষ্ঠ কর্মী। এরাই হল পার্টির বনিয়াদ। যার ওপর শক্ত পার্টি-ইমারত খাড়া হয়ে আছে।'

ইউনিয়ন অফিসের মধ্যেকার সব শ্রমিক কমরেড ভাইরাই তাকে দেখেছে। গর্বে বুক ফুলে উঠত হরিপদর। মনে হত সংসার ভেসে যায় যাক, পার্টির জন্যে জীবন দিতে সে সবসময় তৈরি। সে কতদিন লেই তৈরি করে কত হাজার পোস্টার মেরেছে কত দেয়ালে রাতভর জেগে। ভোটের সময় তো রাত-দিন জ্ঞান থাকত না। বোধহয় পঞ্চাশ হাজার মাইল সে মিছিলের পথ হেঁটেছে বিশ বছরে। কতদিনের কত মারামারি, পালিয়ে লুকিয়ে থাকা। ধর্মঘট করার সময় কংগ্রেসীরা পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের বেধড়ক পিটিয়েছে অমানুষ পশুর মতন উল্লাসে। একবার এমনি সাতদিন হাসপাতালে পড়েছিল হরিপদ। তখন ঘোষালবাবুরা দেখতে যেতেন। ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে পার্টির কাগজে ছেপেছিলেন। আর আজ পার্টির হাতে ক্ষমতা এসেছে। যেসব শোষক অসামাজিক পেটমোটা শুয়োরদের বিরুদ্ধে লড়াই—যাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলার কথা ছিল—তাদের সঙ্গেই এখন বেশি দহরম-মহরম। তাদের মতোই খেয়ে-পরে মোটরে চড়ে সুখ-ভোগে ব্যস্ত। এটা কি ঠিক? অথচ পার্টির নিজস্ব কোনো হাসপাতাল নেই। কী খাওয়াচ্ছে এরা? ভাতে কত গম ধান-কাঁকর। পাতলা ডাল। পঁচিশ গ্রাম মাংসের একটা টুকরো আর ঝোল। রাত্রে কোয়ার্টার পাউন্ড

রুটি আর এক গেলাস জলো দুধ। সকালে গ্যাসে পাকানো দুটো সিঙ্গাপুরী কলা, একটা ডিম আর এক কাপ চা। দুপুরে বেশি ভাত চাইলেও দেয় না 'পানিপাঁড়ে'।

হরিপদ কতজনের দ্বারা খবর দিয়েছে ঘোষালবাবুর কাছে, কেউ বললে না? একবারও এলেন না ঘোষালবাবু? অভিমানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের সবুজ গ্রাম জনপদের দিকে তাকিয়ে নীরবে কাঁদতে থাকে হরিপদ। ঐ দূরের গ্রামে তার বাড়ি।

তার বড় ছেলেটা বাজে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মস্তান মার্কা হয়ে গেছে। তার জন্যে মিলে কাজের লেগে কতজনেরই না পায়ে ধরেছে কিন্তু সবখানেই 'নো ভ্যাকান্সি'। পার্টি-টিকিট পায় নতুন লোক লাগাবার সময়। যারা কাজ পায় তারা নাকি পার্টি-তহবিলে দান করে রেখেছে। জন্মের পর থেকে লাইন দিয়ে পার্টিতে খাটছে। বলে, 'হবে, পরে হবে। তবে তোমার ছেলেটার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনি।......'

ছেলে আদিনাথের সঙ্গে কতদিন কত ঝগড়া বচসা হয়েছে। সে বলে, 'আমি পার্টির নেতার চামচে হতে পারব না—তুমি যেমন ঘোষালবাবুর বাজারহাট বয়ে বেড়াও......'

এখন আদিনাথ এসে বলে, 'কই, তোমার কাছে কোন নেতা এসেছে? গলায় আঠার ভাঁড় বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটো না গিয়ে! তোমার এই রোগ হল কেন? কোম্পানি কি তোমার সংসার দেখছে? সস্তায় গরিব মানুষের রক্ত নিংড়ে নিয়ে কারখানা চালিয়ে মুনাফা লুটে বিদেশের ব্যাঙ্ক লাল করছে!'

হরিপদ খেঁকিয়ে ওঠে, 'বেরো হারামজাদ, তুই কী বুঝিস? কতটুকু লেখাপড়া জানিস? ২৩ বছর বয়স হয়ে গেল, মাসে দশটা টাকা রোজগার করতে শিখলি না! জনখাটতেও তো পারিস? খালি আড্ডা আর মস্তানি! পার্টির কাজ করলে তোকে কাজ দিত। আমার মরণ হলে বুঝবি কত ধানে কত চাল!'

চার মাস পরে মিলের হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলে হরিপদ। দশটা ছবি উঠেছে তার বুকের। তাকে আর যত্ন করে দেখত না। কেবল নাকি 'ডাইজিন' বড়ি দিত। পেটের রোগের 'তিকিজ্জে' হচ্ছিল। অখাদ্য কুখাদ্য গিলে পাকস্থলী গরম হবার পর ফুসফুসে সর্দি জমে ব্রংকো-নিমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন সব সেরে গেছে। মিলের ধুলো ফেঁসোগুঁড়ো উড়ে নাক-মুখ দিয়ে ঢুকে যে ফুসফুস খারাপ করে ফেলেছে একথা নাকি ডাক্তারদের পক্ষে লেখা কঠিন। ব্রেন, হার্ট, লান্স খারাপ হলে বেশি টাকা যায় কোম্পানির। ডাক্তার এসব রিপোর্ট লিখলে হাসপাতালের চাকরি যাবে। তাই ব্রংকো-নিউমোনিয়া—আর সব বাঙালির পেটের রোগ তো তার চোদ্দপুরুষ আগে থেকে আছেই!

জীবনে কখনো এক খুরি মদ খায়নি হরিপদ, তবুও ডাক্তার দাস তাকে

কত দাবড়ি মেরেছেন, 'মদ খাওনি বললেই হল? পেটে গ্যাস জম্মায় কী করে? নইলে লান্সে এত সর্দি জমবে কেন? তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে কোম্পানির টাকা ঝেড়ে মেয়ের বিয়ে দিতে কিম্বা জমি কিনতে চাও?'

বাবু লোকদের কতরকম কথার 'ফেতরাজি'! মরলে মরুক বাড়িতে, হাসপাতালে নয়। তাহলে অনেক খেসারত দিতে হবে। ডাক্তারদেরও বদনাম।

একটু সুস্থ-মতো হয়ে আবার কাজে লাগে হরিপদ।

হপ্তাখানেক পরে আবার তার হাঁপানী রোগ বেড়ে উঠল। আবার কাশির রোগ। শিয়ালের পেছনে তেড়ে আসা কুকুরের মতো হাঁপায় পাটের গাঁট টেনে আনার পর। কাশতে কাশতে রক্ত তোলে। কাঁচা রক্তের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে।

লাইনবাবু বলে, 'তোমার সার্ভিস তুলে নাও হরিপদ। আর খাটা-খাটুনি করতে পারবে না।'

হাসপাতালে আবার ভর্তি হল হরিপদ।

আবার একটু সেরে উঠতে একদিন বউ নির্মলা সংবাদ আনলে তাদের বড়ছেলে আদিনাথ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে হরদম মার খেয়ে পুলিশ হাজতে আছে। থানায় গিয়ে বড়বাবুর পায়ে ধরতেও ছাড়ান পায়নি আদিনাথ। সে নাকি বাড়িঅলাকে বেঁধে ছুরি দিয়ে হাত-পা চিরে দিয়েছিল। কী খুনী ডাকু ছেলেরে বাবা! এরকম কেন হল? মোটেই কথার বাধ্য নয়!

হরিপদ বলে, 'অমন ছেলেকে কেন পেটে ধরেছিলে? চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। ছেলে তোমার জেলখানায় পচে মরুক। ওসব ছেলেকে বাইরে রাখলে মানুষের অমঙ্গল ঘটাবে। হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে ডাকাত মস্তান হয়ে গেছে।'

হরিপদ এবার একটানা ছ-মাস হাসপাতালের শয্যায় 'অগত্যার মড়া' হয়ে পড়ে থাকে। ডাক্তাররা তাকে 'এলে' দিয়েছেন। খারাপ টি বি, জণ্ডিস, অ্যাজমা রোগী বলে বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা বেডে আশ্রয় করে দিয়েছেন। চিকিৎসা হয় কেবল অম্বল-রোগী বলে। ওষুধপত্র নাকি নেই। 'শ্রমিকদের ডাক্তারি টাকা কাটা হয়'—সেকথা বললে ডাক্তাররা শুধু নীরবে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁদের হাতে টাকা দিলে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যায়। হাসপাতালের ইসিজি মেশিন প্রায়ই বেকল হয়ে পড়ে থাকে। বড় ডাক্তার মানিক ব্যানার্জির চেম্বারে গিয়ে ৫০ টাকা দিলে বুকের ছবি উঠবে। বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হবে। অনেক সময় হরিপদকে খাদ্য পথ্য ওষুধ দিতেও ভুল হয়ে যায়। তখন ভিখারির মতো হাত পাতে হরিপদ। ভিক্ষে করে সে রোগী বা তাদের আত্মীয়দের কাছে। মেয়ে ময়না এসে ডাগর চোখ মেলে রুগ্ন বাপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তার হাতে ভিক্ষালব্ধ পয়সাগুলো দেয়। একদিন সে বলে, 'মা ময়না, একটা গামছা দিয়ে যাবি? মশায় থাকতে পারি না মা। হাসপাতাল থেকে

পালাতেও পারি না। পায়ে বল নেই। হাঁটু ধরে গেছে। দশ পা চললে হাঁপিয়ে উঠি। গামছা এনে দিলে গলায় দড়ি দিতে পারি। তাহলে অনেক টাকা পাবি। তোর বিয়ে হয়ে যাবে। ঘর হবে। জমিও হবে। তোর মামা আদিনাথের জামিন নিতে গেল কেন? ওকে বাঁচিয়ে লাভ কী?'

মেয়ে ময়না আর গামছা এনে দিল না। হরিপদর বউ এখন নাকি কারখানা শ্রমিকদের গরম ভাতের ডিশ মাথায় করে বয়ে আনে। মাথায় গরম উঠে চোখে জল ঝরে। কুড়িটা ডিশ বইলে রোজ পায় চার টাকা।

একদিন আদিনাথ হরিপদকে দেখতে এল। ঘুরে দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকল হরিপদ। ছেলে পকেট থেকে খানিকটা প্লাসটিকের মজবুত দড়ির প্যাকেট বার করে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি যদি আমাদের জন্যে সুখ চাও, আর বেশি টাকা পাইয়ে দিতে চাও—তবে গলায় দড়ি দিও। আমি জেনে দেখেছি, লাখটাকা পাব আমরা। আমার আদালতে ডাক পড়েছে সামনের মাসে।……'

'তুই নজরছাড়া হয়ে যা। তোর মুখ দেখাও পাপ।'

রাগে আর ঘৃণায় মুখের ভঙ্গি কঠোর করে আদিনাথ চলে গেল।

মশার কামড়ে গায়ে ঘা ফুটেছে হরিপদর। রাত্রে 'বেডপান' পায় না শত চিৎকার করেও। নার্সরা ঘুমোয়। নয়তো সিনেমা-পত্রিকা পড়ে অথবা গল্প করে।

বারান্দায় আলো-আঁধার। ভোররাতে চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল কুকুর ডাকে নিচের তলায়। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা টুল আনে হরিপদ।

বাইরে বেশ ঠান্ডা। ক্রমাগত সে এবার কাশতে থাকে। বুকের ভেতর অসহ্য কনকনানি। আর সহ্য করা যায় না।

কোনোক্রমে সে টুলে ওঠে। প্লাসটিকের দড়িটা বাঁধে রেলিংয়ের গায়ে। তারপর একটা ফাঁস তৈরি করে গলায় পরে। কাঁদতে থাকে সে। নির্মলার মুখখানা মনে পড়ে। ময়নার মায়াভরা চোখ দুটো। তারপর আদিনাথের ক্রূর মুখটা। সে মরলে আদিনাথ সব টাকা মেরেপিটে কেড়ে নিয়ে বোম্বের দিকে পালবে হিন্দি সিনেমায় নামবে বলে। তার অনেক দিনের স্বপ্ন।

শালা একটা হারামি—বলে গাল দেয় হরিপদ।

ছোট আরো চারটে বাচ্চার কথা মনে পড়ে হরিপদর। তাছাড়া জীবনেরও বড় মায়া। না না—সে মরতে পারবে না। ডাক্তার দাস বলেছিলেন, 'সমস্ত পাঁজরকাঠি আর ফুসফুস দুটো বদলালে তোমাকে হয়তো বাঁচানো যায়। সে মেলা খরচ। তুমি গরিব লোক—কে তোমাকে অত টাকা দেবে?'

হরিপদ বলেছিল, 'কোম্পানি দেবে না?'

'হ্যাঁ, কোম্পানি তাঁর নিজের ফুসফুস দেবেন। তোমার দাম তো একটা মুর্গির চেয়েও কম। তবু চেষ্টা করে দেখব—একটা ফুসফুস তুলে দিয়ে যদি যান্ত্রিক হাপর বসানো যায়।'

'দেখুন না ডাক্তারবাবু—আপনার পায়ে ধরি……'

আবার সেরে উঠতে পারে হরিপদ। সেরে উঠলে আবার কারখানায় যাবে।

হাতিকলের লোহার জলতরঙ্গ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ধুলো-ফেঁসো উড়ছে। চারদিকে কেমন ধোঁয়াটে অন্ধকার যেন দিনের বেলাতেও। কেমন সোঁদা সোঁদা চিরচেনা একটা গন্ধ। হাঁ করে শ্বাস টানে হরিপদ।

দমকা কাশি ওঠে। রক্ত ওঠে আবার।

যন্ত্রণায় পাগলের মতো গড়াতে গড়াতে আবার বিছানায় আসে। ফাঁসটা তাকে ডাকছে। ভয়ে সে বিছানা মুড়ি দেয়। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে।

সকালে ফাঁসটা দেখে ডাক্তার নার্সরা সবাই জড়ো হলেন। নিচে রক্ত দেখে বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছিল। তাঁরা সবাই যুক্তি করে হরিপদকে অন্য একটা ঘরের মধ্যে এনে তুললেন। সেটা ছিল খালি স্টোর রুম। জানলা বলে কিছু নেই।

ইঞ্জেকশন দিয়ে হরিপদর হাত-পা অবশ করে দেওয়া হল।

সে শুধু এখন চিৎ হয়ে পড়ে থাকে আর টিকটিকি দুটোর খেলা দেখে। তারা হাত পা নেড়ে ছুটে বেড়ায়। সে শক্তিটুকুও নেই হরিপদর। মরতে চায় সে, কিন্তু মরলে তো অনেক টাকা এক্সুনি দিতে হবে কোম্পানিকে! তাকে কি অত সহজে এই গরিব দেশে মরতে দেওয়া যায়?

বাবুজান মিস্ত্রির ঘরসংসার

বাবুজান মিস্ত্রি জানেন না হেন কাজ নেই, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেন তিনি, ঘোড়ায় চড়ে থানায় যান, সাইকেলে চড়ে চোগা-চাপকান-টুপি পরে মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ পড়তেও পারেন উঁচু কণ্ঠস্বর তুলে। সকালে দেখছেন কোদাল নিয়ে জমির আল্ বাঁধছেন কিম্বা পগার ছাঁদছেন তো বিকেলে দেখবেন সিনিয়র হাই মাদ্রাসার মিটিংয়ে বসেছেন, নয়তো সালিশি করছেন কাজীর মতন চুলচেরা যুক্তিতর্ক দিয়ে। তিনি রসিক সুজন, তাঁকে সহজে রাগানো যায় না আর বাগে আনাও কঠিন।

কোনো ছেলে যদি বলে, 'দাদু, আপনি কি পাশ করেছিলেন? আপনার বয়স কত?'

অমনি বাবুজান বলেন, 'দাদু বলেছ যখন তখন আমার সঙ্গে তোমার রক্ত-বীর্যের সম্পর্ক। পাশ দিয়ে কি ভাই মানুষকে মাপা যায়? হজরত মোহম্মদ (দঃ), যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি, নিজামউদ্দিন

আউলিয়া, সেক্সপীয়র, হাফিজ, নানক, রবীন্দ্রনাথ, আকবর বাদশা, শিবাজী, লালন ফকির, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—এঁদের কি পাশের ধজি দিয়ে মাপা যায় ভাই ? আমাকে কেউ কেউ 'পীর সাহেব' বলে পায়ে বোছা দেয়। পীর-দেবতা, কবি-সাহিত্যিক আর মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই, কেননা এঁরা বয়সের সূর্যকে বগলদাবায় পুরে রাখেন।

বাবুজান মিস্ত্রীর উপাধি মিস্ত্রি হল কেন শুধোলে বলেন, 'বছর দশেক আমি হুগলী জেলায় থেকে ঘোড়ারগাড়ির মিস্ত্রির কাজ করতাম—তাই উপাধি। বাবার নাম শের আলি ঘরামি—জীবনে বোধহয় তিনি একটা শেরও দেখেন নি। মানুষের ঘর ছাইতেন আর সুরেলা গলায় পুঁথি পড়তেন। দাদুর নাম ছিল কানাই সেখ। পরদাদুর নাম গহর মাঝি। তাঁর বাবার নাম এলেম সেখ। তাঁর বাবার নাম আর পাওয়া যায় না—হয়তো ধনঞ্জয় গায়েন ছিল, তাই লেখা হয় নি। অধম বাবুজান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—ঘোড়া, বন্দুক, সাইকেল, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, পাকা দালান-কোঠা থাকা সত্ত্বেও নামের আগে এখনো 'সৈয়দ' উপাধি লাগাচ্ছি না।'

বাবুজানকে সবাই মানলেও তাঁর স্ত্রী দোলনী বিবি আদৌ তোয়াক্কা করেন না। প্রতিদিন ভোর না হতেই বাবুজান বিছানা ছেড়ে উঠে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে লাঠি হাতে নিয়ে বর্ষাকাল হলে খালের বাঁধ থেকে ধুনি-আটল-ঝাঁঝরি-মুগুরি তুলতে যাবেন। জ্যান্ত মাছ ছাড়া যত বড়ই মরা মাছ হোক তিনি খাবেন না, তাই মরা মাছ ঝোড়া বা চুবড়িতে রেখে জ্যান্তগুলো পানি দেওয়া ম্যাচলায় ঢেলে রেখে ছাঁকনি জাল চাপা দেন। দরকার হলে পানি পালটে দেন। গোয়ালে গিয়ে গরুর খড়ভুঁষি দেন। তারপর গোসল করে এসে দরওয়াজায় ফজরের নামাজ পড়েন।

বাড়িতে এসে ছেলেমেয়েদের তখনো যদি মুখহাত ধুয়ে পড়তে বসার আয়োজন না দেখেন বকাবকি করেন। দোলনী বিবি ততক্ষণে নামাজ পড়ে নিয়েছেন। পিতলের বালতি আর সরষের তেলের শিশি নিয়ে বাড়ির কাজের লোক রহির মা গাই-বাছুর বার করে দিলে বাবুজান গাই দুইতে বসেন। দুটো দেশী গাইয়ের কেজি তিনেক দুধ হয়। এক পলাও দুধ বেচেন না। লোকজন আসে, চা দিতে হয়। তিনি খান আধ কেজিটাক। তারপর ছেলেমেয়েরা খায়।

একটা ছেলে আছে—সে বারো-তেরোটা ছাগল ভেড়া বাঁধে, সাতটা গরু নেড়ে দেয়, গোয়ালে আনে। খোয়াড়ের হাঁস-মুরগীগুলোকে দেখে। দোকানে যায়। ছেলেটার নাম রুস্তম। তাকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় বাঁধের মাছধরা যন্তরপাতি বসিয়ে দিয়ে আসেন।

একজন হেলো হাল-লাঙল করে। চার-পাঁচটা জন কাজ করে ক্ষেতে-খামারে। আনাজ ফসল চাষ করায় বড়ছেলে আনোয়ারউদ্দিন। বেলা নটা বাজলে সে সাইকেলে চেপে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করতে চলে যায়। মেজো ছেলে আলাউদ্দিন রেলওয়ের পুলিশ বিভাগে কাজ করে—বউ ছেলেমেয়ে

নিয়ে খড়গপুরে থাকে। সেজোছেলে কুতুবউদ্দিন ল পাশ করার পর হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করে—নতুন বিয়ে হয়েছে তার, কলকাতার শ্বশুর-বাড়িতেই থাকে। ছোটছেলে নাসিরউদ্দিন অনেকটা পাগল-প্রকৃতির। খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। দাড়িচুলও কাটে না। তিন মেয়ে।—হাসিনা, মমতাজের বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট জোহরা খাতুন সম্প্রতি স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। আমফাঁকের মতন চোখ তার। দারুণ দেখতে তাকে।

দোলনা বিবি গরম দুধ, পাকাকলা আর মুড়ি দিয়ে গেলে বড় বউমা সন্দেশ দিয়ে গেল।

বাবুজান বললেন, 'নাতিদের দিয়েছ ?'

'তাদের দিয়েছি আব্বা, আপনি খান।'

'কি কি রান্না হবে বলে যাও, বাইরে লোকজন বসে আছে—দেখো, কার উপকারে লাগতে পার।'

বাবুজানের মনে পড়ে গেল গিন্নির বাতের তেলটা এনে দেওয়া হয়নি—তাই মেজাজ ভাল নেই।

'তিনটে বড় বেলেমাছ আছে, ঝাল করবে। নারকেল পিঁয়াজ আদা দিয়ে গলদাচিংড়ির মালাইকারী করবে। আর পায়রা মটরডাল করো। বড়ি-কাঁচকলা-বেগুন দিয়ে শুক্‌তো করতে পারো করবে।'

পাগলাটে নাসিরউদ্দিন বলল, 'জানিস বাবু, রোস্তম বলে পাটশাক ভাজা আর ডাল কদু রান্না পেলে মুই একসের চালের ভাত খেয়ে নিতে পারি।'

বাবুজান বাইরে এসে দেখলেন কয়েকজন লোক বসে আছে। একটি বিধবা মেয়েলোক এসে বলল, 'সালাম ভাইসাহেব, আপনি চিনবেন না, এই কাগজটা পড়লে বুঝতে পারবেন।'

কাগজ মানে মনি অর্ডারের কাটিং। পনেরো বছর আগেকার কোনো এক তারিখের। প্রাপ্তব্যক্তির নাম মীর আশরাফউদ্দিন।

মেয়েলোকটি বলল, 'ওনার অসুখের সময় চিঠি পেয়ে আপনি দুশো পঁচিশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। উনি তো বাঁচলেন না, রেখে গেলেন দশ বছরের একটি ছেলে আর পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। ছেলে আল্‌তাফ বি. টি পাশ করে এখন মাস্টারি করে আর একটা ছোটমত মণিহারী দোকান চালায়। টাকাটা এখন আপনি দয়া করে গ্রহণ করলে আমরা দায়মুক্ত হই।'

চটে গেলেন বাবুজান, 'না না—এ তো আমি নিতে পারি না, আমার সহপাঠী বন্ধুকে তার মরণাপন্ন বিপদে আমি দিয়েছি—সেটা কি ফেরত নিতে পারি ? মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ?'

'জী হাঁ।'

'যান, আপনি ভেতরে যান। দোলনী, দেখো কে এসেছেন—আলাপ করো, আর দুপুরে খাইয়ে-দাইয়ে তবে বিদায় করবে। আপনার ছেলেটিকে আমার কাছে একবার পাঠাবেন তো।'

দোলনী বিবি কালো নরুনপাড় ধবধবে সাদা থান পরা নাঙ্গাহাত

মেয়েটিকে সমাদর করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

'তোমার কি ইসমাইল মাঝি?' শুধোলেন বাবুজান মিস্ত্রী।

'আমরা এই সাতজন দাঁড়ি-মাঝি মুসলমান বলে সরকারী সাহায্য বা জাল-নৌকো পেলুম না বাপজান—আপনি বিচার করে দাও।'

'বাজে কথা বল কেন? একজনও মুসলমান পায় নি কি? তারপর পার্টির ব্যাপার আছে।'

'একশোজন জাল-নৌকো পেয়েছে—তার মধ্যে মাত্তর পাঁচজন মুসলমান জেলে—তাও তাদের অবস্থা খারাপ নয়।'

'ব্যাস ব্যাস—চুপ করো, যে পাঁচজন পেয়েছে তাদেরও বারোটা বাজিয়ে দাও। মুসলমানরা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরা কথা বলে কেন? পরের ক্ষেপে তোমাদের নাম লিস্টিভুক্ত করা যাবে—নামগুলো লিখে দিয়ে যাও।'

নাম লিখে দিয়ে যাবার সময় বাবুজান বললেন, 'সরকারী জাল-নৌকো নিয়ে কেউ কেউ বেচে বন্ধক দিয়ে ফেলেছে শুনছি। তার চেয়ে আমি যদি দশ কি বারোপদী পুরোনো নৌকো কিনে সেরে-সুরে দিই, ঋণ শোধ করতে পারবে? মাসে একশো টাকা করে আদায় দেবে।'

রাজি হয়ে গেল ইসমাইলরা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি, হপ্তাখানেক পরে খোঁজ নিও। কারো পুরোনো নৌকো বিক্রি আছে কিনা খোঁজ নিও।'

আর একজন লোক এসেছে হাজার পাঁচেক টাকা আগাম দিয়ে যেতে। লোকটার আগে ভাত হত না। বাবুজানই তাকে বাকিতে নারকেল-সুপারি দেন। লোকটা বিশ্বাসী। এখন পাট, প্যাঁকাটি, বাঁশ, তালপাতা, নারকেল, সুপারি, মাছ, খড় চায়।

টাকা গুনে নিয়ে বাবুজান বলেন, 'তালেব মিঞা, কেমন চলছে এখন? ভাত হচ্ছে তো?'

'আপনি আমার পীর হুজুর। তিন হাজার টাকার মাল আপনি একটা কানাকড়ি না নিয়ে অধমকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শয়ে আমার কুড়ি টাকা লাভ হয়। এক কিস্তিতে ছশো টাকা লাভ। এখন আমি এই পাঁচ বছরের মধ্যে ধার-বাকিতে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকার ব্যবসা করছি।'

'ইমান ঠিক রাখো, আল্লা সব কাজের হিসাবদার—স্মরণ রেখো। ইমানটাই হল সেই পুলসেয়াতের চুলের সাঁকো। অন্যকে কখনো ঠকাবে না তো বটেই, নিজেকেও না। একটা চিরকুট লিখে দিচ্ছি, রেখে দাও, বলা যায় না, যা দেশের হাল—এক মিনিট পরে কি ঘটবে কোনো নিরাপত্তা নাই এদেশে। খবরকাগজে তো সবকথা ওঠে না—তবু প্রতিদিন ৫০টা করে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটছে। তোমার টাকা আমি মরে গেলে তুমি বেচারা যে ডুবে যাবে! কাগজটা দেখলে মরণের পর নিশ্চয়ই আমার ছেলেরা ঋণশোধ করবে।'

কাগজটা নিয়ে তালেব মিঞা ছিঁড়ে ফেলে দিল! তারপর পায়ে বোছা দিয়ে উঠে বলল, 'আপনার বাক্য আল্লার মতো সত্য। আপনার সেবায়

যদি আমার জীবনও চলে যায়, কুছ পরোয়া নেই।'

'দূর এসব বলতে নেই। সবে পাটকাটা হচ্ছে, এখন টাকা গছালে?'

'পাটের বাজার হু-হু করে উঠছে বাবাজী, দেখুন না আমি কত দাম দিই আপনাকে। আর পানবরোজের জন্যেও প্যাঁকাটির দারুণ চাহিদা। কোথায় সেই বারাসাত, বসিরহাট, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে লরী বোঝাই করে মাল এনে ব্যবসা করছে প্যাঁকাটিগোলার লোকেরা।'

তালেব মিঞা চলে গেলে বস্তা নিয়ে বসে থাকা হিমুর মা দোক্তাপান খাওয়া ছোলার মতো দাঁত বার করে বলল, 'এক বস্তা মোটা মুড়ির ধান নেবো চাচা।'

'মুসলমানদের তোরা 'চাচা' বলিস কেন? চাচা তো হল মায়ের দেওর—মায়ের সঙ্গে যার ফষ্টিনষ্টি করার অধিকার আছে।'

হিমুর মা হ্যা-হ্যা করে হাসে। মুড়ির ব্যবসা করে বিধবা মেয়েটি চারটি মেয়ে পার করেছে, দুটি ছেলেকে মানুষ করে এখন তাদের চটকলের কাজে লাগিয়েছে।

রুস্তমকে গোলা থেকে এক বস্তা মোটা পানকলস ধান পেড়ে দিতে বললেন বাবুজান।

ফকির স্যায়দালি এলে তাকে বসতে বলে বাবুজান ভেতরে এলেন। দোতলায় নিজের ঘরে এসে আলমারী খুলে একটি কোরআন শরীফ বার করে নিয়ে আবার নেমে এলেন। পাগলা নাসিরুদ্দিন বলল, 'বাবু, সেই স্যায়দালি ফকির এয়েচে—কি মজা, কি মজা!'

ছেলেমেয়ের দল জুটল গোটাপাড়া ঝেঁটিয়ে। স্যায়দালি ফকির লাচারি গান করে বিচিত্র সুরে। এককালে সে হাফেজ ছিল। দেনা-দুর্দশা আর পুত্র-শোকে মাথাটা একটু খারাপ হয়ে যায়। মসজিদ থেকে জুতো, টুপি, পাখা, মোমবাতি, শীতলপাটি নিয়ে পালায় বলে তাকে আর কেউ মসজিদে ঢুকতে দেয় না। ও বলে, 'মসজিদের সব জিনিস পবিত্র। আমি ওসব বেচি না—এনে যত্ন করে রেখে দিই, নেকি হবে। আরে বাবা, দুনিয়াতে কত মসজিদ—একটা মসজিদে ঢুকতে দেবে না তো কি হয়েছে! দুনিয়াজোড়া আল্লা রসুলের নামে মসজিদ। আমার কাছে গোটা দুনিয়াটাই মসজিদ।'

বলেই বিচিত্র ভাঙা স্বরে স্যায়দালি দরুদ শরীফ পড়তে থাকে, 'আল্লা হুম্মা সাল্লেয়ালা, সৈয়েদেনা মাওলানা মুহাম্মদ।'

তার সেই উচ্চগ্রামের স্বর শুনে ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়! বাড়ির বউ বা গিন্নিবান্নিরা হাসে দোরগোড়ায় এসে। বহু রঙের কাপড়ের তাপ্পি মারা বাঁকা লাঠি হাতে রং-বেরং-এর কাঁচদানার মালা গলায় সিঙ্গাপুরী লম্বা নারকেলের খোল বগলদাবায় ঝোলানো। স্যায়দালিকে এক রেখ চাল আর পাঁচটা আলু এনে দেয় নাসির পাগলা তার মায়ের হাত থেকে। মালগুলো ঝোলায় হেপাজত করার পর স্যায়দালি কোরআন শরীফখানা মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে কোল পেতে বসে খুলল। তারপর গড়গড় করে পড়ে যেতে লাগল।

বাবুজান মিস্ত্রি বললেন, 'আমার হাতের লেখা—নকল করেছি। এইটা নিয়ে আমি সাতখানা কোরআন শরীফ হাতে নকল করলাম গো ফকির সাহেব।'

স্যায়দালি বলল, 'একেবারে ছাপার মতন। বাদশা আওরঙ্গজেবের হাতের লেখা ছিল এই রকম। গোলাপ ফুলগুলো আঁকা কি সুন্দর হয়েছে তোমার বাবাজী! দোয়া করো বাবা, এই কোরান শরীফ পড়ে আমার ছেলেটা যেন তোমার মতন মানুষ হতে পারে। আল্লা তোমার কবরে বেহেস্তের আলো পৌঁছে দেবে।'

'তুমি যেও না এখন স্যায়দালি মিঞা, দুপুরে আমার গরীবখানায় কিছু খানাপিনা করে যাবে।'

পুরোনো পৈতৃক আমলের মাটির দেওয়ালে খুব যত্ন করে উলুটি করা বৈঠকখানাটি বাংলোবাড়ির মতো হাতখানেক উঁচু করে মোটা উলুর ছাউনি, বেত আর ফুলবাঁখারি দিয়ে ছাওয়া। গরমের সময় এখানে বেশ ঠান্ডা লাগে—তাই পাকাবাড়ির সামনে হলেও পৈতৃক ঐতিহ্যটিকে ভেঙে নষ্ট করতে চান নি বাবুজান মিস্ত্রি। ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর মতবিরোধ। তারা চায় আধুনিক গ্রীল দেওয়া নিওন জ্বলা বিজলী পাখা ঘোরা দামী পর্দা ঝোলানো টেলিভিশন বসানো বৈঠকখানা।

দুপুরে খাওয়ার পর দোলনী বিবি পান নিয়ে একটি শুভ সংবাদ আনলেন। বললেন, 'জোহরাকে দেখে তোমার বন্ধুর বউ—যে টাকা দিতে এসেছে, তার খুব পসন্দ। বলল, এমন একটা মেয়ে আমি খুঁজছি বুবু আমার আলতাফের জন্যে। কত মেয়ে দেখেছি—পসন্দ হয়নি। তা আপনারা বড় ঘর—গণ্যমান্য লোক, আমাদের মতন গরীবঘরে কি এই চাঁদের মতন মেয়ে দেবেন?'

বাবুজান বলে উঠলেন 'দোব দোব—একশো বার দোব। আখ দোব না, গুড় দোব—মাথায় করে বয়ে দোব। ছেলেকে আমি বোধহয় দেখেছি—লাজুক স্বভাবের, চট্ করে সালাম করে সরে যায়। ফরসা, দেখতেও ভাল। লম্বায় জোহরার চেয়ে কিছু উঁচুই হবে। সবচেয়ে ছোট আদরের মেয়ে আমাদের—দোবথোবও আমরা সব। ছেলেটার ব্যবসার হাত যদি ভাল হয় তবে বড় করে দোকান করে দেওয়া যাবে। সেইজন্যেই তো আসতে বলেছি ওঁর ছেলেকে। আর টাকা ফেরত নিই নি।'

এতদিন পরে দোলনী বিবি স্বীকার করলেন, তাঁর স্বামীরত্নটি বেশ বুদ্ধিমান লোক।

বিকালেই ইসমাইল মাঝি এলো ভাল দুটো পুরোনো নৌকো বিক্রি হবার খবর নিয়ে, 'জলধর মাঝির সঙ্গে তার ভাই হলধর মাঝির জোর মামলা বেধে গেছে। কাল মামলার দিন—আজই ছ'হাজার করে বারো হাজার টাকায় নৌকো বেচে ফেলবে। দেরি হলে অন্য মহাজন নিয়ে নিতে পারে। মুরারী মাঝি ইতিমধ্যেই দশ হাজার টাকা দাম দিতে চেয়েছে।'

আলতাফের মাকে আশ্বস্ত করে বিদায় দেবার পর স্যায়দালিকে নিয়ে আসবের নামাজ পড়লেন বাবুজান।

স্যায়দালি বিদায় নিলে দোতলায় নিজের ঘরে এসে আয়রনচেস্ট খুলে বারো হাজার টাকা বার করে ভেতরের জামার পকেটে রাখলেন। চাবি বন্ধ করে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর নেমে এসে রুস্তমকে খালের ঘুনিআটল-গুলো সন্ধ্যার আগে বসাতে বলে আল্লাহর নাম করে বেরিয়ে এলেন। রিক্সায় চড়ে গদাখালি এলেন ইসমাইল মাঝির সঙ্গে। নদীর ধারে স্লুইস গেটের চাতালের ওপরে বসতে বলে ইসমাইল জলধর মাঝিকে ডাকতে গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। হুগলী নদীর ওপরে দূরে দূরে ভাসমান নৌকো-গুলো আবছা হয়ে গেল। গদাখালির ঘাটে যেতে বাঁধের পাশে রাজ্যের বন-জঙ্গল। ইসমাইল আর আসেই না। ভুল করে টর্চও আনেন নি তিনি। এমন নির্জন জায়গায় লেনদেন হবে? একটু ফাঁপড়ে পড়লেন বাবুজান।

হঠাৎ চারজন লোক এসে সালাম জানাল। বলল, 'চলুন মিস্ত্রি সাহেব, নদীর ধারে সেই শ্মশানের পাশে নৌকো আছে। আগে আপনি মাল দেখুন—পছন্দ হলে তবে তো কিনবেন?'

একটা ছোট টর্চ মেরে মেরে চললে লোকগুলো। এরাই সকালে ইসমাইলের সঙ্গে গিয়েছিল তাঁর কাছে।

পলি-কাদার ওপর দিয়ে চলেছেন বাবুজান আর মনে মনে সুরা ইয়াসিন পড়ছেন। নৌকো দুটো দেখলেন তিনি। ভাল নৌকো। বললেন, 'নেওয়া যেতে পারে।'

আবার ফেরতপথে চললেন বাবুজান। শ্মশানের ঝাউগাছটায় ভুতুড়ে হাওয়া সাঁসাঁ করছে। প্যাঁচা ডেকে উঠল হঠাৎ। শিয়াল ডাকতে লাগল গাঙচরে।

হঠাৎ 'বাবাগো মাগো' বলে হুড়োপাটা দৌড়োদৌড়ি লাগাল লোকগুলো। ধাক্কা মেরে একজন ফেলে দিল বাবুজানকে। তারপর সবাই চেপে ধরল। গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে এঁটে ধরতে বাবুজানের জিভ বেরিয়ে পড়ল। তিনি গোঁগোঁ করতে করতে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে নেবার পর পেটে ছুরি মেরে টেনে টেনে নাড়ী কেটে দেওয়া হল। কাটা হল গলার নলী। দুটো হাতের কব্জির শিরা। তারপর কোমরে ইঁটপাথর বেঁধে ফেলে দেওয়া হল নদীতে।

পরদিন বাবুজান মিস্ত্রির খোঁজ পড়ল চারদিকে। তাঁর মতো লোকের কে শত্রু থাকতে পারে? থানাপুলিস, আত্মীয়কুটুম্ব-বাড়ি সর্বত্র খোঁজ নেবার পর নিরাশ হয়ে পড়ল বাবুজানের তিন ছেলে আর দুজন জামাই। মেয়েরা কাঁদছে মাথা কুটে কুটে।

তিনদিন কেটে গেল উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। নাসিরুদ্দিন বলল, 'শালা লোকরা সব পাগলা। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে কাঁদতেছে সব্বাই। বাবু লোকের উপকার করতে গেছে—আসবে আবার, না এলে এই শালা লোকেরা

বাঁচবে কি করে? জোহরার বে দেবে কে? ঐ যে তার বর এয়েছে আলতাফ।' হাসতে লাগল নাসিরুদ্দিন। তারপর বলল, 'আমার বাপকে আগাশের ফেরেস্তা লিয়ে গেছে। আর আসবে নে।'

এইবার নাসিরুদ্দিন কাঁদতে লাগল। তার দাড়ি বেয়ে বেয়ে চোখের পানি ঝরে পড়তে লাগল।

কলুর বলদ

কঞ্চির বেড়া চিরে মুখ গলিয়ে কুমীরের মতন লম্বা হয়ে বাকুলে সেঁধিয়ে নিমু ঘোষের কেলো কুত্তাটা হেঁসেলের ভেতর ঢুকে কড়ার শামুকের মুটি রান্নাটুকু খেয়ে নিয়ে পেছনের ঠ্যাং তুলে আশীর্বাদ করে হাঁড়ি-কলসী ভিজিয়ে চলে যাবার পর তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বাড়িতে ফিরল কার্তিক পোড়েল। দুপুররোদে সে কাকের মত গাল মেলে হাঁপাচ্ছিল। মা গেছে থোড়, মোচা, গিমেশাক, হিঞ্চেকলমী কচুডাঁটা বেচতে ইস্টিশনের বাজারে। সে আলাদা খায়।

তালশাঁস বিক্রি করল কদিন কার্তিক জমায় নেওয়া গাছের। এখন রস গুড়োল তো একটা ডাঁটায় যে ক-ফোঁটা ঝরে সেই দারু পিয়ে থাকো। তাঁতটা বেচবে—খদ্দের আসছে আর যাচ্ছে। বলে, 'একশো টাকায় দেবে?'

কার্তিক বলে, 'গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর। নিশ্চিন্তে আছি আমরা। রাধামণি হাটে সুতো কিনি। গামছা বেচি। টাকা নেই—কেনা-বেচা বন্ধ। মেদিনীপুরের লোকের ভিক্ষের ঝোলা কাঁধে নিতে লজ্জা কী?'

বলের মত ঝুলন্ত বাতাবী লেবুগাছটার তলায় বসে অপেক্ষা করে কার্তিক, তার বউ আহ্লাদী কখন চান করে আসবে ন্যাড়াগ্যাঁড়াগুলোকে নড়া ধরে টানতে টানতে। শামুক রান্নার খানিকটা না নিলে এখন তাড়িটা খায় কী দিয়ে? কটকটে করে ঝাল দিতে বলেছে, কী করেছে কে জানে! তুলে নে খেলেই বলবে, 'ছোঁচা, এটু তর সয়নে!' লে বাবা বসেই না হয় থাকি। মেয়েদের গা-ধোয়া, দশ জায়গায় ঘষোন-ঘাষোন, চুল ধোয়া, নিংড়ানো, কত কারবার! আজ আর ভাত হল না। ক্ষুদচচ্চড়ি করেছে। তাও ন-সিকে কেজি নিলে ঘোষের দোকানে। নিমু ঘোষের গলায় তুলসীর মালা, সদাই ধর্মকথা উপদেশ, কিন্তু কাঁকর-ভরা চাল-ক্ষুদ বেচার সময় দেড় চোখে তাকায় বেটা। তিনতলা বাড়ি। পঞ্চাশ বিঘে জমি। তাই ট্রাক্টর কিনতে পারল ছেলের নামে। তার সুতো কেনার পয়সা নেই, তাঁত চলা বন্ধ হয়ে গেছে, হাতে-পায়ে ধরে সে পঞ্চায়েত-সদস্য উপপ্রধান হিমু ঘোষকে জানালেও

তার বুকের পিঁড়ে ফাটে না। বলে, 'তোরা কি ভোট দিস আমাদের? দশ বছর পার্টির কাজ করলে তবে লোন-টোন মিলবে, নইলে ঢোল ছিঁড়ে ফেললেও লয় গো ধনমণি।'

বাগদিপাড়া, প্রামাণিকপাড়া, ঘোষপাড়া, মোড়লপাড়া মুসলমান পাড়ার মধ্যে এখন বড় মুদিখানা বলতে ঐ হিমু ঘোষের দোকান। সব খদ্দের বাঁধা। কারো কারো বাকির খাতায় টিকি বাঁধা। বন্ধকী কারবারও চালায় হিমু ঘোষ। লেখাপড়ায় প্রায় সে বকলম কিন্তু বুদ্ধির ফিকিরে চাণক্য।

গামছায় তালের তাড়ি ছেঁকে কাঁচের গেলাস ভরলে পাতলা দুধের মতন দেখায়। কার্তিক নিজের মনে বকতে থাকে, 'এই হল গরিব লোকের দুধ। খাঁটি জিনিস। মাটি মায়ের রস। তাঁতটা পাঁচশো টাকায় কিনতে চায় না হিমু ঘোষ। একশো টাকায় বন্ধক চায়। জানে কাত্তিক পোড়েল ব্যাটা তো হাঘরে, কাটারি-হাঁড়ি-থালা বন্ধক দেয়—ও আর তাঁত ছাড়াতে পারবে না। এমনি করেই তো জমি জায়গা করেছে। ৭৫ সালে যখন পাঁচ টাকা চাল হয়ে গেল, কত লোক জমি বন্ধক দিলে ওর কাছে—আর ছাড়াতে পেরেছে? সাফ কোবলা বন্ধক মানেই তো বিক্রি-দলিল।'

ওরা সমাজের শাঁখের করাত। যেতে আসতে কাটে। পাপের পয়সায় তিনতলা পাকা বাড়ি হাঁকিয়েছে। অথচ যখন ঝড়-বন্যা হয়, ভগবান তার নিষ্পাপ গরিব ভক্তদের কুঁড়েঘরটা চুরমার করে ভাসিয়ে দেয়—ওদের পাকা বাড়ি যেন স্বর্গের পুষ্পরথ হয়ে বসে থাকে। ভগবান যেন ওদের সোনার চেন বাঁধা কুকুর। চেনটা নিজের গলায় ভক্তিতে অধম গরিবের মত কাঠের মালা করে রেখেছে।

আহ্লাদী গা ধুয়ে এল। ভিজে কাপড়ে এখনো কিঞ্চিৎ প্রাণের আশ্বাস পাওয়া যায়। আসলে ওটা তাঁতে বসে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গামছা বোনার ফলেই হয়েছে।

'খেতে বসবে না, আবার তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসেছ?' আহ্লাদী আর কাপড় না ছেড়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি নিয়ে হেঁসেলে ঢুকে শামুক রান্না আনতে গিয়ে হঠাৎ রাগে বাটিটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। টরটর করে চলে যায়। বলে, 'সব খেয়ে নিতে হয়? ছেলেরা একটু পেলে না? কত কষ্ট করে খালের জল থেকে তুলে আনলুম।'

'তোমার বাবা-মার পায়ে গড়। মাইরি ঠাকুরের দিব্যি, আমি একদম চাকিনি পর্যন্ত। হেঁসেলেই ঢুকিনি।'

কার্তিক হাঁটুতে হাত দিয়ে হুমড়ি খেয়ে হেঁসেলে ঢুকে তদন্ত শুরু করে বললে, 'আরে রাম! শালা হিমু ঘোষের দোকানের গলায় চাম বাঁধা কেলো কুত্তাটা বেরিয়ে গেল আমি আসার সময়—সে-ই মজা মেরে খেয়ে গেছে—আর গঙ্গাজলও ছিটিয়ে দিয়ে গেছে হাঁড়িকুঁড়িতে। সব্বাই একেবারে ঘাটে চলে গেলে গা ধুতে।'

আহ্লাদী বলে, 'বেশ করেছে। কতবার বলেছিনু না, হেঁসেলের মুখের

একটা টাঁটি বা বেড়া করে দাও। যারে ছেলেরা, তোরা এখন বুড়ো আঙুলে চোষ। ধিক্কায় করে মারলে যেন সব।'

বিকেলে দোকান খোলার পর নেশার মৌতাত নিয়ে কার্তিক পোড়েল এসে হিমু ঘোষের কাছে বললে, 'ঘোষ দাদার চরণে পেন্নাম হই। তোমার গলায় মালা, তোমার দোকানের ঐ কুকুরটার গলাতেও মালা। তুমি হরি কেষ্ট গাও, ও বেটাও ঘেউ ঘেউ করে। আজ ও জোর পাহারা দেবে। আমাদের শামুকের মুটি রান্না পেরায় কেজি খানেক খেয়ে এয়েছে। হও বাবা, বলশালী হও। মালিকের অনেক রোজগার হচ্ছে আজকাল। যারা বিশ্বাসী চামচে, চেকারা-হিস্যা দিতে পারে, রসগোল্লা-রাজভোগ খাওয়াতে পারে, রিক্সায় করে বিচারে নিয়ে যায়, থানায় নিয়ে যায়—তাদের দয়ায় এখন হিমু ঘোষের পাহাড়সমান মান-'সনমান'! দাদা, তুমি এবার 'চৈতন' রাখো। কেষ্ট কেষ্ট বলে নাড়বে। তোমার দল এখন এসব ছাড় দিচ্ছে। কেননা তোমার হাতে এখন লোকবল।'

'কাত্তিকের আজ খুব নেশা হয়েছে! বলি কোন্ গাছের রস খেয়েছ চাঁদমণি?' টাটে বসে হেসে হেসে বলে হিমু ঘোষ।

কার্তিক পরনের বস্তরটা সামলে দোকানের চাতালের পিলেপয় ঠেস রেখে বসে। বলে, 'তোমার সেই বাঁকা বুড়ো তালগাছটার একটা ডাঁটিতে এখনো দুদিনে একভাঁড় রস হয় দাদা. মিছে কথা বলবোনি!'

'সিজিন তো শেষ হয়ে গেছে চোত মাসে কবে। এখন জোষ্টি মাস। গাছটা এবার ছাড়ো। মালিককে যে অভিসম্পাত করবে। জমার টাকাও সব মেটালে না।'

লাফ দিয়ে উঠল কার্তিক। বললে, 'কী রকম? পাটালি নিয়ে বেচলে না? দশটা গাছের পাঁচমণ পাটালি—তার দাম কত?'

মাল মাপতে মাপতে হিমু ঘোষ বলে, 'কত হয় কষে দেখ্! পাঁচশো টাকা হবে? আর তালগুলোও ধরবি।' দেড়চোখে তাকাল হিমু ঘোষ।

'তালগুলো তো আমার পাওনা ঘোষমশায়।' বললে কার্তিক পোড়েল।

তারপর কীর্তন ধরল, 'এতেক কহিলা অবলা বলে। ফাটিযা যাইত পাষাণ হলে'

আট টাকা বিক্রি, ছ টাকা পাইকিরি। তা ছ টাকা করে কেজি ধরলে এক মণে কত টাকা হয়? তাকে পাঁচগুণ করো। কে করবে? কার হিসেব? হিমু ঘোষের? আরে বাপ!

পুলিশ দারোগা এখন ওদের কথায় ওঠে বসে। তার ওপরে আবার উপ-প্রধান। চোখে মোটা পরকোলা লাগিয়ে 'কোনখানটায় কোনখানটায়' বলে কলম পাখা করে ধরে 'মক্সো' করা এইচ ঘোষ নামটা ইংরিজিতে লিখে দেয়। তার পাশেই অঞ্চল পঞ্চায়েতের সীল পড়ে। তাতেই দশটা পুলিশ ছুটবে। তোমার ঘর থেকে পাইপগান, বোমা, মদের বোতল বেরিয়ে আসবে। থানায়

নিয়ে গিয়ে এমন মার মারবে যে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।

সেই হিমু ঘোষ হঠাৎ ঠোঙায় করে চাট্টি মুড়ি আর চানাচুর দেয় কার্তিক পোড়েলকে। চা দেয়। বলে, 'তোর শামুক রান্নার খেসারত দিচ্ছি, খা।'

'না, খাব না। ছেলেরা কী খাবে? আজ আমার ভাত হল না। ক্ষুদের ভাতে কাঁকর। লোন দিলে না, তাঁত বন্ধ। কী হবে বেঁচে থেকে? তোমার দোকানে আজ গলায় দড়ি দোব।' কাঁদতে থাকে কার্তিক।

হিমু ঘোষ তবুও মুড়িটা গছায়। বলে, 'খা খা, রাগ করিস নি। কুকুর অবলা জীব। তাই বলে কি তুইও অবুঝ হবি? আচ্ছা, আজ তোর তাঁতটা আমি আড়াইশো টাকাতেই কিনব। একটা খন্দের পেইচি। টাকা নিবি, না চাল নিবি?'

'দুশো টাকার চাল দাও, পঞ্চাশ টাকার তেল মশলা ডাল আলু।'

তাই দিলে হিমু ঘোষ। বাজার যাবার পরেই তাঁতটা চলে এলো।, চারশো টাকায় নিয়ে গেল খগেন সাউ। সেই হিমু ঘোষের কাছ থেকে ছশো টাকার একটা সরকারী লোন পেয়েছে হিমু ঘোষের পানবরোজে নাগাড়ে জন হিসেবে কাজ করে খগেন। প্রায় বাড়ির লোক। তাকে না দিলেই নয়।

কার্তিক ঘোষ রাতের বেলা উঠোনে পড়ে উদোম হাওয়ায় মনের ফূর্তিতে গান গায়ঃ 'মা আমায় ঘোরাবি কত। কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো।'

পুরনো মোহর

একখানা জিপ এসে দাঁড়িয়ে গেল উলুবেড়িয়া স্টেশনে যাবার মোড় মুখে—বাজার পাড়া রোডের ওপর। ধুনুরী আব্বাস আলী বেগ ছোবড়ার গদি সেলাই করছিলেন, রহমত আলী খান হোগলার ছৈ বুনছিলেন, সুবিদ সেখ মাথা চেলে চেলে তালে তালে উকো ধরে তক্তাপোশের পায়ার ঘটি তুলছিলেন, তার সামনে কাঠটাকে ঘুরপাক দেবার দড়ি টানছিল বালক আবুল হোসেন, বাসনকোসণ দেখাচ্ছিলেন হায়দার জাফর—নিমদীঘির মুসলমান কজন রাস্তার বগছাড়ে হালপত্তনি দোকান ফেঁদে বসেছেন। তাঁরা সকলেই জিপ থেকে একজন লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষকে ভারী জুতো আর মজবুত প্যান্টজামা পরে নামতে দেখলেন। তাঁর চোখে পড়ল লম্বা আটচালার খানিকটা অংশে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ার নোটিশ লটকানো। লেখা আছেঃ ফজর, আসর, জোহর, মগরেব, ইশা। পাশে পাশে সময় লেখা। মাদুরীর দোকানদার কিবুরিয়া মোল্লা চেয়ারে রোদে বসে গল্প করতে থাকা ইনসান সেখকে বললেন, 'ইনি তো পুলিশের লোক, কোমরে রিভলবার,

সঙ্গে বউকে এনেছেন—কী চায় দেখুন চাচাজান!'

দাড়ি আর মাথা চুলকে ইনসান সেখ বললেন, 'আমার জায়গায় তোমরা বসেছ ব্যবসা করতে, চাকরির জন্য তো সরকারকে জ্বালাতন করছ না—এখন সমস্যা হল গোঁফে খেজুর বেঁধে আছো—রাস্তার গায়ে কেন দোকানগুলো ঠেকালে এই কথা তুলে ফ্যাসাদ বাধাবার ভয় দেখিয়ে কিছু নজরানা আদায় করতে পারেন। তার চেয়ে তোমরা দেখ, ভদ্রলোককে একখানা গদি বা লেপ, দু'খানা মাদুরী, একডজন বাসন-প্লেট, দু'খানা চেয়ার এমনি দিয়ে বিদায় করতে পার কিনা। হেসে মিষ্টি করে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলবে।'

কিব্রিয়া মোল্লা পাঁশকুড়ার লোক। লেখাপড়া জানেন। কাছে এসে সালাম জানাতে পুলিশ অফিসার খুশি হয়ে সালামের উত্তর দিলেন। মোসাফেহার জন্য হাত বাড়ালেন। বললেন, 'আপনারা দোকান করেছেন এই বগছাড়ের ওপর বাঁশের মাচান করে—তলাটা গেঁথে নিতে পারেন তো!'

'এটা ট্রায়াল পিরিয়ড স্যার। পাঁচ বছর টিকে গেলে মালিক গাঁথতে দেবেন। তিনি ঐ যে চেয়ারে বসে আছেন।'

'আমার একখানা লেপ আর গদি দরকার। মাদুরী, গ্লাস-প্লেটও নিতে পারি। জাহানারা নেমে এসো।'

দোকানদাররা সবাই এসে ভিড় করলেন।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'বাগনানে ছিলাম, এখন আমতলায় খোলা-মেলা জায়গায় যাব—তাই বাসা সাজাবার নতুন জিনিস চাই।'

দু'খানা চেয়ার এনে দেওয়া হল 'কারপেনটার হাউস' থেকে।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমার নাম শাহাবুল হোসেন। ইনি আমার স্ত্রী জাহানারা বেগম।'

জাহানারা বেগমকে সবাই সালাম জানালেন। মৃদু হেসে হাত তুলে তুলে প্রত্যেককে সালাম জানিয়ে জাহানারা কারপেনটার হাউসের ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। আলমারি-চেয়ার, ডেস্ক, টেবিল, ড্রেসিং-টেবিলগুলোর দামদস্তুর করলেন।

তাঁদের টেবিল সাজিয়ে চা অমলেট মিষ্টি দেওয়া হল।

শাহাবুল হোসেন বললেন, 'এসব আনতে গেলেন কেন? ঠিক আছে, আমরা খাচ্ছি কিন্তু বিল দিয়ে দেব। আপনারা এটা আর খরিদ জিনিসের সঙ্গে ধরে নেবেন না।'

মৃদু হেসে জমি-জায়গার মালিক ইনসান সেখ বললেন, 'আমাদের একটা ফাণ্ড আছে, তা থেকে খরচা করি অতিথিদের জন্য। মাঝে মাঝে আমরা দানখয়রাত করি, মিলাদ দিই। গতবছর আমরা ব্যবসায়ী সঙ্ঘ থেকে একশোজন গরিব ছাত্র-ছাত্রীকে জামাকাপড়, বইপত্র দিয়েছি। লাভের এক পারসেন্ট আমরা রেখে দিই।'

'আপনি কি করেন?'

'আমার ইট আর টালির বিজনেস আছে ঐ ওপাশে। ভাটা নেই আমার।

জায়গা আছে কিন্তু ভাঁটা করতে দেবে না। অনাবাদী জমি পড়ে আছে অনেকখানি। এই যে লাইনঘরটা বেঁধেছি, এর নিচের সমস্ত জলজমিটা আমার। ইটখোলা বানাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও পারমিশান পাইনি। কাছে সব ভদ্রপল্লী। এস ডি ওর সাব অফিস। ধোঁয়া আসবে।'

'জায়গাটা আপনি আমাকে বিক্রি করবেন ? দশটা থানায় মেজো দারোগা বড় দারোগা হবার পর এখন আরো বড় হয়ে কানের পাশে চুল পাকল আমার। দুটো ছেলেমেয়ে আছে। এখনো বাড়ি করতে পারলাম না। ঘুষ খাই না তো আমি। বাইশ-তেইশশো টাকা মাইনে পাই—ওতেই ভদ্রলোকের সংসারের খরচ চালাতে হয়। মেদিনীপুরের সেই ওড়িশা সীমান্তে আমার বাড়ি। মাটির ঘর পড়ে আছে। বুড়ো বাবাও আমার কাছে এসে আছেন। অনেকটা আপনার মতোই দেখতে।'

লেপ দু'খানা আর একটা গদি, কিছু কাচের পাত্র, দু'খানা মাদুরী, একটা আয়না-লাগানো ড্রেসিংটেবিল নেবার পর মগবেরের আজান হয়ে গেল।

জিনিসগুলো একটা ম্যাটাডোরে তুলে হেপাজাত ক'র দিয়ে শাহাবুল হোসেন ওজু করে নামাজ পড়তে গেলেন।

জাহানারা বেগম জিপের ওপরে বসে রইলেন। রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত লরি বাস রিক্সা চলে যাচ্ছে। মানুষজন যেতে যেতে জাহানারা বেগমের দিকে তাকায়।

কুলায়ে ফি'র যাচ্ছে সন্ধ্যার পাখিরা।

নামাজ পড়ে আসার পর ইনসান সেখ সঙ্গে সঙ্গে এলেন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাড়ি ক'ার জন্যে জায়গা দেব। ইট দেব। রাজমিস্ত্রি লাগিযে দেব। বিরাট বিরাট ম্যানসন করেছে সেই রাজমিস্ত্রি কলকাতার বনেদী অঞ্চলে। নাম নুরুল আলাম। আমরা সবাই সহযোগিতা করব। সময় পার হয়ে গেলে আর পারবেন না বাবা। টাকাকড়ির কথা ভাববেন না। আসুন আপনি। আপনাকে আমি জমি দান করব।'

শাহাবুল হোসেন হাত চেপে ধরলেন ইনসান সেখের মোসাফেহার জন্যে। বললেন, 'আপনার দান গ্রহণ করতে পারার মত যোগ্য পাত্র তো আমি নই। ন্যা J দামে যদি জায়গা না কিনি, বুড়োবেলায় ঐ বাড়িতে নামাজ পড়বার সময় সেজ্‌দায় গিয়ে আল্লাহ্‌কে কী কৈফিয়ত দেব ?'

'আপনি বেশি দেরি করবেন না। হায়াত মউতে কথা তো বলা যায় না। যদি বছর পার করে দেন, তাহলে আমি জমিটা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকে দান করে দেব।'

'বোধহয় আমার বেশি দেরি হবে না। কেবল ছেলে দেখছি – মেয়েটাকে পার করব।'

সালাম জানিয়ে শাহাবুল হোসেন চলে গেলেন।

ইনসান সেখ ছেলের হাতে ইট-টালি বিক্রির ভার দিয়ে অধিকাংশ সময় তাঁর সাগরেদ দোকানদারদের কাছে এসে বসে থাকেন। পাঠান মোগল

আমলের ইতিহাস, উপন্যাস পড়েন।

ইনসান সেখ কেবল ইমানদার মুসলমান খোঁজেন। তাঁরা কোথায় গেলেন? নসীম হিজাজীর 'মোয়াজ্জেম আলী' উর্দু ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থের অনুবাদ 'খুন রাঙা পথ' পড়ে চুপচাপ বসে থাকেন ইনসান সেখ। বেচাল কথাবার্তা, বেহিসাবি ধরন-ধারণ কোন মুসলমানের দেখলেই তিনি চটে যান।

তাঁর কাছে সুভাষ চক্রবর্তী নামে একজন মধ্যবয়সী পতিত ভূমিটিকেনার জন্যে এলেন। তিনি নাকি এখানে একটি সুপার মার্কেট অথবা সানমাইকার কারখানা খুলবেন।

ইনসান সেখ বললেন, 'দয়াময়, যদি আপনি কয়েক দিন আগে আসতেন আমি লাভবান হতাম। কিন্তু একজন ব্যক্তিকে বসতবাড়ি করার জন্য কথা দিয়ে ফেলেছি। তাঁকে আমি বিশ হাজার টাকা দরে পাঁচ বিঘে জমি এক লাখ টাকায় দেব বলেছি।'

সুভাষ চক্রবর্তী বললেন, 'আমি আপনাকে এক লাখ পঁচিশ হাজার দেব।'

মাথা নাড়তে লাগলেন ইনসান সেখ। বললেন, 'অসম্ভব।'

'দেড় লাখ?'

'না হুজুর। পাঁচ লাখ দিলেও না। আমি কথা দিলে সেই 'ওয়াদা' ভাঙি না।'

'আপনি তো আচ্ছা বোকা লোক!'

'আজ্ঞে হাঁ, আমি সেকেলে লোক—একটু বোকা হয়েই বাঁচতে চাই।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনি সেকেলে লোক নন—পুরনো মোহর।'

দেরি দেখে ইনসান সেখ একদিন ধাওয়া করলেন আমতায়। শাহাবুল হোসেন বললেন, 'এখন তো আমার কন্যাদায়। কী করে হবে?'

'আরে সাহেব, ইট নিয়ে জায়গাটা আগে অ্যাকোয়ার করুন তো—পরে অন্য কথা ভাবা যাবে। নইলে প্রতিদিন খদ্দেরের জ্বালায় টিকির চুল উঠে যাবার কল হয়েছে!'

শাহাবুল হোসেন স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করার পর একটা চেক লিখে দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে জায়গাটাকে বুক করলেন। কিন্তু টাকার কোন রসিদ নিলেন না।

'সাইট ফর' নোটিশ তুলে দিয়ে ইনসান সেখ নিজের ইট দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দিলেন। রাজমিস্ত্রী বাড়ির নকশা এনে দিতে ইনসান সেখ তা দেখিয়ে এলেন শাহাবুল হোসেনকে। তিনি তো পেরেশান। বললেন, 'টাকা কোথায়, আপনি তো আমাকে ফাঁসাবেন দেখছি!'

'বাড়ির নকশা আপনার পসন্দ কিনা তাই বলুন, বিশ বছর ধরে আপনি টাকা বিনা সুদে শোধ করবেন। আমিও জানব আমার টাকা রয়েছে—আস্তে আস্তে ভাঙিয়ে খাচ্ছি।'

কন্যাদানের পর শাহাবুল হোসেন রোজই নিমদীঘিতে আসতে লাগলেন। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া। বাড়ি তৈরি হচ্ছে তাঁর—একটা ঘন আনন্দ মনে আবেগ আনে।

ধুনুরি, মাদুর ব্যাপারী, কারপেনটার, বাসনকোসন ব্যবসায়ীরা যেন তাঁর আপন ভাই হয়ে গেছেন—তাঁরা নিজের মতো দেখাশুনো করছেন সব-কিছু। খাতিরের অন্ত নেই তাঁর। অথচ এইসব লোককে যদি তিনি অর্ধশিক্ষিত বলে অবজ্ঞা করতেন, অথবা পথের ধার থেকে ওঠাবার ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা বা জিনিসপত্র হাতাতেন তাতে তাঁর কতটা লাভ হত ?

আর এটাও ঠিক, যতই উচ্চশিক্ষিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তিনি হোন, যদি এঁদের সঙ্গে নামাজ না পড়তেন তাহলে ইনসান সেখের হৃদয় তাঁর জন্য স্নেহরসে আদৌ দ্রবীভূত হত না।

তাঁর স্মরণ হয়ে যায় ইকবালের কথা : 'তার চেয়ে পৌত্তলিকও ঢের ভাল, যে মুসলমান ঘুমিয়ে থাকে কাবার মধ্যে।'

ইনসান সেখের নির্মল হাসিমাখা মুখের—তার দীপ্ত দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক শক্তিমান আর বিশ্বাসী মানুষ মনে হয়। এমন লোক তো খুব বেশি দেখা যায় না।

শাহাবুল হোসেন একদিন একটি লম্বা অঙ্কের অফার পেলেন—তিনি মস্ত এক সিমেন্ট আর গাঁজা, আফিম চোরাইয়ের ঘুঘু ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। সে টাকায় ইনসান শেখের ঋণশোধ হয়ে যাবে। কবেন তো পুলিসের কাজ। ঘুষ না নিলেও কি মানুষ তাঁকে সৎ বলে বিশ্বাস করবে ?

জাহানারাকে জিগ্যেস করতে তিনি বললেন, 'ইনসান চাচাকে জিগ্যেস করো। তিনি ঘুষের হারাম টাকা নেবেন কিনা। সেই টাকা নিয়ে তো তিনি হজে যাবার ইরাদা করে আছেন।'

ইনসান সেখ দাড়ি আর টুপি খুলে মাথা চুলকোতে লাগলেন, বললেন, 'না বাবা, আমার এ বছর হজে গিয়ে দরকার নেই। তুমি ঘুষ নিয়ো না।'

'তাহলে কেস দিয়ে দোব ?'

'দাও।'

'যদি আমার প্রাণসংশয় ব্যাপার ঘটে ?'

'ঘটুক। ন্যায়ের জন্য মরবে, তাতে ভয় কী ?'

শাহাবুল হোসেন কেস লিখতে লিখতে ভাবতে লাগলেন, ইনসান সেখ একটা হীরের টুকরো। তাঁর দাম অনেক।

আব্বাস আলী বেগের ছোবড়ার গদি সেলাই, রহমত আলী খানের হোগলার ছৈ বোনা, সুবিদ সেখের মাথা চেলে চেলে হেসে হেসে কাঠ চাঁছা, হায়দার জাফরের বাসনকোসন বিক্রি আর বালক আবুল হোসেনের দুলে দুলে দড়ি টানা দেখতে দেখতে বেলা দুপুর হয় ইনসান সেখের—তিনি যেন তাঁদের এক পরিবারের কর্তা—কখন কোন্ দিক থেকে বিপদ আসে তার জন্যে বুক পেতে বসে আছেন আর বিকেলবেলা রাজমিস্ত্রির কাছে থাকেন, যেন

কোন কাজ না গলতি হয় তা দেখার জন্যে।

আসলে তিনি শাহাবুল হোসেনকে ধরেছেন দরিয়ায় ভেসে যাওয়া একটা কাঠের মতো। যিনি আইনকানুন জানেন। বিপদে আপদে সাহায্য করবেন। তিনি এসে বসলেই নিজের কবর তৈরি করে ফেলতেও পিছপা হবেন না ইনসান সেখ।

হড়পা বান

মাটির বাড়ি ভেঙে দোতলা পাকাবাড়ি বেঁধে ইলেকট্রিক এনে ফ্যান রেডিও টিভি চালালেও শ্রীনিবাস হালদারের ভেতরে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। বড়ছেলে রাজকুমার হিন্দি ফিল্মের নায়কদের মতো ঘন্টায় ঘন্টায় পোশাক পাল্টায়। লালটুস চেহারা নিয়ে টিভি সারাতে গেলে সে বাড়ির মেয়েরা খুব দাদা-দাদা করে খাতির করে কাজ সেরে নেয়, পয়সা দেয় না।

শ্রীনিবাস বলেন, 'বামুনের ছেলে, রাঙা মুলো! বুদ্ধি বলে কিছু নেই। কিছু মুরোদ হলো না এখনো উপায় করার। জমি-জায়গাগুলো চাষ করলেও তো সংসার চলে। নেহাৎ যজমানরা জমিগুলো চষে তাই, নইলে লালবাণ্ডা পুঁতে দিতো কবে। তিনটে মেয়ে বিদায় করতেই আমার সব গেল।'

স্ত্রী মেনকা বলেন, 'এবার ছেলের বিয়ে দিয়ে সব আনো।'

'সে আশায় জলাঞ্জলি দাও। ছেলে যে রকম ধাতের, দ্যাখো না কবে কার একটা কালপেত্নীকে উদ্ধার করে না আনে।'

মেনকা শাসনের সুরে বলেন, 'তুমি ঐরকম করে হেনস্তা কোরো না তো—শুনতে শুনতে ধিক্কার করে তাই করে বসবে একদিন।'

প্রায়ই লোডশেডিং থাকে। চারদিকের ডোবায় পাট পচিয়ে এখন মশার জ্বালায় সন্ধ্যার আগে থেকেই কোথাও একটু স্থির হয়ে বসার উপায় নেই।

গোটা বাড়ির ছাদ-বারান্দায় পাট শুকোতে দেওয়া আছে। কাচার পর ভিজে আঁটি আধা-আধি বখরা করে নেন শ্রীনিবাস। ওজনে যার কপালে যা থাকে। চাষীরা পাট বয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে শুকিয়ে তবে অর্ধেক বখরা দেবে—তাতে বিশ্বাস কী? চাষী সনাতন গায়েন বলেছিল, 'বাবাঠাকুরের অত যদি অবিশ্বাস তবে পাটের আঁটি 'জাগ' দেবার 'অগ্‌গেরেই' বখরা করে নিলেই পারো আপনি!'

পাতলা, ফরসা, টিকলো নাক, সিঁথি-কাটা, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ছাতা মাথায় শ্রীনিবাস বলেন, 'পাট-কাচার খরচা কে দেবে গায়েনের পো?'

এক বছরও নয়, প্রত্যেক সময় যে যা চাষ করবে অর্ধেক বখরার লেখাপড়া

করেন শ্রীনিবাস। আমন চাষ করলে একবার, পাটচাষ করলে আবার লেখা-পড়া করো। আলু-পিঁয়াজ-পালং-কুমড়ো-লঙ্কা-সব্জি বা তিল-সরষে চাষ করলে তাও লেখাপড়ার মধ্যে থাকে। বাক্সভর্তি তাঁর কাগজ দলিল। কুড়ি বিঘে সম্পত্তির এককাঠাও কেউ নিতে পারেনি এখনো। সাপ্তাহিক পুজোয় প্রত্যেক যজমানবাড়িতে সাইকেলে চড়ে যান শ্রীনিবাস। যজমানরা তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তিনি জানিয়ে রেখেছেন—ঠাকুরের জমি যদি কেউ কারো উটকো-ফন্দিতে পড়ে অধিকার করে বসে তবে তার ঘরে আগুন ধরে যাবে। এসব জমি দেবত্তর। বর্ধমানের রাজার খাসনায়েব ছিলেন শ্রীনিবাস হালদারের প্রপিতামহ। তিনি রাধাকৃষ্ণ জীউয়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। সেই মন্দির এখনো আছে। তাব গায়ে হাজার রকম নক্শা। কত লোক দেখতে আসে। মন্দিরের নিচে আছে পঞ্চাশ ফুটের মতো গভীর। টর্চের আলোও ম্লান হয়ে যায়। ভয়ে কেউ কখনো নামতে পারেনি। অনেকের ধারণা মোগল সেনারা এসে রাজার মালমত্তা লুটে নেবার ভয়ে এই রকম কয়েকটি মন্দির করে রেখে বিশ্বাসী নায়েবদের মারফতে বহু ধনরত্ন এই গহ্বরে লুকিয়ে রাখতেন। কেউ কেউ বলে, অপরাধী বা শত্রুদের প্রাণদণ্ড দিতে ঐ মন্দিরের গহ্বরে ফেলে দেওয়া হতো। প্রচুর চুন আছে তলায়। তাতেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

ঐ মন্দিরের দেড়শো বিঘে সম্পত্তি ছিল দেবোত্তর। এখন বংশ বিশাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সেসব জমি 'জালা ভেঙে খোলা' হয়ে গেছে। যাঁর হাতে বেশি অংশ সেই শ্রীনিবাস মন্দিরের প্রধান রক্ষক। তাঁকে রোজ পুজো-নৈবেদ্য সাজাতে হয়।

ছেলে রাজকুমার ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চেঁচামেচি করতে থাকে—'বাড়িটা একেবারে চাষার বাড়ি করে তুলেছো। পাট, প্যাঁকাটি, আলু, ধান, খড়, তিল, সরষে, জ্বালানি কাঠের 'নেতুড়' চারদিকে। মাটির দোতলা ভেঙে পাকাবাড়ি বেঁধে তাহলে লাভ কী হলো? ভদ্রলোক বা আধুনিক মেয়েরা আসতে চাইলে বাড়ির এই অবস্থার জন্যে আমি আনি না।'

ছেলের রব কানে যায় শ্রীনিবাসের।

মেনকা বলেন, 'চুপ কর বাবা, চুপ কর। এসব লক্ষ্মীর দান বাবা, হেনস্তা করিস্ নি। তোর বাবা যদ্দিন আছে লক্ষ্মীও থাকবে, আর তুই যে রকম সরস্বতীর সেবায় মন দিয়েছিস, দু-চার বছরেই তা পাখা গজিয়ে উড়ে যাবে।'

মায়ের কথার ইঙ্গিত যে রাজকুমার ধরতে পারে না তা নয়, তবু ছাতা বগলে নিয়ে মাঠের আলে আলে, যজমানপাড়ায় পুজোর ভিখারি সেজে তার বাবাকে এখনো ঘুরতে হয় দেখে তার খারাপ লাগে।

'লুটি তো ভাণ্ডার মারি তো গণ্ডার'—রাজকুমারের এই ইচ্ছা। দামীদামী পোশাক বানিয়ে সে কোনো-এক অলৌকিক আহ্বানের অপেক্ষায় আছে কবে তাকে বম্বে ফিল্মে নামার জন্য কেউ ডাকবে। গামবুট পরে সে বন্দুক নিয়ে

শিকারে বের হয় মাঝে মাঝে। খালধার দিয়ে সেই খানাকুল থানার সেই বাদা অঞ্চলে চলে যায়। ফেরে তিনটে কানা বক আর একটা ডাহুক নিয়ে। তাও বাবা-মা খেতে দেন না—ঠাকুরের বিশাল পুকুরটার ওপারে বসবাসকারী সুন্দর সুন্দর দোতলা মাঠকোঠা-বাঁধা বাগ্দিদের বিলিয়ে দেন। তারা তা ঝাল-পিঁয়াজ-রসুন-আদা দিয়ে চাট করে তালের তাড়ি খায়। সবাই ওরা এখন কমিউনিস্ট। জমিদারের বিরাট চক দখল করে নিয়ে আলু, বোরো ধান, পাট, তিল, সরষে চাষ করে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। ওদের ঘরে সাইকেল, মোটরবাইক।

ঠাকুরের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরে নেয়, শ্রীনিবাস তাড়া-হাঁকা দিলেও ওরা গ্রাহ্য করে না। বন্যার সময় যখন পাড়ের 'মন' ঝাঁপিয়ে যায়, ওদের মাছ ধরার 'উল্-মালাই' দেখবার মতো। চট্ পেতে জাল ফেলে পাঁচ কেজি দশ কেজি মাছ ধরে।

শ্রীনিবাস সে সব মাছ দেখেন আর হা-হুতাশ করেন। ঠাকুরের পুকুরের পঞ্চাশটা শরিক—তাই মাছ ধরাও হয় না—ফেলাও হয় না। আগের জমানার যেসব পোনা ছিল তার চামড়া কড়া হয়ে গেছে। যে যার এখন লুটে খায়।

রাজকুমারের ইচ্ছা, একবার শরিকদের ডেকে মহাজাল টেনে যে-যার হিস্যা দিয়ে মাছ ধরাবে। কিন্তু বাবা ভয় দেখান, 'ওতে ঢেঁকির মতো বড় মাছ আছে, বারকোস আছে। জাল ছিঁড়ে ফেললে গুনোগারি দেবে কে?'

টিভি চললে পাড়ার যতো লোক এসে জড়ো হয়। মায় বাগ্দিপাড়ার মেয়েরা পর্যন্ত। সাদা সাদা চোখ সাক্ষাৎ দক্ষিণাকালীর মতো দেখতে জয়কৃষ্ণর মেয়েটা তার আঠারো বছরের ঢল-নামা চেহারায় জংলাছাপা শাড়ির বাহার লাগিয়ে এসে যেন আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে। ঐ মেয়েটাই এক সময় রাজকুমারদের তাল চুরি করতো ভোরবেলায় এসে। ওদের বাড়ি এখন যাতায়াত করে রাজকুমার। জয়কৃষ্ণের ছেলে উদয় মোটরবাইক কিনেছে। তাতে চড়ে রাজকুমার আর ঐ কালো মেয়ে ভদ্রাকে আলপথ বেয়ে শহরে সিনেমা দেখতে যেতে দেখেছেন শ্রীনিবাস। মাঝখানে বসেছিল রাজকুমার। তাকে জড়িয়ে ধরে ভদ্রা। উঁচু-নিচু আলপথে গাড়ি ওঠানামা করতে থাকলে ভদ্রা হেসে কুটিকুটি হয়ে রাজকুমারের পিঠের ওপর শুয়ে পড়ছিল।

এই দৃশ্য দেখার পর বাড়ি ফিরে শ্রীনিবাস ক্ষেপে গিয়ে স্ত্রী মেনকাকে গালাগালি করতে থাকেন। মেনকা চুপ করে তা হজম করেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

শ্রীনিবাস বলেছিলেন, 'এমন ছেলেকে তুমি গর্ভে রেখেছিলে কেন? লোকলজ্জা বলে ওর কিছু নেই? গলায় দড়ি দিয়ে মরলে আমি মা-কালীর কাছে পাঁঠা বলি দেবো।'

রাত্রে ফিরলো রাজকুমার বারোটার পর। মেনকা দোর খুলে দিয়ে একটা বিশ্রী কড়া গন্ধ পেয়ে নাকে আঁচল চাপা দিলেন। কর্কশ স্বরে বললেন, 'রাজু,

তুই কী আরম্ভ করেছিস বল্ তো। কী সব ছাইপাঁশ গিলছিস এই বয়সে? কাঁচ লিভার তোর পেকে যাবে। জন্ডিস হয়ে মরবি ?'

সিঁড়ি ভেঙে উঠে যেতে যেতে রাজকুমার বলে, 'আমার জন্যে দুশ্চিন্তা কোরো না মামণি। আমি পরম সুখে আছি। তুমি বাবাকে সুখী করার চেষ্টা করো গিয়ে। নিজে হতাশায় না ভুগলে অন্যের সুখ সে সহ্য করতে পারে না—কেবল সবাইকে সমালোচনা করে।'

রাজকুমার বাইরে থেকে হাতে-পায়ে জল না দিয়েই শুয়ে পড়লে মা বলেন, 'খাবি না তুই ?'

'আমি খেয়ে এসেছি মা।'

'তোর জন্য আমি খাবার নিয়ে বসে আছি না-খেয়ে আর তুই খেয়ে এসেছিস ? কোত্থেকে কী খেয়ে এলি ? মাথায় হাত বুলোতে থাকলে মায়ের হাতটা থেকে যেন ঘুমের ঝরনা নেমে আসে।

মেনকা বলেন, 'তোর জন্যে তো আর শুনতে পারি না বাবা, ভদ্রাকে নিয়ে তুই নটঘটি বাধাস নে। লোকে ছি ছি করবে। তুই বিয়ে করতে চাস বল, আমি মেয়ে দেখছি।'

রাজকুমার ঘুম আর আড়ষ্টতার সঙ্গে মায়ের হাত বুকে চেপে ধরে বিড়বিড় করে গাইতে থাকে, 'কালো তা সে যতই কালো হোক—দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !'

মা মাথায় হাত মেরে ফিরে এলেন। শুয়ে পড়লেন অন্য খাটে।

শ্রীনিবাস ঘুমোননি। বারান্দায় গিয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলটাকে উল্টো জিজ্ঞাসা চিহ্নর মতো মনে হলো। তিনি ফিরে এসে বললেন, 'যদি রাজু অবাধ্য হয়ে ঐ ভদ্রাকে ঘরে তোলে, তবে আমিও চরম একটা কিছু করে ফেলতে বাধ্য হবো মেনকা।'

'তোমার যা খুশি তাই করো, ছেলের যা খুশি তাই করুক, আমারও যা খুশি তাই করবো।'

প্যাঁচা, বাদুড়, পাতকোয়ার ডাক শোনা যায় দেবদারু, পাকুড়, জগিডুমুর, আম-জাম গাছ ভরা মন্দিরের বাগানে।

ভোরের আকাশ ডাকে। ঘনঘন বজ্রপাত হতে থাকে। তারপর মুষল-ধারায় বৃষ্টি নামে।

সকালে শ্রীনিবাস সাইকেলে চড়ে দূর মাঠের ওপারের গ্রামে যজমান-বাড়িতে পুজোয় বেরিয়ে যান।

রাজকুমার রোদে-ঝলমল সবুজ বাগানের পুকুরে স্নান করতে আসে সাবান-তোয়ালে নিয়ে ব্রাশ মুখে ঘষতে ঘষতে। মাথাটা যেন কী রকম ধরেছে। প্রচণ্ডরকম পায়খানা হয়ে গেল তার। স্নান করার সময় ভদ্রা কলসী নিয়ে হাজির হলো। বললো, 'ইস, সাহেবদের মতন লাল টুকটুকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে !'

'আর তুমি যে আমার মেঘবরণ এলোকেশী—তোমার চোখের প্রদীপে আমার বুকের আগুন জ্বলে !'

রাজকুমার ভদ্রাকে জলে নামিয়ে নেয়। দুজনে সাঁতার কাটে। জয়কৃষ্ণর ছেলে বালাপরা উদয় ক্যামেরা নিয়ে এসে তাদের ছবি তোলে।

একদিন জানা যায় ভদ্রার সঙ্গে রাজকুমারের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেছে। কেননা মেনকা দেবী তাঁর ভাইকে নিয়ে কোথায় যেন অতি সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে বউমা বানাবার ষড়যন্ত্রে ছিলেন। একদিন রাজকুমারকেও দেখিয়ে আনলেন অনেক অনুনয়-বিনয় করে। মেয়ে সত্যিই সুন্দরী—রাজকুমার অপছন্দও করতে পারলো না। দেবেও অনেক কিছু ওরা। একমাত্র মেয়ে।

নেশা যেন কেটে গেল রাজকুমারের। সে আর বাগানের দিকে যায় না। টিভি খারাপ বলে বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেন না মেনকা দেবী। বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাড়ির ঝি নন্দর মা রাজ-কুমারের হাতে একটা চিরকুট দেয়। উদয়ের চিঠি। তাতে লেখা ছিল: 'ভদ্রা মারা যেতে বসেছে। তিনদিন হলো সে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। সে মারা গেলে তুমি দায়ী হবে। তার সঙ্গে তোমার বহু ছবি আছে। তার কাছে তোমার বহু চিঠি আছে। এখনি না এলে বিপদ হবে।'

তাই রাজকুমার যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতেও সে বাধ্য হয়েছে।

শ্রীনিবাস শোনাবাত্র চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার ঔরসজাত সন্তান নয় রাজকুমার! সত্য করে বলো মেনকা, ও কিভাবে জন্মেছে?'

মেনকা দুই কান চেপে বসে পড়লেন। বললেন, 'ওগো, তুমি একি কথা বললে? একথা শোনার আগে আমার যে গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ছিল!'

'যদি ঘটনা সত্য হয়, রাজকুমার বাগদি জয়কৃষ্ণর মেয়ে ভদ্রাকে বিয়ে করে থাকে, তবে সে আজ থেকে আমার ত্যাজ্যপুত্র।' বললেন শ্রীনিবাস।

রাজকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাঁক দিয়ে বলে, 'বাবা' নাটক থামাও তো। আমার যাকে খুশি আমি বিয়ে করবো। তোমাকে নিয়ে তো ঘর করতে হবে না—আমি ঘর করবো। বাগদিরা কি মানুষ নয়? এতদিন পরের খেয়ে বামনাই করে মানুষকে তোমরা ঘৃণা করে এসেছ। তাদের দেওয়া চাল-কলা-কাপড়গুলো দিব্যি নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অভিশাপ দেননি, সেই নিম্নে নেমে আসার জন্যে?'

'নেমে যা—আরো নরকে নেমে যা তুই! কালো আলকাতরার মতো মেয়েকে এনে ঘরে তোল! আমার যজমানবাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যাক!'

'কি হবে ঐ ভিক্ষে করে? ওটা আমাদের এখন লজ্জা। পুজারী বামুনের কখনো অভাব যায়?'

'ঠিক আছে, তোর হাতে মার খাওয়ার আগেই আমি সংসার ছেড়ে চলে

যাচ্ছি। তবে যাবার আগে তোর মতো অবাধ্য ছেলেকে আমি শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে রেখে দিয়ে যাবো। আজই আমি সমস্ত ভাগচাষীকে জমি দখল করার খাস-পর্ত্তান লিখে-পড়ে দিয়ে যাবো।'

শ্রীনিবাস জামা-কাপড় পরে একটা চামড়ার সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়তে গেলে মেনকা পায়ে জড়িয়ে ধরেন। শ্রীনিবাস পা ছাড়িয়ে চলে যান।

মেনকা বসে বসে কাঁদতে থাকেন।

রাজকুমার চলে যায় শ্বশুরবাড়ি।

দুপুরের পর দেখা যায় ভদ্রার সিঁথি-আলো-করা সিঁদুর—তাকে মোটর-বাইকে বসিয়ে নিয়ে রাজকুমার বাড়ির পাশ দিয়ে শহরে সিনেমা দেখতে চলে গেল।

শ্রীনিবাস আর ফিরলেন না। সমস্ত যজমানবাড়িতে গিয়ে গিয়ে তিনি জমিগুলো তাদের নামে লেখাপড়া করে দিলেন।

'বাবা ঠাকুর এত ভালো লোক!' বলে পায়ের তলায় উপুড় হয়ে পড়তে হঠাৎ ফায়ার হলেন শ্রীনিবাস। বললেন, 'আমি কি সত্যিই মহাপুরুষ! আমার মতন ছোটলোক আর কেউ নেই। ছেলেকে আমি বঞ্চিত করছি তোমাদের সুখী করার জন্যে। আসলে আমি এখন একজন পাগল। আমার লাশটা এবার ফেলে দোবো আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরি মন্দিরের পাতাল গহ্বরে। আর কোনোদিন ঐ মন্দিরে কেউ পুজো দেবার থাকবে না।'

দিনসাতেক পরে শ্রীনিবাস ফিরে এলেন মাঝরাতে অন্ধ আতুরের মতো। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। মেনকাকে ডাকতে ইচ্ছে হলো। কতদিনের কত গভীর ভালোবাসা। কাঁদতে লাগলেন। দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন শ্রীনিবাস।

ভদ্রাকে নাকি বাড়িতে এনে তুলেছে রাজকুমার। ওদের ঘরে আলো জ্বলছে। হঠাৎ ভদ্রার খিলখিল হাসি শোনা গেল।

অসহ্য! ওর পেটের বাচ্চাগুলোও 'হোঁদল কুঁৎকুঁতে' হবে। তারা মন্দিরে পুজো করবে।

চিঠিটা ফেলে দিলেন শ্রীনিবাস দুয়ারের ফাঁক দিয়ে। মেনকাকে লিখেছেন, 'তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলো। আমি মধ্যরাত্রির পর মন্দিরের গহ্বরে ঝাঁপ দিলাম।'

কিন্তু মরা বড় কঠিন জিনিস। প্রাণের মায়া বড় সাংঘাতিক। সব ছাড়া যায়, প্রাণটাকে ছাড়া যায় না।

তিনি হাঁটতে লাগলেন। কেদার-বদ্রীর পথে চলে গেলেন চিরকালের জন্য।

সকালে চিঠি পাবার পর মেনকা দেবী বিধবা সাজলেন।

তাঁর মনে হলো, ভদ্রা যেন রাঢ় অঞ্চলের হড়পা বান। সর্বনাশী। সবকিছু ভেঙেচুরে নিয়ে চলে যায়।...

আবুসামা

চারিদিকে ফণীমনসার কাঁটা। মনসা আর হেঁতালঝোপ। সেঁয়াকুল, নাটা, বঁইচি মেড়ামারা বা মাকাল, হরকোচ কাঁটার ঠাস বুনন। ধানীঘাস সাঁতার কাটছে সরু নদীতে। নদীর পাড়ে লাল লাল সমুদ্রে-কাঁকড়ারা গর্তের কাছাকাছি থেকে কুঁচোচিংড়ি বা লাফ-কাটা গুলে চোঙা মাছের বাচ্চা শিকার করার আশায় বসে আছে শত শত। হিজলশাখায় লতানে রেশমকোমল গোলাপী ঝুরি থেকে অসংখ্য ফুল ঝরে পড়ছে। মুড়ির মত ছড়িয়ে আছে নীলাভ সাদা করমচার ফুল। গেঁড়িভাঙা কেউটে মুখে মুরগী বা হাঁসের নধর বাচ্চা নিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে লালচে শরখড়ি ঝোপের মধ্যে। কাঠশোলা আর হোগলার ঝোপে গুগলি চিংড়ির খোঁজে ব্যস্ত বালিহাঁস, জলপিপি, পানকৌড়ি, রাজহাঁস।

বাঁদর হনুমান গর্জনবানি, সুঁদরি, গরান, ঝাউ, হাওয়াইয়ের ডালে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে। গাছের ডালে ডালে মধুর চাক। কোথাও বা বিশাল আকারের ভীমরুল চাক গোটা নারকেল গাছকে জড়িয়ে উঠে যেন সোনার-কেল্লা বানিয়ে রেখেছে।

চারিদিকে নদী-ঘেরা এই দ্বীপের ভেতরে একদল মানুষের ডেরা। কয়েকজন মানুষ তাদের দৈহিক বলবীর্যের কসরত দেখাচ্ছিল। সর্দার আবুসামা ছাড়ানো একটা নারকেল হাতের মধ্যে রেখে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলে দিল। গোটা একটা সুপুরি দাঁতে চেপে ভেঙে দিল। অন্যেরা বাড়ি টানাটানি করছিল।

আবুসামা বলল, 'আজ আমাদের সাতজেলের রহিম গায়েনের বাড়ি অপারেশন করতে যেতে হবে। রাত এগারোটার পর যাত্রা শুরু হবে। জলপুলিশের স্পিডবোট তখন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের দিকে চলে যাবে তত্ত্ব-তল্লাসি চালিয়ে।'

আবুসামা পাকা ফরসা চেহারার মাঝবয়সী লোক। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের বিস্তার। গলায় সোনার লকেট। কালো বুক-খোলা খাটো বেনিয়ান গায়ে। পরনে লালরঙের শার্ট প্যান্ট। প্রদীপ্ত দুটি চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। খাড়া নাক আর চওড়া কপালে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। পেশীবহুল হাত-পায়ে সড়ে পাঁচ ফুট এই মানুষটির নাম শুনলে গোটা সুন্দরবন এলাকা কেঁপে ওঠে। জঙ্গলের রাজা নাকি সে। ময়ূরের ডাক শুনলে যেমন সাপ ল্যাজের দিকেও ঢুকে পড়ে গর্তের মধ্যে, তেমনি জলপুলিশও ইন্দ্রজালের মত নদীর এদিক সেদিক দিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রহিম গায়েন জোতদার মানুষ। বন্ধকী ব্যবসা, গলদাচিংড়ির মৎস্য ঘেরি আর ডাকাতির মালফাল গছে। পুলিশের সঙ্গে তার ভাগ বখরা আছে। সমাজের যতরকম পাপ আছে রহিম নাকি তার প্রতিমূর্তি। গতকাল এই নিশাচরে মাতলার ঢেউ ভেঙে ফুলে ফেঁপে যে সুডোল নারীদেহটি এসে ঠেক খায়, আবুসামার লোকরা সনাক্ত করেছে—এ ছিল রহিম গায়েনের ছোট বউ। গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে দেয় দরিয়ায়। তার কোমরে দড়ির ফাঁস ছিল—কোন কিছু ভারী জিনিস ছিল, ঢেউয়ের ঝাপটায় খুলে পড়ে গেছে।

আবুসামা দেখেছিল মেয়েটি খুব রূপবতী। কেন মারল রহিম? চরিত্রে অবিশ্বাস?

ইনসান বলে, 'ভালবাসত মেয়েটি এক স্কুলমাস্টারকে। নৌকোয় সাতজেলে থেকে আসার সময় মেয়েটিকে দেখে রহিম। মামার বাড়ি থেকে ফিরছিল। নাম ছিল রাহিলা। মামার বাড়ি নয়, আসলে মাস্টারের সঙ্গে ক্যানিং শহরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। যাহোক, রাহিলাকে বিয়ে করতে চায় রহিম। তার গরিব বাপের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয়। বিয়ে হয়ে যায়। বাপেরবাড়ি এসে চড়কমেলায় নাগরদোলায় ঘুরেছে নাকি রাহিলা মাস্টার শামসুল হকের সঙ্গে। তার হাতে হাত রেখে হেসে কুটিকুটি হয়েছে। রহিমের অনুগত লোকরা গিয়ে তাকে বলে দিয়েছিল। হঠাৎ এসে রহিম নিয়ে গেল রাহিলাকে। যাবার সময় সে খুব কেঁদেছিল। বলেছিল, 'মা কোন্ দরিয়ায় ফেলে দিলে গো।'

জলপুলিশের স্পিডবোট চলে গেল।

আবুসামার নৌকো ছুটে চলল তীরবেগে।

রহিমের বাড়িতে ডাকাত পড়ল মাঝরাতের পর। সোনা-রুপো আর টাকা-পয়সা মিলল প্রচুর। আবুসামার সামনে আনা হল রহিমকে। থর থর করে কাঁপছে তখন প্রৌঢ় কালো চেহারার লোকটি।

আবুসামা শুধোলে, 'গলা টিপে মেরে ফেলেছিলে কেন ছোট বউটাকে?'

'তার চরিত্র খারাপ ছিল হুজুর।'

'তোমার চরিত্র ঠিক আছে?'

ইঙ্গিত পেয়ে একজন গলা টিপে ধরতে জিভ বেরিয়ে পড়ল রহিম গায়েনের। খঞ্জর বার করে রুমাল দিয়ে চেপে টেনে ধরে জিভটা কেটে নিল আবুসামা। লাসটা পড়ে ছটকাতে থাকল।

অন্ধকারে তখন চাঁদ উঠছিল মেঘের মধ্যে থেকে। নৌকো নিয়ে ফিরে চলেছে আবুসামা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। বারোজন দাঁড় বাইছে। জলের কেবল ঝপাঝপ শব্দ।

হঠাৎ দূরে চাঁদের আলো-ঝিলমিল-জলে একখানা ছিপনৌকো দেখতে পেয়ে আবুসামা হাঁক দিলে, 'গাজিবাবা।'

পর পর তিনবার ডাক দেবার পর দেখা গেল দাঁড় বা পালহীন ছিপ

নৌকোটি এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ঋজুদেহ আলখাল্লা পরিহিত এক অমৃত পুরুষ। জ্যোৎস্নায় তাঁর দেহ রুপোর মত ঝলমল করছে। ঋষিকল্প মানুষটি বললেন, 'চলে যাও—ভয় নেই।'

সবাই জানে বাবা মসলন্দরী গাজিপীরের ভক্ত আবুসামা। নইলে তিনি হঠাৎ আজ এইভাবে দেখা দিলেন কেন? আবুসামা পাপের প্রতিকার করে ফিরেছে, তাই?

কোন্ দ্বীপে কোথায় থাকে আবুসামা, পুলিশ শত চেষ্টা করলেও খুঁজে পায় না। ঘোড়ামারা দ্বীপে অথবা হিজলী কাঁথির গাজিবাবার মেলায় আবুসামা আসবেই আসবে এটা সবাই জানে কিন্তু কখন কোন বেশে সে এসে চলে যায় কেউ জানে না।

অনেকের ধারণা মসলন্দরী গাজি সোনার পর বা ডানা মেলে তাকে লুকিয়ে রাখে—কেউ তার হদিস পাবে না। লোকমুখে প্রবাদঃ গাজি পীর রুপোর খড়ম পায়ে দিয়ে দরিয়ায় হেঁটে চলে যান অথবা দরিয়ায় জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়েন।

ডাকাতির সমস্ত ধনরত্ন আবুসামা জনপদের মধ্যে গিয়ে ব্যয় করে দিয়ে আসে। কোন পল্লীতে রাস্তা বেঁধে দেয় রাতারাতি। সকালে মানুষ দেখে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। কোথাও বা ইঁদারা খুলে দিয়ে জলকষ্ট নিবারণ করে দেয়। বসন্ত-কলেরার মড়ক লাগলে নিজে বাড়ি বাড়ি ডাক্তার নিয়ে চিকিৎসা করায়। দারিদ্র্যে কষ্ট পাওয়া মানুষদের অর্থসাহায্য করে। এসব তার পীরের নির্দেশ।

ডাকাতি করে এসে নিশান দ্বীপের চটিতে আশ্রয় নেবার পর সকলে যখন গরানকাঠের ঘেরের মধ্যে অকাতরে ঘুমোয়, ভাল নরম বিছানায় শুয়েও ছটফট করেন আবুসামা। প্রায় পাঁচশো ডাকাতি করেছে সে। কত খুন জখম করেছে নিজের হাতে। হাত ডুবে গেছে তার রক্তে। চালধানের গোলা লুট করে সাধারণ গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে। গরিবের জমি দখলকারী বাগদাচিংড়ি মহাজনের ঘেরির মাছ লুট করেছে। ক্ষেতের ধান লুট করার সময় পুলিশবাহিনীর সঙ্গে দামী আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলে, আবুসামা চোর-ডাকাত, নির্দয় মানুষ। আবার কেউ কেউ বলে, মমতার সে আধার।

আবুসামা কোথায় কীভাবে ডাকাতি করেছে সেকথা মাঝে মাঝে মনে করে। কত নৃশংস দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে যায়। মনে পড়ে, একবার সে মোল্লাখালিতে মেটে দোতলাবাড়িতে ডাকাতি করতে যায়। বুড়োকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখে চাবি নিয়ে গাছসিন্দুক খুলে প্রচুর সোনা আর টাকা পাওয়া গেল। দোতলার একটি ঘরে ডিমলাইট জ্বলছিল। খোলা দোর ছিল ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। নিচের তলায় কোন রকম জোর শব্দ না করেও পুরো ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পরও বুড়োর ছেলে-বউ

অকাতরে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে দেখে অবাক হয়ে যায় আবুসামা। তলোয়ার মেরে দু-টুকরো করে দিয়ে বউয়ের গহনাগুলো খুলে নেবার জন্যে হরিপদ সর্দার উদ্যত হলেও আবুসামা বাধা দেয়। ওদের সুখের ঘুম না ভাঙিয়ে দলবল নিয়ে নেমে আসে।

সেই দৃশ্যটি এখন আবুসামাকে যেন পাগল করে তোলে।

অথচ লক্ষ্নৌ শহরের বনেদী নবাববাড়ির ছেলে হয়ে বি-এ পড়ার সময় বুকে আগুন ধরানো ললিত শ্যাম এক সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়ে গিয়ে বটের ঝুরি ধরে দোলা খেয়ে তাদের বারান্দায় উঠে যায়। মেয়েটি তখন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে তার বাবা জেগে যায়। ঝুরি ছেড়ে চলে যাবার ফলে বাড়িটি থেকে মুক্তির পথ না পেয়ে ধরা পড়ায় শংকরমাছের চাবুক খায় বেধড়ক। এরপর থেকে সে নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠে।

নিজের মাকে পর্যন্ত ঘৃণা করত।

সে প্রথমে খুন করে ঐ ললিতশ্যাম মেয়েটিকে—তার এক প্রেমিকের সঙ্গে যখন গোপনে জঙ্গলের কিনারে তারা প্রেমালাপে মগ্ন ছিল। দুজনের দেহ ফেলে দেয় গিরিখাতের বহুদূর নিচে।

তারপর দেশ ছেড়ে আবুসামা পলাতক হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আজ তার শরীরে এ কী রকম বেয়াড়া ক্ষুধা জাগছে! সে না প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কখনো কোন নারী ভোগ করবে না! যে কোয়েলা হাসত, কথা বলত, গান গাইত—যে বুকে হাত রেখে শপথ করেছিল 'তুমি আমার', সে চেঁচিয়ে দিয়ে দারোগা বাপের হাতের চাবুক খাওয়াল!

নারীকে সে ঘৃণা করে। সমস্ত নারীই ছলনাময়ী। নারীর যৌবনমূর্তি দেখলেই সে ক্ষেপে উঠত। তাকে দলেপিষে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। শিশুকে আছড়ে মেরেছে তাদের সামনে।

সুন্দরবনে আজ দশ বছর আছে সে। বিশাল বাহিনী আছে তার নানান দ্বীপে। তারা সবাই গাজিবাবার দলের লোক।

আবুসামা হাঁক দিলে আজ হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসবে ঠিকই কিন্তু কী করবে তাদের নিয়ে?

পাঠানখালির জনপদের শেষপ্রান্তে ছদ্মবেশে একদিন আবুসামা যাচ্ছিল বৃদ্ধ এক মৌলবী বেশে। পথের পাশে দেখলে গলিত এক কুষ্ঠরোগী হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে চাইতে কাঁদছে।

'বাবা আমাকে কিছু খাবার দাও।'

দাড়ি বেয়ে বুড়ো মানুষটির যে দুটি চোখের জল গড়াচ্ছিল তার ভেতর রহস্যময় বিদ্যুৎ-ঝিকিমিকি দেখে আবসামা দাঁড়াল। হাসল একটু। বলল, 'কী খাবেন বাবা?'

কুষ্ঠরোগীর আঙুলগুলো বেঁকে গেছে। পায়ের আঙুল খসে পড়েছে। ঠোঁট দুটো গলে গেছে। গায়ের এখানে-সেখানের পচা ঘা থেকে রক্ত পুঁজ

গড়িয়ে পড়ছে। দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। বুড়োটি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তুমি যা খাবার দেবে খাব বাবা।'

'যদি আমার গা থেকে মাংস কেটে দিই ?'

মাথা নাড়ল বুড়োটি, না, তা খাব না। ছুরিও বার করেছিল আবুসামা। বুড়ো 'হাঁ খাব' বললে কাটতও সে। সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ঐ জ্বলন্ত চোখের ভেতরে অন্য আর একজনকে।

একটা দোকান থেকে একঘটি দুধ কিনে এনে দিতে বুড়োটি চোঁ চোঁ করে তা খেয়ে নিল, খানিকটা দুধ পড়ে রইল। বলল, 'আর খেতে পারব না। দুধ ফেলে দিতে নেই—তুমি না হয় ঐটুকু খেয়ে নাও।'

চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আবুসামা। কৌতুকভরা প্রশ্নালু দৃষ্টিতে যেন খুশির আমেজ।

আবুসামা বলল, 'আপনার স্নেহের দান আমি গ্রহণ করলাম।' দুধটুকু সে গলায় ঢেলে দেবার পর ঘটিটা ফেরত দিয়ে এসে দেখল বুড়োটি নেই।

কেবল একটা ধুলোর ঝড় পাক খেতে খেতে দূরে সরে গেল। আবুসামা চারদিকে খুঁজেও বুড়োটিকে দেখতে পেলে না। তাজ্জব কান্ড! এমন অলৌকিক ব্যাপার দিনদুপুরে ঘটতে পারে ?

কিন্তু আবুসামা উপলব্ধি করল, তার মনের মধ্যে যেন এক অনাবিল আনন্দ হরিণশিশুর মত লাফালাফি শুরু করেছে। তার শরীরে এখন অসীম ক্ষমতা। প্রকৃতিকে আজ তার সুন্দর মনে হতে লাগল। তার ভেতর থেকে লোভ লালসা হিংসা চলে গেছে। চটিতে ফিরে এসে তার লোকজনদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলিঙ্গন করল। বলল, 'সবাই এখন আমরা সমান—কাল থেকে তোমরা আজব হয়ে যাবে। কেবল আজকের রাতে আমরা একটা ডাকাতি করতে যাব। তারপর আর নয়। আজ ডাকাতিতে যে যা পাবে দিতে হবে না। কেউ অযথা খুন বা অত্যাচার করবে না। ডাকাতি থেকে ফিরে যে যার বাড়িঘরে চলে যেও।'

সবাই বলে উঠল, 'আল্ হামদো লিল্লাহ।'

গরান, সুঁদরি, পেয়ারা বানি, গর্জন বানি, আল ইত্যাদি কাঠের আড়তদার, বিখ্যাত চাষী আজিম খানের বাড়িতে ডাকাত পড়ল সেদিন মাঝরাতে। ডাকাত এসেছিল সংখ্যায় প্রচুর। পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে সদোর খুলে দেবার পর ঢেঁকির গুঁতো মেরে দোর ছাড়িয়ে যখন আবুসামার সামনে আজিম খান বন্দী হয়ে এলেন—যেন উদ্বেগহীন মানুষটি তিনি। চাবির গোছা ফেলে দিলেন। বন্দিত্ব মেনে নিলেন।

বললেন, 'আপনি গাজিবাবার ভক্ত, শুধু আপনাকে অনুরোধ নারীদের ইজ্জৎ বাঁচাবেন। শিশুহত্যা করবেন না। আমার দৌলত আপনার দৌলত।'

সমস্ত ঘর থেকে মালটাল লুট হতে লাগল। চিৎকার চেঁচামেচি নেই। দুই ছেলেও নীরবে বন্দিত্ব মেনে নিয়েছে। ঘরে ঘরে টর্চ ফেলে মেয়েদের

দেখলে আবুসামা।

দোতলায় উঠে গেল। সে যে তাকে দেখেছিল হিজলীর মেলায় তার বাবার সঙ্গে। ওঁরা রমারম ঘটা করে মানসিক শুধে গিয়েছিলেন।

দোতলার একটি ঘরে আলো দেখে ভেজানো দোর ঠেলতে খুলে গেল। দেখল সেই মেয়ে বিছানা আলো করে পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে অথচ তার ঘুম ভাঙেনি। চিৎকার চেঁচামেচি অবশ্য তেমন কিছু হয়নি।

আবুসামা স্তব্ধবিস্ময়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। যেন গোলাপের মালা পড়ে আছে। বিছানার পায়ের কাছে বসে বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর চোখে পড়ল বাঁহাতের অনামিকার মিনে-করা সোনার আংটিতে নাম লেখা 'মদিনা'।

ওকে জাগিয়ে দেবে? ভয়ে যদি চিৎকার করে? ছোরা দেখাবে? তারপর? মুখ বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে পালাবে?

বোঝা কাঁধে নিয়ে ডাকাত সর্দারের কি বাইরে গিয়ে পথ চলা উচিত হবে?

তার চেয়ে এই ভাল। অনিন্দ্যসুন্দর নিদ্রাবিহ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ভাল। হঠাৎ পীর গাজিবাবার সেই পটলচেরা চোখ দুটো হাসতে লাগল ওর মুখের ওপরে। আবার হঠাৎ মিলিয়ে গেল। কিন্তু নারীকে যে সে বিশ্বাস করে না! মদিনার দৃষ্টিতে যে হাসির আলো সে দেখেছিল তাও ভুল হবে? সেও কি কোয়েলা হতে পারে?

বাইরে তখন বিপজ্জনক প্রতিরোধকারীরা এগিয়ে আসছে। দারোয়ান পালিয়ে গিয়ে চারপাশের বাসিন্দাদের ডেকে তুলে এনেছে। ঘেরাও হয়ে যাবার আগে চারদিকে খোঁজাখুঁজির পর সর্দারকে দেখতে না পেয়ে ডাকাতরা পালিয়ে গেল। তারা 'রে-রে-রে-রে—হৈ' বলে ধ্বনি দিয়ে বোমপটকা ফাটিয়ে ভয় দেখিয়ে বেরিয়ে গেলেও আবুসামা বাস্তববুদ্ধি হারিয়ে সম্মোহিতের মত বসেই রইল। সিঁড়ি দিয়ে লোকেরা বল্লম বাগিয়ে নিয়ে এসে পড়ল যখন, তখনো বসে আছে সে। তারা চাক্ষুষ করল আজ আবুসামাকে—ভয়শূন্য নির্বিকার মানুষ।

ঘুমন্ত মদিনার পাশে বসে আছে সে, যখন সব ডাকাত পালিয়ে গেছে ঘরের সমস্ত সোনাদানা নিয়ে।

এত সুন্দর দেখতে আবুসামা? মদিনাকে জাগায়নি পর্যন্ত?

লোকেরা সাহস করে এগিয়ে এলে আবুসামা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সরে যাও তোমরা। ওর ঘুম ভাঙিয়ো না।' এই শব্দেই অস্ত্রহাতে লোকগুলোর যেন হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল।

মদিনা জেগে গেল এই চিৎকার-ধ্বনিতে। উঠে বসল। দেখল—সেই আবুসামা! ফেরেস্তার মত দেখতে।

দু-হাত তুলে বন্দিত্ব মেনে নিল আবুসামা।

পুলিশ তাকে এতদিন পরে খুঁজে পেল।

আজিম খান থানায় এসে তাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেও পুলিশ কিন্তু ছাড়ল না। বহু কেস আছে আবুসামার বিরুদ্ধে।

বাড়ি লুটের মামলায় পাঁচ বছরের জেল হল আবুসামার। জেলের মধ্যে বসে সে কেবল ভাবত মদিনার বিয়ে হয়ে গেল কিনা। সুন্দরবনের প্রকৃতির নেশায় যেন সে বিভোর হয়ে থাকত।

একসময় তার জেলের মেয়াদ শেষ হলে একাই একখানা পালোয়ার বেয়ে নদীপথে এসে উঠল মদিনার বাড়িতে। রাজহাঁসকে কচি ঘাস খাওয়াচ্ছিল তখন মদিনা। চোখে চোখ পড়তেই সে আঁতকে উঠল। অস্ফুটে বলল, 'আ-বু-সা-মা!'

আজিম খান এসে দাঁড়ালেন। হাত ধরে আবুসামাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

রাজহাঁসগুলো আজ হরদম ডাকতে লাগল। মাতলায় নাকি আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছে!

পাঁচ বছর ধরে বহু ছেলে দেখে মদিনার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন আজিম খান। মদিনা জানিয়েছিল, সে কখনো বিয়ে করবে না। তার মনের খবর জানতেন তার মা। ডাকাত সর্দারকে সে নাকি ভালবাসে।

তাই আবুসামার সঙ্গে মদিনার বিয়ে হয়ে গেল। যে আবুসামা মদিনার বাবার ঘর থেকে সব সোনা টাকা বার করে দিয়েছে ডাকাতদলের হাতে।

মদিনা বলল, 'হায় কপাল! আমি ডাকাতের বউ হয়ে গেলাম!'

আবুসামা বলল, 'শুধু তোমার জন্যেই তো আমি ডাকাতি ছেড়ে দিলাম। চলো আমরা হিজলীতে বাবা মসলন্দরী গাজির দরগায় যাই। তিনি চাইলে সোনার পাহাড় আমি তোমাকে উপহার দিতে পারব।'

মদিনা চলে যাবে চালচুলোহীন ডাকাত স্বামীর সঙ্গে। সে উভরায় কাঁদতে লাগল। ডান হাতটা ধরে আছে তার আব্বাজান আজিম খান আর বাঁ হাত ধরে মৃদু মৃদু টানছে স্বামী আবুসামা।

এই চিরচেনা গৃহকোণ ছেড়ে আজ কোথায় কোন্ অচেনা পথে চলে যাবে সে জানে না। তবু তাকে যেতে হবে।

নাগবন্দী

জুট করপোরেশনের অফিসের সামনে পাট বেচতে আসা মহাজনদের ভিড়। কত গ্রামগঞ্জ থেকে ঘুরে ঘুরে পাঁচ হাজার সাত হাজার কুইন্টল পাট কিনে এনেছেন। পাটভরা সাজানো লরি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে পাট ঢেলে পাকা রাস্তার ওপরে বিছিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছেন। পাটের ওপর দিয়েই গাড়ি ঘোড়া চলে যায়। সাইকেলে জড়িয়ে আছাড় খেয়ে ঝগড়া

করলে পেটমোটা মহাজন করুণ চোখ তুলে বলেন, 'আহে, ডেড় পহার মনিষ্যি লয় লাখট্যাকার বিক্রম দ্যাখাও ক্যানে মিয়া ? ঘরে বিবির সনে ঠকরা মকরি করে এসে পাটে জড়িয়ে তালগোল পাকালে কি মোরা তোমার ফাঁড়া খণ্ডাতে পারি ?'

'কদ্দিন রাজপথ জুড়ে পড়ে থাকবে হে গণতন্ত্রের পেটমোটা মহাজন ?'

'সে তোমার জুট কর্পোরাল ভগ্নিপতিদের জিজ্ঞেস করো। মাল এনে আমরা তো এই পাঁচদিন বসে আছি। আমাদের যেন আর বউ ছেলে ঘর-সংসার নেই।'

চা-দোকান আর মিষ্টির দোকানে মহাজন, গাড়ির লোকদের গুলতোল। জুট করপোরেশনের বাবু আর আসেন না। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। ক্রমেই মন্তব্য অশ্লীল হতে থাকে। বাবুর জন্মের দিন নাকি তাঁর বাবুমশায় ঘরে ছিলেন না। দু-বছর মাত্র চাকরিতে ঢুকেই কী ঐরাবত চেহারা হয়ে গেছে। মুণ্ডেশ্বরী সরু নদী বটে কিন্তু বর্ষায় পাহাড়ী তোড় নেমে এলে দু-দিনেই ঘরদোর সব ভাসিয়ে দেয়।

জিপ এসে বাঁধতেই চারদিক থেকে যেন হৈ-হৈ লেগে গেল। জুট কর্পোরালবাবু ইয়ামিন হাসান চকচকে পোশাকে নেমে পড়ে অফিসে ঢুকলেন। খানাকুল, উদয়নারায়ণপুর, চাঁপাডাঙা, তারকেশ্বর, আরামবাগ এলাকার পাট মহাজনরা সংগ্রহ করে সরকারী সংস্থাকে বিক্রি করে দেবার জন্যে। মহাজনরা গরিব চাষীদের কাছে দাদন খাটায়। পাট কাচা হলেই কম দামে তাদের ঘর থেকে মাল বার করে নিয়ে যায়। অবশ্য ভিজে মাল রস মরে কিছুটা কমে যায়।

কিন্তু ইয়ামিন হাসান লম্বোদর সামন্তর পাঁচ হাজার কুইন্টল মাল গাঁট ফেলে কাঁটাপাল্লায় মাপার আগে দেখে নিতে গিয়ে বললেন, 'আরে মশায়, এসব কি দিচ্ছেন ? সরকারের টাকা কি হারামের জিনিস আছে, রসা মাল। গ্যাস হয়ে আগুন ধরে যাবে যে! বাদ দিন, বাদ দিন। তাছাড়া এসব লাল টাঙি, বমি পাট তো নয়। লম্বাতেও তো অনেক কম। প্যাঁকাটির কুঁচো অনেক। আমি এ মাল নিলে জুট মিলকে গছাব কী করে ? দু-নম্বরী কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

লম্বোদর বললেন, 'পাঁচদিন সমস্ত মাল ঢেলে পাকা রাস্তায় ফেলে দুপুর রোদে শুকোনো হয়েছে…'

ইয়ামিন সাহেব তার কর্মীদের জানালেন দ্বিতীয় ব্যক্তির পাট নিতে। চেয়ারে বসার পর এক শীষ পাট আনতে তিনি হাত দিয়ে দেখে বললেন, 'এও রসা মাল। শুকিয়ে আনতে বল। তিন নম্বর দেখাও।'

একশো পঞ্চান্ন জনের মধ্যে মাত্র পঁচিশ জনের মাল নিয়ে টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ইয়ামিন হাসান তৈরি হতে থাকলে যাদের মাল পড়ে রইল তারা এসে বলতে লাগল, 'স্যার, আমাদের কথাটা একটু ভাবুন। কত দূর থেকে কত গাড়িভাড়া কুলিমজুর খরচা করে আমরা মাল এনেছি—আমরা ডুবে যাব।'

ইয়ামিন বললেন, 'তবে আপনারা যাবেন না—চাষীদের দাদন লাগিয়ে আধা দামে কাঁচা মাল ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছেন। চাষীরা আমাদের কাছে সরাসরি আসুক, আমরা মাল দেখে উচিত মূল্যে তাদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব।'

লম্বোদর বললেন, 'চাষীরা অল্প অল্প মাল দূর থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে আনবে কী করে?' লম্বোদর ধিক্কার দিয়ে বলেই ফেললেন, 'জুট করপোরেশনের চেয়ে জুট মিলকে আমরা মাল দিতে পারলে এমন ঝামেলায় পড়তাম না।'

'চলে যান জুট মিলে, কে আপনাদের বেঁধে রেখেছে! সেখানে গিয়ে দশদিন পড়ে থেকে মাল ভেজান—মিল বলবে আমাদের মালের দরকার নেই।'

এক দাড়িওলা মহাজন এসে বললেন, 'আপনি আমার জাতভাই, আমাকে একটু দেখুন। পাঁচ হাজার কুইন্টল মাল এনেছি। আপনি এটা রেখে পারমিশন দিন প্লিজ!'

'দেখুন জাহেদ মিয়া, এসব লোভ আমাকে দেখাবেন না। আমার আব্বা বলেছিলেন, ঘুষ কখনো খাবি না। কোন একদিন বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া সৎ থাকলে বিবেকের শিরদাঁড়াও খাড়া থাকবে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ইয়ামিন হাসান জুতো মসমসিয়ে গিয়ে জিপে চড়ে বসলে ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। মহাজনরা তখনো ঘিরে ধরতে চায়। ঘৃণার চোখে তাকান ইয়ামিন। ধুলো উড়িয়ে তাঁর গাড়ি বেরিয়ে যায়।

লম্বোদর সামন্ত বলেন, 'ভাত দেবার মুরোদ নেই কিল মারার গোসাঁই। গাঁ-গঞ্জের বাড়ি বাড়ি থেকে সরকারের পোষা পুত্র ইয়ামিন সাহেবরা যাক না পাট সংগ্রহ করতে—শালা সরকারের 'ডুলির কড়িতে বউ বিকিয়ে যাবে'। ঠিক আছে আমরাও স্টাইক করতে পারি সব মহাজন পাট দেবো না বলে এককাট্টা হয়ে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে কি? এই যে বউ ছেলে-মেয়েকে ভুলে পাটের লরী নিয়ে এসে পাঁচ-সাতদিন পথের বুকে পড়ে আছি—পুরুষদের মশলা ঠাসা রান্না খেয়ে আমাশায় ভুগছি—রাত জাগছি, এর হাত থেকে বাঁচার জন্য কি আমরা জোটবন্ধ হতে পারি না?

জাহেদ মিয়া ঊর্ধ্বে মুঠো পাকানো হাত তুলে বললেন, 'কিসের ঐক্যবন্ধ? পাট দেবেন তো চলে যান। এখানে পড়ে থেকে আর কী হবে? যদি মাল মজুত করে রাখেন, সরকারও টেনে বার করতে পারে। তাছাড়া আধভিজে রসা মাল রেখে ঘর পোড়াবেন? এত মাল রাখবেন কোন্ চুলোয়? আর এটাও তো ঠিক, সরকার ন্যায্য দাম দিয়ে কিনবে যখন তখন সে খারাপ দু-নম্বরী মাল কিনবে কেন? যেটা পছন্দ হবে কিনবে।'

মাথার চুল-পাকা বড় বড় গোঁফ সিদ্ধেশ্বর হাইত বললেন, 'আসলে এই ন্যায়পরায়ণ তরুণ ইয়ামিন সাহেবটিকে তোয়াজ-তোষামোদ করে একটু আমড়াগাছি করা দরকার। কেউ অর্থ চান না, নাম চান!'

লম্বোদর বললেন, 'রাখুন তো আপনার তত্ত্ব, তোয়াজ করার সময় আমাদের নেই। মাল ফেরত নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেবো।'

'পাট জাতীয় সম্পদ, জ্বালিয়ে দেবার অধিকার আপনার আছে?' একজন বলে উঠল।

জাহেদ মিয়া বললেন, 'আসলে এই শালার পাট কিনে এখন আমরা উন্মাদ হয়ে যাব। কাল আবার কি হয় দেখা যাক।'

পরদিন ইয়ামিন হাসান অফিসে এসে বসার পর কেউ আর মহাজনরা পাট নিয়ে এলেন না।

ইয়ামিনের অফিসের মোটা মাহিন্দ হাঁক দিয়ে বলল, 'পাট আনছেন না কেন আপনারা?'

এক মহাজন বললেন, 'আমাদের পাট ভিজে রসা বাতিল। সরকার গ্রামে গঞ্জে গিয়ে পাট সংগ্রহ করে আনুক। আমরা জুট মিলে মাল নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

ইয়ামিন সাহেব মোটা মাহিন্দকে বললেন, 'কাউন্টার বন্ধ করে দাও। আমি ওপরতলায় আলোচনা করে দেখি। চাষীদের ওপরে দাদন ঢেলে ফাটকাবাজির ব্যবসায় তাদের শুষে নিতে দেওয়া হবে না। বহু বেকার আছে, তাদের কাজ দিয়ে আমরা পাট সংগ্রহ করব সব এলাকায় সেন্টার খুলে। নতুন সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত এখন এক সপ্তাহ পাট নেওয়া বন্ধ থাকবে।'

ইয়ামিন হাসান জিপে চড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাটের লরী দু-পাশের রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কদিন।

মহাজনরাও ওপরতলায় তদবির শুরু করলেন। জুটের ডাইরেক্টর জেনারেল নিরাপদ সান্যাল জানতে পারলেন চলতি ব্যবস্থায় বাদ সাধছেন ইয়ামিন হাসান। মিলগুলোকে নাকি তিনি মহাজনদের হাতে থেকে দু-নম্বরী মাল বেশি দাম দিয়ে কিনতে নিষেধ করে দিয়েছেন ফোন করে। গেলেও মাসখানেক ফেলে রেখে দিক। দাম পড়ে যাবে। চাষীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে পাট না কিনে অনেক কম দামে কিনেছে। সরকার নিজে মাল কিনবে চাষীদের ঘর থেকে ন্যায্য দাম দিয়ে। এ না করলে দাদন দেওয়া-নেওয়া বন্ধ হবে না।

ইয়ামিন হাসানের ডাক পড়ল সান্যাল সাহেবের কামরায়।

সান্যাল সাহেব বললেন, 'দেখ ইয়ামিন, তোমার সিদ্ধান্ত ভাল, কিন্তু তুমি কি একাই সিদ্ধান্ত নেবে? আলোচনার দরকার নেই? মিলকেও তুমি বলেছ। এ বছর পাট সংগ্রহ তো হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলে ঘোষণা দিয়ে আগামী বছর থেকে তা করতে হবে। এখন সরকারের পাট সংগ্রহের সিজন। তাছাড়া মিলগুলোকেও বারণ করেছ মাল নিতে। একটা চালু ব্যবস্থা হঠাৎ ভাংচুর করা যায় না। মিলমালিক, চাষী, না মহাজন কার দিকে আছ তুমি?'

'আমি প্রথম চাষীদের দিকে, পরে সরকারের দিকে।'

'ভাল কথা কিন্তু চাষীদের বিপদআপদ আছে, তারা ঋণ করে……'

'সেটাও ব্যাঙ্ক দেবে।'

'ঠিকই, এখানেও পঞ্চায়েত সুপারিশ রাজনীতির লোক আছে। তাছাড়া সরকারের এখন অত টাকা নেই যে পাট সংগ্রহের জন্য কয়েক কোটি টাকা ঢেলে নতুন লোক নেবে। এটা মন্ত্রীমহল সিদ্ধান্ত নেবে। বাজেট পাশ হবে—তবে তো! এটা তোমার একার রাজকীয় সিদ্ধান্তেই হবে। যাও যেমন ব্যবস্থা আছে চালু রাখতে পারো রাখো নচেৎ তুমি কাজ ছেড়ে দাও।'

ইয়ামিন হাসান মাথা নিচু করে বসে রইলেন। চাকরি ছেড়ে দেবেন তিনি? বাচ্চা আছে দুটি। গ্রাজুয়েট বউ অনেক চেষ্টা করেও একটা মাস্টারি জোটাতে পারছে না।

চাকরি ছাড়লে আনন্দের সংসারে অন্ধকার নেমে আসবে। বাবা যে কেন ঘুষ না নেবার জন্যে আদর্শের কথায় এযুগে শপথ করালেন তার ঠিক নেই। চারদিকে ঘুষ। তা নিলেও বিপদ, না নিলেও বিপদ। ঘাম দিতে লাগল তাঁর শরীরে। সান্যাল সাহেব মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন চিরে ফেলছেন—'যা করবার করো, আমার হাতে বাজে ব্যয় করার সময় নেই। জরুরী মিটিং আছে।'

ইয়ামিন হাসান বুঝলেন এই মিটিং মহাজনদের সঙ্গে। যদি তাঁর জায়গায় নতুন লোক আসেন, মহাজনদের পক্ষে যেমন ভাল—বোধহয় সান্যাল সাহেবেরও।

ইয়ামিন হাসান যেন প্রাণভয়ে ভীত সাপের মতো ল্যাজের দিক দিয়েই পুরনো গর্তে ঢুকে গেলেন। বললেন, 'আপনি আমার বস—আপনি যা হুকুম করবেন স্যার, আমি তাই করতে বাধ্য।'

'ভেরি গুড! তাহলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যেও না। আচ্ছা, এসো তুমি।'

ইয়ামিন হাসান মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতেই মহাজনরা হুড়হুড় করে সান্যাল সাহেবের খাস কামরায় ঢুকে গেলেন। তাঁদের ভাবভঙ্গিতে আনন্দ ফুর্তি। ইয়ামিন হাসানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব।······

পরদিন যেন একটা নতুন দিন। ইয়ামিন হাসান কঠিন কঠোর ভাব ত্যাগ করে আলগা হয়ে বসলেন। সন্দেশ রসগোল্লা খেতে লাগলেন।

মোটা মাহিন্দ পাটের ওজন দিয়ে বিল বাবুকে বলে দিতে লাগল। কোনরকম ভালমন্দ পাট আর বাছাবাছি নেই। মহাজনরাও খুশি।

ইয়ামিন হাসান এখন শুধু সব মহাজনের বিলে সই করেন। নাম ডাকলে মহাজন এসে পাশে বসে সিগারেটের প্যাকেট অফার করেন। নোটের বান্ডিল ধরলে ইয়ামিন হাসান বলেন, 'ওগুলো রেখে দিন। যাকে খুশি করলে কাজ ভাল হয় তা তো আপনারা ভালই জানেন।'

'স্যার, এসব বলবেন না, আপনার চাকরি যাবে'—জাহেদ মিয়া বললেন, 'আমরা আপনার মঙ্গল চাই।'

বাড়িতে ফিরে নিকেলের চশমায় সুতো বাঁধা বাবা নামাজ পড়ে এসে

বসলে ইয়ামিন হাসান তাঁর কাছে বসে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললেন।

আব্বা নিশার হাসান বললেন, 'বাবা, দুনিয়ার বড় ফেরেবের জায়গা। সৎ হয়ে বাঁচতে গেলে কষ্ট অবশ্য সহ্য করতেই হবে।'

'তাহলে ভাল খাইয়ে পরিয়ে ছেলেমেয়েদের হাই স্ট্যান্ডার্ডের মানুষ করে গড়ে তুলতে পারব না তো আব্বাজান।'

'হাই স্ট্যান্ডার্ড। ভাল মানুষ। লেখাপড়া শিখে বেশি ভাল মানুষ হচ্ছে বলেই তো সমস্যা এত বাড়ছে। আমি এখন অসহায় বাবা—চার পাঁচ হাজার টাকা তো তোমাদের দিতে পারব না মাস গেলে। সেটা যারা দিতে পারে, ময়লা খাওয়া মোটা সাদা শুয়োরের মতো তাদের উপাস্য দেবতা করে ভালভাবে বাঁচো গিয়ে। ভাত দেবার মুরোদ নেই কিল মারবার গোসাঁই তো আর এ বয়সে হতে পারি না।'

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল।

অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলেন ইয়ামিন হাসান। তাঁর স্ত্রী টেবল লাইট বসিয়ে দিয়ে যেতে বললেন, 'আলোটা সরাও হালিমা। এখন অন্ধকারে আমাকে থাকতে দাও।'

চারদিকে যেন তাঁর অজগর। বন্দী হয়ে গেছেন তিনি।

একক ক্ষুদ্র শক্তিতে লড়াই করে সৎভাবে বাঁচার উপায় নেই।

লালবানু

'মিনসের নাম রূপচাঁদ কয়াল—নাম আর চেহারা দেখে কেউ কি বুঝতে পারবে যে সে মুসলমান। বুড়ো মদ্দ, দাড়ি রাখবে না, নামাজ পড়বে না, তাড়ি-মদ গিলবে আর মেয়েমানুষের ধান্ধা। বাপকেলে বিশ বিঘে সম্পত্তি রাঁড়ের গভ্যে তুলে দিয়ে এলো। সাতটা মামলা করলে। এখন আর ভাত হয় না। মারামারি করে হাজত খেটে পুলিশের মার খেয়ে এসে জখম হয়ে পড়ে আছে। শুয়ে শুয়েই মিনসের কি রোষ। কেউটে সাপের কোমর ভেঙেছে তবু কি বিক্রম। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।…'

লালবানু বিবি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে গাঁটরি খুলে যেসব মালটাল এনেছিল বার করতে করতে বক বক করতে থাকে। কিশোরী হয়ে ওঠা বড় মেয়ে মরজিনা সামানগুলো তুলতে থাকে। তার নানী কত কি দিয়েছে—আলোচাল, পাকাকলা, আমসত্ত্ব, মুগকলাই, নজনেডাঁটা, ঝিঙে, উচ্ছে, কুমড়ো, চারটে নারকোল, একটা বোয়াল মাছ, পান, কাঁচালঙ্কা, আলু…

'কোমর খসে যায় আমার এসব কাঁকালে করে বয়ে আনতে। রাস্তাঘাটে দুনিয়ার লোক মোর দিকে চেয়ে থাকে। আল্লা নাকি মোর গতরখানা দিয়েছে চোখে পড়বার মতন। মানুষের চোখের আর পলক পড়ে না।'

ছোট ছেলে দুটোর একটার বয়স দশ আর একটার বয়স সাত, কিন্তু মাথায় দুজনেই সমান। বিছানার মধ্যে চেনা যায় না হঠাৎ, কোনটা কে। তারা কলা আর আমসত্ত্ব নেবার জন্যে মায়ের সঙ্গে নুড়োনুড়ি হাতাহাতি করতে থাকলে লালবানু রেগে যায়, বলে, 'দ্যাখ চামনার বংশরা, কুত্তার মতন লোভ করবি তো মুখে নুড়ো গুঁজে দোব। তোর বাপের মুরোদ হয় এসব কিনবার?' চারটে কলা নিয়ে ছুঁড়ে দেয় রূপচাঁদ কয়ালের কোলের ওপরে। লুফে নেয় রূপচাঁদ। পয়সার অভাবে কামাতে না পারায় বনমানুষ-দাড়ি হয়ে গেছে তার মুখময়।

লালবানু বলে, 'বাপ বলেছে জামাই যেন নামাজ পড়ে, এই যে একখানা 'থামি' আর পাঞ্জাবি কিনে দিয়েছে, নামাজ পড়ো—মদ খাওয়া ছাড়ো যদি বাঁচতে চাও। নইলে চারদিক থেকে আরো দুঃখ ঘিরে ধরবে।'

রূপচাঁদ বলে, 'দুঃখ! অভাব! শুধু জিভে নুন ঠেকিয়ে যাকে দুধুরি খেনো খেতে হয়, আল্লা তার জন্যে কি নিয়ামত রেখেছে!'

রুষে ওঠে লালবানু, 'আল্লার জন্যে কি কাজ তুমি করেছ? হাজার লোকের চোখ যখন আমার দিকে, এখনো কুত্তার লোভে তাকায়, তুমি আমাকে দেখেছিলে?'

রূপচাঁদ কোলের ওপরে জখমী ঠ্যাংটা আদর করে তুলে পোড়া বিড়িটাকে দেশলাইকাঠির আগুন লাগিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে ঘিঁটে নিল, তারপর গলগল করে তা বার করতে করতে বলল, 'ছেলেমেয়ে তিনটে হল কোত্থেকে? তোর বাপের জন্ম?'

'ওলাউঠো!' বলেই লালবানু ছুটে গিয়ে রূপচাঁদকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলে দিল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল রূপচাঁদ।

মেয়ে মরজিনা এসে মাকে হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল। ছেলে দুটো খোঁড়ার ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে দাওয়ার ও-মাথায় দিয়ে এলো। সাবেককালের পাকা দাওয়ার লাল সিমেণ্টের চটা-ওঠা জায়গার ঘষা লেগে রূপচাঁদের পাছার তলার মোল চামড়া উঠে গেছে। সেখানে মুখের লালা লাগিয়ে থুথু ছিটোল ছেলে দুটোর দিকে। তারা সরে গিয়ে ফণা-তুলে-গর্জাতে-থাকা বুড়োটার কীর্তি দেখে আমোদ উপভোগ করতে লাগল।

লালবানু কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলে, 'আমার বুনকে নিয়ে লটঘটি করোনি তুমি? তার সংসার খেয়েছ। স্বামীর মারপিট সইতে না পেরে বাপের ঘরে পাইলে আসার সময় মাঝরাতে পাঁচটা ছোঁড়ার হাতে পড়ল। বউ পালাচ্ছে বউ পালাচ্ছে বলে তারা তাড়া করতে দৌড়তে দৌড়তে একজনদের পানাপুকুরে এসে পড়ল। তারা তুলে নিয়ে যেয়ে আদর করে

আগুনে সেঁকে রাতভর আরাম করে ভোগ করল। তারা ছেড়ে দিতে বাপের ঘরে গেল। বাপ বকাবকি করে আবার স্বামীর ঘরে পোঁছে দিতে স্বামী মারল, তারপর বুনটা গলায় দড়ি দিয়ে মরল .....'

'কতবার আর ও-গল্প বলবি ?' বললে রূপচাঁদ, 'বাসি হয়ে গেছে !'

'লায়লা, পুঁটি, লক্ষ্মী, অবলা, হাসিনা—তোমার পেয়ারের কত মেয়ের নাম বলব ? কোথা গেল জমিগুলো ?'

'তাড়ির ভাঁড়ে আর যমের দক্ষিণ দ্বারে।' মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে লালবানু স্বামীর স্বীকারোক্তি শুনে।

ছাগল ধরিয়ে কিছু কিছু পয়সা উপায় করত যে পাঁঠাটাকে নিয়ে, তার গায়ের উৎকট গন্ধে বাড়ি মাৎ হয়ে থাকত আর পয়সাগুলো রূপচাঁদ তার নেশার পথে ব্যয় করে দিত বলে লালবানু খদ্দের ডেকেছিল, সেই লোকটা এসেছে শুনে ঝগড়ায় ক্ষ্যান্ত দিয়ে বাইরে আসে।

লোকটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'পাঁঠাটা বিক্রি করবে ?'

'হাঁ, কত দাম দেবে ?'

'বুড়ো পাঁঠা, কত নেবে বলো !'

'একশো টাকা দিতে হবে।'

'হাসালে দেখছি, পঞ্চাশ টাকায় দেবে ?'

'সরে হাগো বাছা তুমি ! তোমাকে আর পাঁঠা কিনতে হবে না—পাঁঠার গন্ধ শুঁকেই চলে যাও।'

'আহা চটো কেন গো রূপচাঁদের বউ ! তোমার তো আমফাঁকের মতন বড় বড় চোখ—পাঁঠার গতরে কিছু রেখেছ বকরি ধরিয়ে ধরিয়ে ? ক'খানা হাড় হয়ে গেছে—যাক, যাট টাকায় দেবে ?'

'নব্বই টাকায় তুমি পারবে ?'

'না বউদি, সত্তর টাকায় দিয়ে দাও।'

রূপচাঁদ নেমে আসে। বলে, 'শালা যতীন বেরা, তুই আর কচাকচি করিসনি, আশি টাকায় নিয়ে যা।'

লালবানু আর কিছু বলে না। স্বামীর যে মত হয়েছে তাই ভাল। অন্য হাজার হোক স্বামীও তো বটে—সে যখন একটা দাম বলেছে তার ওপরে কথা বলা উচিত নয়।

যতীন বেরা টাকা বার করে। পঁচাত্তর টাকা সে দিয়েছে। লালবানু টাকাগুলো নিয়ে নেয়। পাঁঠা নিয়ে চলে যায় যতীন।

চাল কিনতে বেরোয় লালবানু। চারদিকে তাদের দেনা। চালের ব্যবসায় নেমেছিল সে। বাজারে বসে চাল বেচত। নানান গোলা থেকে চাল নিয়ে দাম মেটাতে পারেনি বলে আর কেউ ধারে মাল দেয় না।

রূপচাঁদ কতবার চালের পুঁজির টাকা ভেঙে ফেলেছে। লালবানুকে কতজনেই না তাগাদা লাগায় পুরনো দেনা আদায়ের জন্যে। সে কত কিছু বলে, সে আশা দেয়।

চাল ব্যবসায়ী গোলে-আরজান বলে, 'হ্যাঁ লালবানু, কি শুনি লা তোর নামে ? মুসলমানের মেয়ে হয়ে তুই নাকি কলকাতার বাবুঘাটে মদ বেচতে যাস ? ছিঃ ! হারাম চিজ, ছুঁতে নেই আর তুই মেয়েমানুষ হয়ে তাই ব্যবসা করতে যাস ?'

'কি করব বুবু, অভাবে স্বভাব খারাপ। ছেলেপুলেরা কি না খেয়ে মরে যাবে ? মন্দ মানুষকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। কে দেখবার আছে ! ধার-দেনা করে অনেক কষ্টে তিরিশটা টাকা যোগাড় করে রসপুঁজিতে গেলুম তিন ঘটি মদ কিনতে। নতুন লাইনে লো বুন, মোর খালি গা ছমছম করে। নস্করপাড়ায় একচেটে ঘরে ঘরে সব মদের কারবার। আচ্ছা আচ্ছা ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েরা আসতেছে মদ কিনতে। টিউবের ভেতরে, 'বেলাডারে'র ভেতরে, 'পেলাসটিকে'র জারের ভেতরে মদ নিয়ে যায়। পানি মিশিয়ে ডবল করে বিক্রি। একটা মেয়ে রোজ হাজার টাকার মাল তোলে। থানা পুলিস তার মুঠোর মধ্যে। চারদিকে চাঁদা দেয়। আমারও পুঁজি থাকত যদি ......এক আড্ডিদারকে ধরেছি...... সে মোর সাথে আসনাই করতে চায়।' 'হাঁ লো, সেই অমুক পাল!' হাসাহাসি ধাক্কাধাক্কি ঢলাঢলি করে দুজনে। তা মুই ও লাইনে নেই বুন, নাককান মলা খাই, তবে টাকাটা হাতাতে হবে।'

নগদ দামে চাল নিয়ে চলে আসে লালবানু। যার হোক রিকসায় উঠে পড়ে। দাম দেয় না সে। আর লালবানুকে বিনা পয়সায় বয়ে নিয়ে গিয়েও সুখ!

বছর দুয়েকের মধ্যে লালবানু পাকা ব্যবসাদার হয়ে ওঠে। বাবুঘাটের সে একটা কামনার কাৎলা। পাঞ্জাবী ড্রাইভার কন্ডাকটররা তাকে দেখলে খাতির করে। ভাড়া নেয় না। তার বিনিময়ে খাঁটি মাল চায়। আর ··

কলকাতা থেকে ফেরার পর বাখরার হাটে বাস থেকে নেমে চা-দোকানে বসে লালবানু। পরনে তার পাছাপেড়ে কল্কাপাড় শাড়ি, গায়ে বাবুদের মেয়েদের মতন আটসাঁট লাল বেলাউজ। ভেতরে আবার নীবিবন্ধন। সাড়ে পাঁচফুট উঁচু সুডৌল চেহারায় ভারী নিতম্ব তার প্রধান আকর্ষণের বস্তু। অনেক মেয়েই বলে, 'তোর মতন পাছা থাকলে লো চালের বস্তা লিয়ে আর বাজারে বসে থাকতুম নি!'

গাড়িতে যাতায়াতের সময় যেসব লোক তার পিছনে দাঁড়ায় প্রায় সকলেই বোধহয় শরীরে উত্তেজনা বোধ করে।

লালবানু কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। বাংলা পড়তে পারে। সেই বিদ্যেকেই অনেকটা ভেবে সে চালিয়ে দিতে চায় ভদ্রলোকদের সঙ্গে তর্ক-বচসার সময়। একদিন একটা খচ্চর ছেলে তার গায়ে হাত দিতেই লালবানু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিরে ভদ্দরলোকের বাচ্চা, আমি কি তোর ঘরের বউ— গায়ে হাত দিচ্ছিস ?'

'চুপ করে থাকো, বেশি ফুটানি মেরো না, নাক ভেঙে দেবো।'

'বলিস কি? তোকে তুলে আছাড় মারব!'

ছেলেটা ঘুঁষি মারতে যেতেই লালবানু হাতটা ধরে পাকিয়ে পায়ের কাছে ফেলে এক লাথি দিল। হৈ-হৈ ব্যাপার! বাস বন্ধ হয়ে গেল।

ছোঁড়াটার ঝুঁটি ধরে নিচে নামিয়ে আনল লালবানু। বলল, 'পায়ে ধর, ক্ষমা চা—নইলে জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব। আর একদিন না পিছনে লেগেছিলি? মেয়েছেলে মদ বেচি বলে খুব টিটকিরি মারছিলি কজন মিলে! কই, তোর বোনাইরা এখন কোথায় ডাক!'

ছেলেটা হঠাৎ লালবানুর পেটে একটা ঘুঁষি মারল। লালবানু হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। বসতেই তার চুল ধরে টেনে তুলতেই, লালবানু এবার ছোকরাকে এক ঝটকা মেরে ফেলে দিলে। তারপর সে উঠে পালাবার আগেই ঠ্যাঙ দুটো ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে পানাভরা খালের জলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লালবানুর গায়ে যে অনেক ক্ষমতা তা সকলেই বুঝতে পারল। সে বাসে উঠতেই বাস ছেড়ে দিল। সবাই তখনো হৈ-হৈ করছে। পাঞ্জাবী কন্ডাকটররা হাসছে।

লালবানু মাথার চুল আর কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিতে নিতে বলে, 'একমণ চাল আমি শূন্যে খেঁচে মাথায় তুলে নিই, একশো কেজি চাল মাথায় করে বইতে পারি আর ফোচকে ছোঁড়া মোর পেছনে লাগে!......'

বেকার রূপচাঁদ কয়ালের সংসার চালায় এখন লালবানু বিবি। খোঁড়া হবার পর বাড়ির মধ্যে নিজের ছেলে দুটোর সঙ্গে গুলি খেলে রূপচাঁদ। মেয়েটা রাঁধাবাড়া করে।

লালবানুর ফিরতে এক একদিন রাত বারোটাও বেজে যায়। রূপচাঁদ খবর পায় সন্ধ্যার পর কলকাতা থেকে ফিরেছে লালবানু। তারপর রিকসায় করে এসে কালী পালের সঙ্গে ভিড়ে তার বাগানবাড়ির মধ্যে কাটিয়েছে। কিছু বলার নেই। অভাবে তার মেয়েমানুষটা খারাপ হয়ে গেল।

লালবানু এসে গরমকাল হলে গা ধোয়। মেয়ে না জাগলে ভাত বেড়ে খায়। তারপর শুয়ে পড়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে থাকে।

রূপচাঁদ ডিম-লাইটের আলোয় বিড়ি ধরায়। মদের পাত্রগুলোর তলায় কিছু মদ যদি থাকে ঢেলে ঢেলে চাটে, গন্ধ নেয়। অল্প একটু মাল অবশ্যই রাখে লালবানু কোনো কোনো দিন। একেবারে বেহিসাবী নয়। স্বামীর ওপরে গোপন দরদও আছে। যেদিন মাল পায় আর একটু নেশা মতো হয়, সেদিন চুপি চুপি সে লালবানুর মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ডাকলে এক ঝটকা মেরে ফেলে দেয়। তাই প্রথমে কপালে হাত বুলোয়। কপাল টিপে দেয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লালবানু।

তখন লাফিয়ে লাফিয়ে কোলের কাছে চলে আসে রূপচাঁদ। পা দুটো টিপতে থাকে লালবানুর।

একসময় বোধহয় লালবানুর দয়া হয়।

রূপচাঁদ তার ওপরে নৃত্য করে।

সবটাই যেন তন্দ্রার ঘোরে হয়ে যায়। শেষদিকে লালবানু জেগে যায়। আর চোরের মতন তখন পালায় রূপচাঁদ।

উঠে বসে গালাগালি দেয় লালবানু, ওলাউঠো মিনসের ব্যাভার দেখেছ! ছিঃ! ভাত দেবার মুরোদ নেই—এদিকে মাগের কাছে রাতের 'ফরজ' সেরে পালানো! যাদের জন্যে জমি-জায়গা সব গেল তাদের কাছে যেতে পারনি ?……'

মেয়েকে ডেকে তোলে লালবানু। ছেলে দুটোকে তোলে। হিসি করায়। মশারী ঝেড়ে মশা তাড়ায়।

কবরের মতো সরু একটা ময়লা মশারীর মধ্যে রূপচাদ তখন যেন বেঘোর ঘুমের মধ্যে। সে কোনো কিছুই যেন জানে না।

ভোরবেলাতেই লালবানু উঠে তৈরি হয়ে নেয়। সেকেন্ড বাস তাকে ধরতেই হয়। রসপুঁজিতে এসে দেখে তখনই ভীম নস্করের বাড়িতে ভিড় লেগে গেছে।

উনুনে মাল জ্বলছে। ভীমের ডাকাতের মতো চেহারা। বড় বড় গোঁফ। পরনে গামছা। মেয়েরা কাজ করছে। গোয়ালঘর থেকে গুড়ের পচানি এনে উনুনের হাঁড়িতে ঢেলে দেয়। তার মুখের ওপরে তলা ফুটো একটা হাঁড়ি। সেই হাঁড়ির মধ্যে তিনটে কাঠের ঠিকরির ওপরে তলা চ্যাপটা মুখ খোলা ঘটি বসায়। তারপর ঠাণ্ডা জলভরা একটা কড়াই বসায় হাঁড়ির ওপরে। এইভাবে মাল তৈরি হচ্ছে সারারাত সারাদিন। কাঠের আগুনের তাপে পচানি গুড় ভটভট করে ফুটতে থাকে। তার বাষ্পটা মধ্যের হাঁড়ির ফুটো দিয়ে গলে উঠে ঠাণ্ডা কড়াইয়ের তলায় লেগে ঘনীভূত হয়ে ক্রমে জলের ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে থেলো ঘটির মধ্যে। এই বাষ্পীভূত জলটাই খেনো মদ। কেউ কেউ বলে 'চুল্লু' বা 'অমানুষ'।

চিটে বা বাজে গুড় এনে তাড়াতাড়ি পচানোর জন্যে ওষুধপত্রও ব্যবহার করতে হয়।

পিঁড়ি নিয়ে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে থাকে লালবানু। এক ঘটি দশ টাকা। কে কত ঘটি মাল নেবে আগে টাকা জমা নেয় ভীম নস্কর। এর মধ্যে সে গুনগুন করে গান করে। তার বউটা দু'চার কথা গল্প করে লালবানুর সঙ্গে। ভীম লালবানুর সঙ্গে ধারবাকিতে কাজ করতে চাইলে বউ চোখ পাকায়, কড়া কথা শোনায়। বউকে ভয় করে ভীম। আবগারী পুলিশ কতবার তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের আর পরোয়া করে না। টাকা ফেলে দিলেই তারা চলে যায়।

এক ঘটি মাল তিন পাঁট। থাটি মাল ছ'টাকা পাঁট। জল দেওয়া তিন

টাকা। দু-নম্বরি মালই নেয় লালবানু। তার পুঁজি কম। মাল মেপে দেয়।

ভীম বলে, 'এই চোলাই মাল বাবা দুনিয়ার সব মালের সেরা। একেবারে খাঁটি খেলেই সাবাড় হয়ে যেতে হবে। এক ঘটিতে দশ ঘটি জল মেশাতে হয়। তারপর হাত থেকে হাতে ফেরে জল মেশাতে মেশাতে। তাই খেয়েই মুখ কালো হয়ে যায়। লিভার পেকে যায়। ভদকা নাকি কড়া মাল, বিদেশীরা আমাদের দেশের খাঁটিধেনো খেয়ে সবাই চিৎপটাং হয়ে গেল। আমাদের তো মাত্রা বাঁধা নেই—তাই ধরে। কাশ্মির স্পিরিট বাঁধা দোকানে বিক্রি হয়, ওতে পারসেণ্টেজ বাঁধা আছে—কেউ মরবে না।'

ভীম আবার হাইস্কুলের সেক্রেটারিও। মাতৃক ব্যবসা চালিয়ে ইটের বাড়ি আর জমিজায়গা করেছে।

লালবানু কখনো কখনো হোমগার্ডদের হাতে ধরা পড়ে। তারা বেশি চেয়ে না পেলে থানায় নিয়ে যাবার ভয় দেখায়।

লালবানু বলে, 'আরে চল চল—হোম গার্ড, হোম গার্ড সব মালকেই জানা আছে।'

এইচ জি-র এই বিশেষণ সহ্য হয় না কোনো হোম গার্ডের। থানায় যেতেই হয় লালবানুকে। তার চেহারাই হয়েছে কাল। পুলিশরা বসিয়ে রাখে। ধানাইপানাই করে। টাকা না দিলে কোর্টে পাঠিয়ে দেবে। তারপর উকিল দিয়ে জামিন নিতে হবে। মাঝে মাঝে হাজির হতে হবে।

গরিবের অনেক ঝামেলা।

লালবানু জানে টাকা থাকলেই সব সাফ। নানান জায়গায় চাঁদা দাও। সঙ্গে গুণ্ডা রাখো। আর যারা রাজ্য চালায়, শিক্ষিত ব্যক্তি, তাদের ভেতরটা বড় অন্ধকার। বাইরে তারা চকচকে।

তার কাছে কুলি মেড়ো, পাঞ্জাবী বেহারীই ভাল।

টাকা টাকা করে লালবানুর মাথায় দুটো একটা চুল পাকল, মুসলমানের মেয়ে মদব্যবসা করার জন্যে তার বাবা আর ভাইরা ভীষণ খাপ্পা, কোনো সাহায্য দিতে চায় না। এমন কি বাপ বলেছে, 'মেয়ে আমার বেশ্যারও অধম হয়ে গেছে। বাজারে বের হওয়া মেয়ে পথের কুকুরেরও অধম।'

রূপচাঁদ কাহিল শরীরে এখন কেবল কুঁতিয়ে মরে কোনোক্রমে-প্রাণটুকু বার করে দেবার জন্যে, কিন্তু বেরোয় না। রক্ত-আমাশায় সে কংকাল হয়ে গেছে।

লালবানুর মেয়ে এখন বড় হয়ে গেছে। নাই বার করে কোমর বার করে কাপড় পরে। চোখের কোলে তার কালি জমে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নাকি সিনেমা দেখতে যায়।

লালবানু তাকে একদিন মেরে পিঠ ফাটায়।

হঠাৎ একদিন মেয়েটা উধাও হয়ে যায়।

কদিন কেঁদেকেটে নানান জায়গায় খোঁজ করল লালবানু, থানায় জানাল, কিন্তু খোঁজখবর পেলে না।

এর মধ্যে একদিন রূপচাঁদ মারা গেল।

বিছানায় পড়ে থেকে থেকে পিঠের নিচে ঘা হয়ে পচে তাতে পোকা হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেদুটো কিশোরবেলাতেই যৌবনের ছলাকলা শিখে ফেলেছে। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করতে যায় তারা।

তেমন তেমন মনের মানুষ পেলে লালবানু আবার নিকেয় সেঁধোবে বলে জানায়।

পুরানো লোকরা তার অভাব-অভিযোগের জ্বালায় কেটে পড়ে। কাউকে কাউকে অপমান করাতে সবাই এখন তাকে ভয় পায়।

টাকা নেই, মদের ব্যবসাও বন্ধ। ঘরের ছাউনি নষ্ট হয়ে গেছে, বর্ষায় বাস করা মুশকিল।

উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। ছেলে দুটো এসে বিক্রম দেখায়। মাকে গাল দিলেও তাদেরও তো খিদের জ্বালা আছে। গতর কোলে নিয়ে বসে থাকলে তো চলে না। বাইরে বের হয়। সেদিন বড়কাছারীর মেলা। মানতকারীদের মধ্যে অনেক যুবক-যুবতীর ভিড়।

কোনো ছেলে কোনো মেয়ের দিকে লোভাতুর চোখে তাকালে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ জমায় লালবানু। তাকে আশা দেয় ওকে হাত করে দেবে। চা মিষ্টি খায়। টাকা নেয় পাঁচ-দশটা। তারপর মেয়েটার সঙ্গে দৌত্য করে। আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়।

এরপর ছেলেরা 'মাসী-মাসী' করে লালবানুকে জড়িয়ে ধরে। স্নেহে আবেগে ছেলেদের মাথায় হাত বুলোয় লালবানু। অভাবে স্বভাব খোয়ানো মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ বা ধান্দাবাজিতে জড়িয়ে থাকে লালবানু।

দীঘায় কিম্বা সাগরিকায় যাবে তিনটে ছেলে, হঠাৎ তাদের টাকা আমদানী হয়েছে ডাকাতি বা ছিনতাই করে, দুটো তিনটে মেয়ে জুটিয়ে দেয় লালবানু। তার দালালী পায় সে।

মায়ের সম্বন্ধে নোংরা কথা শুনতে শুনতে ছেলে দুটো ক্রমেই যেন তেড়িয়া হয়ে ওঠে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই। একটা মেয়ের সঙ্গে আসনাই করতে গিয়ে দুজনে মারামারি করে মাথা ফাটায়। মা বড়টার দোষ দিলে সে মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাগে লালবানু থানায় গিয়ে ডায়েরি ঠুকে আসে। বড় ছেলে পুলিসের ভয়ে ঘরছাড়া হয়। যাবার সময় ছোট ভাইয়ের জামাপ্যান্ট, মায়ের শাড়ি সায়া নিয়ে তো যায়ই, উপরন্তু ঘরের মাঝখানে এক কাঁড়ি ময়লা ছড়িয়ে রেখে যায়।

লালবানুর মাজায় ব্যথা। কালী পালের চোখের কোলে আড়াই টাকাতেই

রাজ্যের কালি জমানোর ফলেই যে ওই ব্যথার সৃষ্টি তা বুঝতে পারে লালবানু।

তবুও হাসপাতালে হাসপাতালে ঘোরে লালবানু। কোনো নতুন রোগিণীর কাছে পরিচয় দেয় সেই হাসপাতালের আয়া বলে। কাপড়চোপড় হেফাজত করে রাখে। রোগিণীর জন্যে চা ফল পান জর্দা এনে দেয়। তার বাড়ির লোকেরা হাতে ধরে দেখতে বলে যায়। লালবানু বলে, 'কোনো ভয় নেই দাদারা, আমার নিজের বোনের মতো করে দেখব। ডাক্তাররা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। ডাঃ রায়কে দিয়ে অপারেশন করাব।'

লোকেরা বিশ্বাস করে দশটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। লালবানু বলে, 'বাবু আপনারা বড়লোক, চেহারা আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায়। একখানা শাড়ি দিতে হবে যাবার সময়।'

আশ্বাস পায় লালবানু। ছ'টার ঘন্টা বেজে গেলে যখন সবাই চলে যায়, লালবানু রোগিণীর কাছে এসে বলে, 'দিদিভাই, পনেরো মিনিট পরে তোমার অপারেশন হবে। অজ্ঞান করবে। তখন নার্সরা গয়নাগাটি খুলে নেবে। ডাক্তাররাও সাধু নয়। তুমি এক কাজ কর, গয়নাগুলো খুলে রুমালে বেঁধে আমার কাছে জিম্মা রেখে যাও। কেউ জানতে পারবে না। সোনার লোভ বড় লোভ।..... একবার হল কি......'

লালবানুর বাড়িতে পুলিস এসে তার খোঁজ করে। সে নাকি প্রায় দশভরি সোনা অগ্রবাল হাসপাতালের রোগিণীর কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

ধরে নিয়ে গিয়ে আবার মাজায় দরদ করে দেয় লালবানুর।

গলায় তক্তি বাঁধা মস্তান ছেলে হরমুজ দলের ছেলেদের সঙ্গে খাসী চুরি করার পর কেজিখানেক গোশ্‌ত পেয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু চাল নেই। দাওয়ায় বসে গুড়জলের নেশায় লালবানু চোখ লাল করে মাংস কুঁচোতে কুঁচোতে ঢুলছিল। হঠাৎ ঝোলাভারী, একটু দেখতে ভাল, একটা ফকির সাহেবকে আল্লা-রসুলের দোয়া-দরুদ পড়ে ভিক্ষে চাইতে দেখে তাকে ডেকে তরিবৎ করে বসাল লালবানু। বলল, 'হাঁগা ফকির সাহেব, মোর বাড়িতে মেহেরবাণী করে খানা খাবে আজ ?'

ফকির সাহেবকে বিছানা পেতে বসতে দিয়ে আঁচলে গেলাস মুছে শরবত করে খাইয়ে পাখার বাতাস দিয়ে দোয়াদরুদ পড়ে মাথায় ফুঁক দিইয়ে নিয়ে তার ঝোলাঝাপাগুলো তুলে রাখল লালবানু।

তারপর রান্না বসাল।

তেল গামছা দিতে ফকির সাহেব একসময় গোসল করে এসে জোহরের নামাজ পড়ল। তারপর রান্না দেরি দেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

হরমুজ এসে তাকে দেখে মুখের কাছে মুখ আনল। যেন গন্ধ শুঁকছে। সি আই ডি কিনা।

মা হাসল। বলল যেন, বেচারা!

ছেলে খেয়ে চলে গেল। যাবার সময় শব্দ দিয়ে গেল—হা রে রে রে

রে রে……

মানে ডাকাতি করতে যাবে।

ফকিরকে যত্ন করে খাওয়াল লালবানু। বলল, 'ঘর কোথা গা তোমার?'

'ম্যাদনাপুর।'

'মাগ ছেলে আছে?'

'উঁহু।'

'তবে কার জন্যে ভিক্ষে করো? এত চাল কি হয়?'

'বেচে দিই।'

'পথে পথে ঘুরে কি লাভ, মোর কাছে থাকবে?'

ফকির একবার চোখ তুলে তাকায়। তারপর গপগপ করে গিলতে থাকে।

'বলি মোর কাছে থাকবে?'

'কি যে বলো বিবি!'

'কেন আমাকে কি খারাপ দেখতে? বুড়ী হয়ে গেছি?'

'তরকারিতে বড্ড ঝাল।'

'মুই কি বলি আর ফকির সাহেব কি বলে!' হিহি করে হেসে গায়ে ঢলে পড়ে লালবানু।

ফকির বলে, 'তুমি তো বড় বেহায়া মেয়েলোক গো!'

'কেন কেন, আহা কি নুরানী দাড়ি! কি পুরুষ্টু ঠোঁট, একটা চুমু খাও না গো!'

'তওবা তওবা। দাও আমার ঝুলিঝাম্পা।'

ঝুলিঝাম্পা এনে ফেলে দেয় লালবানু। বলে, 'কিছু মনে করো না ফকির সাহেব, তোমার চালগুলো রান্না করছি …আজ আমাদের চাল ছিল না, আল্লাহ তোমাকে ফেরেশতার মতো পাঠিয়েছিল……'

'অত চাল……আমার টাকাগুলো……মেয়েমানুষ, তুমি মদ খাও!'

'ছেলেটা ডাকাতি করে রাত্তিরে ফিরবে। ভালমন্দ আনবে। থাকো না গো ফকির সাহেব!'

'ওরে বাবা! চলি আমি।'

হঠাৎ লালবানু ফকির সাহেবকে জড়িয়ে ধরে চেল্লাতে লাগল, 'ওগো পাড়াপড়শী বাপ সকলরা, বেরোও গো—ফকিরটার কি আক্কেল গা, এ্যাঁ—আমাকে জোর করে ধরে ইজ্জৎহানি করল ……'

অগত্যা লালবানুর সঙ্গে ফকিরের নিকে হয়ে গেল।

ছেলে আর রাত্রে ফিরল না।

তার পরদিনও না, তার পরদিনও না।

লালবানু এতদিনের পর নামাজে বসে। কান্নায় তার বুক ভেসে যায়। হে আল্লাহ্, গুনাহগাথা মাফ করো।

ফকির সাহেব দোরে দোরে তার জন্যে ভিক্ষে করে।

ভাগ্য-বিড়ম্বনা

বিয়ের সময় ছাড়া জীবনে কখনো সাবান মাখেনি বাহার সেখ। দেড় টাকা দিয়ে মুচির বাড়ির কাঁচা চামড়ার জুতোও বাবা কিনে দিয়েছিল সেই সময়। শুকিয়ে তা আমসি হয়ে যেতে ভিজিয়ে নরম করে কোনোমতে পায়ে সাঁদ করিয়ে উদোম মাঠ হালবাড়ি পার হয়ে জিলিপি বরফি বাতাসার হাঁড়ি হাতে ঝুলিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চার-পাঁচটা ফোসকা পড়ে পায়ের দফারফা হয়ে যেতে হাতে নিয়ে ফেরতবেলায় বউয়ের পালকিবেহারার পিছনে ছুটতে ছুটতে সেই যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কক্ষনো জুতো পরেনি বাহার সেখ। মাঠে হাল-লাঙল চষে গরুর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে পা দুটো তার চ্যাপটা আর মোটা হয়ে গেছে। গোড়ালির করকরে কড়ায় কাঁথা ছেঁড়ে। বাহারের খোসো দাড়ি, তাই তাতে চুলও গজায় না বেশি। দু'মাস ছাড়া খেউরি করার সময় নাপিতকে বিনাপয়সায় দাড়িটা একটু চেঁছে দিতে বলে।

পৈতৃক সম্পত্তি বলতে বাহার সেখ মাত্র আড়াই বিঘে ধানজমি আর পঁচিশ শতক ডাঙাজমি পেয়েছিল। তারপর সে গায়ে-গতরে খেটে খেঁসারি ডাল আর শাকপাতা ভাজা খেয়ে প্রতি বছর দু' বিঘে এক বিঘে জমি কিনে এখন বাহান্ন বছর বয়সে চল্লিশ বিঘে সম্পত্তির মালিক।

দুই বেটাকে নিয়ে শীতের রাতে ঘাম ঝরিয়ে পঞ্চাশ হাজার ইট কেটে পাঁজা পুড়িয়ে রেখেছে। বাগানের আম-কাঁঠাল-বকুল-জাম গাছ চেরাই করে কাঠ মজুত করেছে দরজা জানালা তক্তাপোষের জন্যে।

খড়-ধান-বাঁশ-তালপাতা-নারকেল-মাছ-কঞ্চি-ঘুঁটে-জ্বালানির কাঠ-পাট-প্যাঁকাটি-আনাজ ইত্যাদি বেচে বাহার সেখের মেলা উপায়। মেঝের তলায় ইটের পাড়ন বসিয়ে পাঁচটা কলসীর ভেতরে টাকা-পয়সা রেখে ছারপোকা ছাড়া বিছানায় বেশিরভাগ সময় না ঘুমিয়ে বল্লম মাথার কাছে নিয়ে রাত কাটায় সে।

বড় ছেলে আজিতের ভালো চেহারা, পাঞ্জায় জোরও খুব। হাল-লাঙল বাপের মতোই চষে দেখে বিশ বছর বয়সে বিয়ে দেবার পর মাটির ঘরটা ছেড়ে দাঁড় ঘরে আশ্রয় নিতে হলো বাহার সেখকে। পাশেই হাঁস-মুরগি-ছাগলের খোঁয়াড়, গরুর গোয়াল। জোলার বাড়ির ময়লা মশারির মধ্যে ঢুকে তেলচিটে বালিশে মাথা রেখে ভাবতে থাকে মেয়েটাকে পার করবে কী করে। কয়েক জায়গা থেকে দেখাশোনা হয়েছিল। সবাই ইটের পাঁজা আর ধানের গোলা, খড়ের গাদা, গোয়ালের দশটা গরু দেখে মেলা টাকা পণ আর সোনা-রুপো,

খাট-পালঙ্ক, থালা-ঘটি, দান-দেহাজ চায়। সবায়ের হাতে ধরে নাকে কেঁদে বাহার সেখ তার অক্ষমতা জানিয়েছে। গুড়ের সরবত আর সস্তার নরম টোকো জিলিপির নাস্তা খেয়ে তারা ভেগেছে।

বৌমা জোবেদা খাতুনের পিসতুতো ভাই বৌমাকে দেখতে এলে বাহার সেখ খোঁজ নেয়, 'হাঁ গা বাপ, তুমি পাঁকাল মাছ খাও ?'

ক্লাস টেনে পড়া ষোলো বছরের ছেলেটি লজ্জায় মাথা কাৎ করে সম্মতি জানাতে যেন স্বস্তি পায় বাহার সেখ। বাড়িতে আর কেউ নাকি পাঁকাল মাছ খায় না। তাই একটা বা দুটো পাঁকাল মাছ আনিয়ে কুটুমের জন্যে একটা আলু দিয়ে আলাদা রান্না করে দিতে বলে। লাল মোটা চালের এক ডিশ ভাত, খেসারি ডাল রান্না আর 'বিরেন' করা (সিদ্ধ) ডিম আধখানা অতিথির পাতে দেয়। পাশেই বড় ছেলের পাতে আধখানা ডিম আর জাম-বাটি ভরা ডাল। বুড়ো বাহার সেখ শুধু ডাল দিয়ে চাষের একটা কাঁচা পিঁয়াজ কামড়ে ভাত খায়।

পিসতুতো ভাই আলি আনসারের হাত ধরে জোবেদা খাতুন একসময় অবসর পেয়ে ঘরের আড়ালে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ভাই, আমাকে নিয়ে যেতে বলিস। দু'বেলা খেসারি ডাল খেয়ে খেয়ে আমার রক্তআমাশা ধরে গেছে। পেটের যন্ত্রণায় মরে যাই। বাপ আমার বড়লোক দেখে বিয়ে দিলে—এরা একেবারে চামার —হাড়-কিপ্পিন। পুকুরের মাছ সব বেচে দেয়। শাউড়িরও ঐ হাড়ির হাল। আমাকে ডাক্তার দেখাবার কথা বলতে বলে বাপেরবাড়ি যেয়ে চিকিচ্ছে করো। বাপেরবাড়িতে দুধ কলা, ফল, মাছ, মাংস কত কি খেতাম। সকালে পিঁয়াজ পান্তা বা বাসি ডাল দিয়ে পান্তা খেতে বেলা দশটা বেজে যায়। তার মধ্যে ঝাঁটপাট, নিকোনো, গোয়ালকাড়া, মুড়িভাজা। আমাকে ঢেঁকিতে ধান ভানতে হয় পাড়ার একটা বিধবা মেয়ের সঙ্গে। শাউড়ি সেঁকে দেয়। চাল পাছড়ায়। খুদ কটা দেয় বিধবা মেয়েটাকে। যাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভানতে হয়। খড় কুচোতে হয়। দুপুরের রান্নার সময় হাল করে মাঠ থেকে ফিরে যদি দেখে জাবনা দেওয়া হয়নি গরুদের তখন গালি-গালাজ করে। দু-দিন আমাকে মেরেছে। একদিন পাঁজরে এমন ঘুঁষি মারলো আমি পড়ে আছাড-কাছাড় করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতে শাউড়ি মাথায় পানি চাপড়ে জ্ঞান ফেরায়। আমাকে তুই নিয়ে যেতে বলিস। এমন স্বামীর ঘরে আমার দরকার নেই। রোজ তিনটে গাইয়ের এক বালতি দুধ হয়, একপলাও রাখে না, সব 'গয়লা'কে দিয়ে দেয়—সে তালপাতায় পেরেক দিয়ে আঁকর কেটে লিখে দিয়ে গেলে আকাট মুর্খ শ্বশুর আমাকে পড়িয়ে দেখে ঠিক আট সের তিন পোয়া লিখেছে কিনা। শাউড়ি একদিন বলেছিল, বউমার পেটে খেসারি ডাল, থোর কচু, পাটশাক, সজনেশাক, পুঁইশাক সহ্য হয় না—খানিকটা দুধ রাখলে হয় না ? অমনি শ্বশুর বললে, তাহলে ওনার বাপকে একটা গাইগরু দিয়ে যেতে বলো। বাপও তো বড়লোক, 'গোল' ভর্তি গরু-বাছুর আছে।'

আলি আনসারকে রাত্রে শুতে দেওয়া হলো বাইরের বৈঠকখানায় একটা খেজুর চাটাইয়ে ময়লা কাঁথা-বালিশ পেতে। মশারির বারো কোণ বাঁধা। ছেঁড়ার মধ্যে দিয়ে মশা ঢুকে গা-হাত ফুলিয়ে দিতে থাকলে উঠে বসে থাকে আলি আনসার। গরমে ঘামতে থাকে। একটা পাখাও নেই।

সকালে উঠেই সে চলে যেতে চাইলে জোবেদা খাতুন চোখ মুছে মুছে কাঁদতে থাকে। শাউড়ি বলে, 'গোটাকতক মুড়ি ধুয়ে গুড় দিয়ে দাও বউমা, খালি 'প্যাটে' আট-ন মাইল রাস্তা যাবে ?'

হাল-গরু মাঠে নিয়ে যাবার সময় আজিত সেখ বলে গেল, 'আমার শ্বশুরকে এসে তার মেয়েকে লিয়ে যেতে বলো—অমন আঁতরোগা মেয়েকে আমার দরকার নেই।'

আলি আনসার বলেই ফেললো, 'আঁতরোগা তো আসেনি দুলাভাই। খেসারি ডাল বেশি দিন খেলে জণ্ডিস হয়ে মারা যায় মানুষ। ওর ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই। চিকিৎসা করাও। রক্তআমাশা হয়ে গেছে। মারা যাবে যে।'

আজিত সেখ গজ গজ করে উঠলো লাঙল কাঁধে নিয়ে, 'চিকিচ্ছে করার টাকা দিয়ে যেতে বলো, নাহলে লিয়ে যাও পালকি এনে।'

আজিত সেখ বাঘের মতো ক্রুদ্ধ চোখের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গ্রীষ্মকালের রোষকষায়িত চোখ মেলে তাকানো সূর্যের আলোয় মাঠের পথে নেমে গেল। বাঁশবনের মধ্যে ছাতারে পাখিরা নাচানাচি করছিল, খঞ্জনবোড়া কচুর লাল-হলুদ পাকা ফল খেতে খেতে আজিত সেখের গরু তাড়ার হাঁক শুনে কল-কাকলি তুলে ফুরফুরিয়ে উড়ে চলে গেল। বাহার সেখ তখন বাইরের দলিজে পাঁচসেরি পাল্লায় খদ্দেরকে ধান মেপে দিতে ব্যস্ত। গোলা থেকে ধান পেড়ে ধামায় করে বয়ে দিয়ে আসছে শাউড়ি মাজেদা বিবি। তার ষোলো বছরের মেয়ে বাহারণ উঠেছে গোলায় গামছা পরে। গোলায় এরা সন্ধ্যেবেলা আলো দেখায়, সালাম করে পুজো করার মতো। রোগ নিয়ে বা বাসি কাপড়ে গোলা ছুঁতে দেয় না জোবেদাকে।

জোবেদা তখন বাইরে থেকে এসে ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়েছে। আলি আনসার মুড়ি খেয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল, জোবেদা তাকে ভেতরে ডাকলে খুব আস্তে খিনখিনে গলায়। কাছে গেল আলি আনসার। ঘরের মধ্যে আলো-আঁধারি। পিছনদিকে জানালা নেই। বাঁশের মাচায় একদিকে হাঁড়ি-পাতিল ভরা। তক্তাপোষের নিচে পিঁয়াজ ঢালা আছে। উগ্র পচা গন্ধ। দেয়াল-আলমারির মধ্যে কয়েকটা 'চিনির পেয়ালা' (চীনা মাটির পাত্র) কাপ, পিরিচ, ছিলিমচি, গোলাপদানি। বাঁশের ভারায় জোবেদার শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ ঝুলছে।

আলি আনসারকে পাশে বসালো জোবেদা। হাত ধরে হাতটা তার মাথায় রাখলো। চোখের জল মুছতে লাগলো। দুজনে এক জায়গায় এক বিছানায় মানুষ হয়েছে। বছর তিনেকের বড় আলি আনসার। সেও কাঁদতে থাকে।

শাউড়ি মাজেদা বিবি একসময় গজগজ করতে থাকলে আলি আনসারকে নিয়ে উঠে পড়ে জোবেদা খাতুন।

আলি আনসার মাঠ পার হয়ে বহুদূরে চলে যায়। জোবেদা বাঁশবনের নিচে খড় নিয়ে গরুরগাড়ি নামা পথে ঠায় দাঁড়িয়ে চোখ মোছে। তারপর আর যখন দেখা যায় না আলি আনসারকে—তাল-খেজুর-বাবলা গাছের আড়ালে লি-লি-করা মাঠের ওপারে মিলিয়ে যায়, তখন জোরে বারকয়েক ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কপালে হাত মেরে এসে ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

শাউড়ি বলতে থাকে, ফুফুতো (পিসতুতো) ভাইকে দেখে পীরিত উথলে উঠলো বুঝি! থালা-ঘটি বাসি পড়ে আছে, ঘরদোর 'ওলোল' করতেছে। ক'দিকে মুই যাবো? বাহারণ, তুই গোলাটা কেড়ে দে মা। ধান সেদ্ধ হচ্ছে। 'এগনে'তে (উঠোনে) গোবরগোলা টেনে দিয়ে সেদ্ধ ধান ঢালতে হবে।'

জোবেদা খাতুন উঠলো এবার। থালা ঘটি বার করে নিয়ে ঘাটে গেল। থালা-বাসন মেজে ধুয়ে তুলে আনার সময় তার মাথাটা ঘুরে গেল। সমস্ত ঝনঝন করে পড়ে গেল।

মাজেদা বিবি ছুটে এলো। গালাগালি করতে লাগলো। থালাঘটি কুড়িয়ে ধুয়ে নিয়ে চলে গেল। বলতে বলতে গেল, 'ভায়ের কাছে কেঁদে সোহাগ করে এখন ঢং ধরেছে! গা ধোবার ছলনা!'

জোবেদা খাতুন ভিজেকাপড়ে ঘাটে বসে বসে কাঁদতে লাগলো। ঘাটের খোঁটায় তার কোমরে লেগে গেছে। কনকন করছে।

অথচ জোবেদা খাতুনের চোখ দুটো ছিল অসাধারণ সুন্দর। নাকটা খাড়া আর মাথার দিকে ঈষৎ বাঁকা—ঠিক তার দাদির (ঠাকুরমার) নাকের মতো। মাথাভরা দীর্ঘ চুল। রঙটা ছিল ললিত শ্যাম। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল সে। চমৎকার আসন বুনতে, নকসি কাঁথা সেলাই করতে পারতো। বাপও তার কৃপণ। বড় চাষী, কত বিঘে সম্পত্তি আছে। মেয়ে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে থাকতে পারবে কিনা তাই তার লক্ষ্য। জোবেদার মা মারা গিয়েছিল তাকে কোলের ছোট্ট বাচ্চাটি রেখে। তারপর বাবা আবার বিয়ে করে আনলো। জোবেদার আগের ভাই-বোনগুলো মারা গিয়েছিল। তার মাকেও তার বাপ এমন মারতো—নাকি ছেঁড়া কাঁথার রক্ত কুকুরে চাটতো। এক হাজার নগদ টাকা তিন ভরি সোনা আর থালঘটি কাপড়চোপড় দিয়ে মেয়ে বিদায় করে এখন নিরাপদ হয়েছে তার বাপ ইম্তাজ মোল্লা।

ভাগ্নের কাছে খবর শুনে রাগে একদিন সে মেয়েকে নিয়ে যেতে একেবারে পালকি এনে হাজির করলো। বাহার সেখ বেয়াই খুব রগচটা আর জমি-জায়গার মালিক, খানিকটা লেখাপড়া জানা চোকশ লোক জেনেই চুপচাপ থাকলো। নইলে বলতো, 'একেবারে পালকি? দিন ঠিক করা হলো না? মর-মর রোগীকে কি গেরস্থর অমঙ্গল ঘটিয়ে বার করে নিয়ে যেতে এয়েছো?'

মেয়েকে দেখে ইম্তাজ মোল্লা বললো, 'এই রকম হাল হয়েছে মা তোর?

আর রাতদিন খেসারি ডাল খেলে কী হবে! ওষুধপথ্য বুঝি মোটেই 'প্যাটে' পড়েনি? লে, কাপড়-চোপড় 'পিঁদে' লে।'

জামাই আজিত সেখ মাথা হেঁট করে গরুর খোঁটা চাঁছছিল উঠোনে বসে। তাকে শুনিয়ে ইস্তাজ মোল্লা বললো, 'জোবেদাকে দিনকতকের জন্যে লিয়ে যাই বাবা। চিকিচ্ছে না করালে মারা যাবে। গায়ে একদম রক্ত নেই।'

আজিত সেখ বললো, 'লিয়ে যাও। রোগ সারলে আবার দিয়ে যেও— আমরা আনতে যেতে পারবুনি।'

রাগ হলো ইস্তাজ মোল্লার। বলতে গেল, 'মানুষের চামড়া তোমার বাপের গায়েও নেই, তোমার গায়েও নেই!' কিন্তু থামোস খেয়ে গেল। মেয়ে দিয়েছে। কথা শোনালে মেয়ের যন্ত্রণা হবে। মারধর করবে। তাই বললো, 'তুমি যেও বাবা, দেখে এসো।'

জোবেদা খাতুন পালকিতে উঠে গেল শাউড়ির হাত ধরে এসে। পাড়ার মেয়েরা দেখতে এসেছিল। এক বুড়ী মেয়ে গলা খাটো করে ইস্তাজ মোল্লাকে বললো, 'মেয়েকে ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারলি নি র‍্যা ব্যাটা! পার করতে না পারতিস, গলায় কলসী বেঁধে দরিয়ায় ডুবিয়ে দিতে পারতিস! চামারের ঘরে মেয়ে দিলি? এক পয়সার 'সাবু-বাল্লিট' খাওয়াবে! একটা ট্যাবলেট কিনবে!'

বাহার সেখ দেখা করে বেয়াইকে বলতে লাগলো, 'কখন মুই যাবো 'বেই' মশায়। পাকাবাড়ির 'বনেদ' খোলা হচ্ছে। সামনে 'তলাপোড়ে' করার কাজ। পাট ফেলা হচ্ছে। লঙ্কা, তরমুজ, কাঁকুড় ফুটিক ক্ষেতে তছরুপ হয়ে যাচ্ছে। কে রাত জেগে চর দিতে যাবে?'

'যা হোক জামাইকে যেতে বলো একদিন।' পালকি তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে। ইস্তাজ মোল্লা বুট পায়ে ধুতিতে মালকোঁচা মেরে প্রায় ছুটতে থাকে। কাপড়ে তার 'ওকড়া' বেধে যায়। ছাড়িয়ে ফেলে দেয়। ফিঙে পাখি বাবলা গাছের বাসা আক্রান্ত হবার ভয়ে চেঁচামেচি করছে। ইস্তাজ মোল্লা দেখে, বেরুন্দ একটা দাঁড়াস সাপ পাখির বাচ্চা খাবার জন্যে গাছে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে। ঢিল ছুঁড়ে সে ছেলেবেলার অভ্যাসেই তাড়া করলো। সাপটা 'লতাস' করে পড়ে গিয়ে ছুট মারলো এঁকেবেঁকে খেজুর বনের দিকে।…

বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর জোবেদা খাতুন সেরে উঠলো। মাস খানেক পরে আজিত সেখ একবার এসে দেখে গেল। জোবেদা জানালো সে সব কিছু এখন সিদ্ধ খায়, টনিক খায়, হপ্তায় একটা মুরগি বাচ্চার স্টু খায়। এসব কি বাপ দিতো? বুড়ো ঋষি ডাক্তার এসে খুব 'ফজুতি' (বকাবকি) করেছেন। তাঁর ভাগচাষের জমি চাষ করে। তাই কথা শুনতে হয়েছে।

আজিত সেখ জানালো, তাদের পাকাবাড়ি গাঁথা হচ্ছে। নিচে দু'কামরা, ওপরে দু'কামরা। মাঝখানে সিঁড়ির ঘর। ভাই ওয়াজেদ মাধ্যমিক পাশ করেছে।

আরো মাসখানেক চিকিৎসায় থাকার পর জোবেদা খাতুন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। রোদে থাকলে এখন তার গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে।

আজিতের ছোট ভাই ওয়াজেদ এসে জোবেদাকে নিয়ে গেল। সে বাপ ভাইয়ের মতের বিরুদ্ধে। চুরি করে ফল দুধ মাছ ডিম খায় মায়ের সাহায্যে।

বাড়ি করার আগেই বাহার সেখ মেয়ে বাহারণকে বিদায় করতে চাইলো যা হোক একটা মাঝারি গরিব ঘরের ছেলেকে দেখে। কারণ বাড়ি হলে কামড় ধরবে বড়লোকের মেয়ে বলে। তাই-ই করলো সে। জামাই খড় কিনে নিজের গরুরগাড়িতে বোঝাই করে পনেরো মাইল দূরের কেরোসিন ডিপোতে দিয়ে আসে। রোদে খেটে তার চুলগুলো লালচে, চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। মুখে দু-চাকলা মেছেতা দাগ। তার মা নাকি জাঁহাবাজ মেয়ে। সাত নিকের পর এই শেষ গুড়ুন্ত কোল-পোঁছা ছেলে। তার বাপ নাকি বার দরিয়ার হাঁড়িভাঙা দ্বীপে শুকো ধরতে যেয়ে বিষাক্ত সাপের কাঁটায় পা পচিয়ে এসে ছ'মাস বিছানায় পড়ে থাকার পর মারা যায়।

জোবেদা খাতুনের জন্য একপোয়া করে দুধ বরাদ্দ হয়। তাও বড় ছেলে বাপকে দামটা ফেলে দেবার কথা বলেছে। সেটা নাকি শ্বশুর দিয়ে দেবে। দেওর ওয়াজেদের যুক্তিতে জোবেদা তার সঙ্গে চুরি করে ঝালশূন্য কলা-পেঁপে-মাছের তরকারি খায়। স্টোভ এনে ওয়াজেদ চুরি-করা ডিম সেদ্ধ করে খাবার সময় বৌদিকেও খাওয়ায়।

এতদিন পরে জোবেদার মনে সুখ-আনন্দ উঁকি মারে। তার মনে সন্তান-কামনা জাগে। কিন্তু যখন পাকাবাড়ি প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে, দুধের টাকা না পাওয়াতে তার দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সন্দেহ করাতে দেওরের সঙ্গে মেলামেশা, লুকিয়ে আলাদা খাওয়া-দাওয়াও চুকে গেল। আবার সেই খেসারি ডাল আর পুঁইশাক থোর-কচুর ঝাল তরকারি খেতে খেতে পেটের রোগে পড়ে জোবেদা খাতুন।

আবার সে রুগ্ন কাহিল রক্তআমাশার রোগী হয়ে শয্যাশায়ী হলে আজিত সেখ বলতে থাকে, 'আমি আবার বিয়ে করবো। কালো আঁতরোগা মেয়ে দেখে চামার বাবা বিয়ে দিলে চামারবাড়িতে। দুধের দামটা দেবে বলেও দিলে না। বলে, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে খাবে তার খরচা কে কবে দিয়েছে? ভুলিয়েভালিয়ে পীরিত করা!'

জোবেদা খাতুনকে আবার আনা হলো ডুলিতে করে। একটা লম্বা বাঁশের নিচে বাঁখারির ত্রিভুজ-ঘেরা ঘর হলো ডুলি। নারকেল-দড়ির আসন। শাউড়ি একটা কাঁথাও পেতে দেয়নি। আলি আনসার তাকে নিয়ে এলো। দুপুর রোদে মাঠের মাঝখানে খেজুর ভেড়ির ওপরে ক্লান্ত বেহারা দুজন ডুলি নামিয়ে গামছার হাওয়া খেতে থাকলে আলি আনসার জোবেদার কাছে আসে। জোবেদা তার হাত ধরে। দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে তার। কিন্তু ঠোঁটে তার কেমন যেন এক আনন্দ-বিষাদের হাসি। বললো, 'আমাকে

একটু পানি খাওয়াতে পারো আলিভাই ? আমার যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বড্ড পিপাসা।'

খানিকটা দূরের একটা জলাশয়ে জল ছিল। ধারে ধারে লাল কাঁকড়া। আর চেঁচকো, পাতি ঘাসের বন। একহাঁটু জল। স্বচ্ছ সুন্দর। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কিন্তু জল নিয়ে যাবার পাত্র তো কোনো কিছুই নেই। অনেক দূরে মাঠের শেষে পল্লীতে হয়তো কলাগাছ আছে। কাছে-পিঠে হলে কলাপাতায় করে জল নিয়ে যেতে পারতো। জোবেদা খাতুন খুবই পিপাসার্ত। দুর্বল শরীর। শেষকালে আলি আনসার এক বুদ্ধি করলো। তার গোটা কোঁচাটা খুলে ভিজিয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো। কোঁচার কাপড় নিংড়ে জোবেদার গালে জল ঢেলে দিতে থাকলে বেহারা দুজন বলতে লাগলো, 'হাঁ ভাই, খুবই কাহিল রোগী নাকি ? যেতে যেতে কোনো কিছু হয়ে যাবে না তো ?'

'না না—' হাসলো আলি আনসার।

ডুলি আবার চলতে লাগলো। আলি আনসারের ভিজে কাপড় শুকিয়ে গেল। ডুলির ভেতরে দুলুনি লেগে ঘুমিয়ে পড়লো জোবেদা খাতুন নাড়ু হয়ে শুয়ে পড়ে থেকে।

আলি আনসারের সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে অসুস্থ জোবেদা খাতুন পিপাসা দূর করার পর তার হাতে পরম আদরে চুমো খেয়ে দিয়েছে। তার চোখে যেন মরণের হাসির ঘোর লেগেছে আজ কী রকম!

বাপেরবাড়িতে আবার চিকিৎসার জন্য এলেও এবার আর আগের মতো চিকিৎসা হলো না। ঋষি ডাক্তার তখন মারা গেছেন। ইন্তাজ মোল্লাদের চার ভায়ের সংসার ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে। জোবেদার সতীন-মা নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত। সে বলে, 'মেয়েটা একেবারে অপয়া। পাকা বাড়ি হলো, কপালে সুখ জুটলো না। স্বামী আবার বিয়ে করে বসলো!'

আলি আনসার ছোট ভাই আর বিধবা মাকে নিয়ে তখন তার বাপের ভিটেয় চলে গেছে। দু'কামরা টালির বাড়ি তৈরি করেছে মাটির দেয়াল দিয়ে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে। জোবেদা জানে তার বিধবা পিসির গতর খেঁতো হয়ে গেছে ভায়ের বাড়ির দাসীবৃত্তি করতে গিয়ে।

জোবেদা খাতুন বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে থাকে। তার স্বামী আবার বিয়ে করলো!

আরো মজার সংবাদ, জোবেদা খাতুনের বাবা ইন্তাজ মোল্লা তার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় কন্যার সঙ্গে জোবেদার দেওর ওয়াজেদের বিয়ের কথা সাঙ্গ করেছে। জামাই যে বিয়ে করেছে আবার সেটা যেন কিছুই নয়। মেয়েকে তো তালাক দেয়নি। আজিত বলেছে, সেরে উঠলে আবার যেতে পারে জোবেদা খাতুন। বাহার সেখ মারা যাবার পর দু'ভাই এখন আলাদা। জমিজমা বখরা হয়ে গেছে। ওয়াজেদ খায় ভালো। বেশি করে মাংস কিনে খায়। মা থাকে তার সংসারে। রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি পেয়েছে ওয়াজেদ।

কাজেই ফরসা চেহারার দেখতে ভালো বোন হারেসার বিয়ে হয়ে গেল আবার জোবেদার শ্বশুরবাড়িতেই।

জোবেদার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। মরার আগের দিন সে হঠাৎ প্রদীপের শিখার মতো একবার জ্বলে উঠলো। বললো, 'ওগো তোমরা কেউ একবার আলি আনসারকে আমার সঙ্গে দেখা করতে খবর দেবে? মরণ-সময়ে তাকে যদি আমি একবার চোখের দেখা দেখে যেতে পারতাম! সে যদি আমার গালে তেমনি করে পানি দিতো এসে—যেমন করে মাঠের মাঝখানে ধুতির কোঁচা ভিজিয়ে এনে দিয়েছিল ..'

কিন্তু জোবেদার সে আশা মেটেনি। আলি আনসার এ সংবাদ পায় অনেক পরে—যখন জোবেদা মারা গেছে। সে তখন পার্ক সার্কাসে থাকতো। জোবেদার মৃত্যুর একদিন পরেই সে বাড়িতে ফেরে। তার মা জানায় মরণকালে তাকে দেখতে চাওয়ার কথা।

আলি আনসার স্নান করে পবিত্র হয়ে মামার বাড়ির গ্রামের কবরখানায় গেল। চারদিকে বনজঙ্গল। বিরাট শ্বেত শিমুল গাছ। আকাট জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর কাঁটাঅলা বৈঁচি গাছ। জোবেদার সঙ্গে দুপুরে কতদিন পাকা বৈঁচি তুলতে এসেছে।

শিয়ালে খানিকটা মাটি খুঁড়ে ফেলেছিল জোবেদার কবরের মাঝখানটায়। আলি আনসার তা বন্ধ করে দিলো। দোয়া পড়ে তিন মুঠো মাটি দিলো কবরে। বনকেওড়া আর আকন্দ ফুল ফুটেছিল অনেক। ছিঁড়ে এনে কবরের ওপরে রেখে দিয়ে চলে এলো।

মানিকজোড়

মুখ-আঁধারী সন্ধে নামার আগে—সূর্য যখন সারাদিন ধরে আগুন ওগরাবার পরে সবে তেজ হারিয়ে পাটে বসেছে ক্লান্ত মহাবীরের মতো—রক্তলাল রঙ মলিন হতে শুরু করেছে—পাখির দল ফিরে চলেছে কুলায়—ঠিক তখনই রহমত ডাক্তার লক্ষ্য করেছেন একজোড়া শামুকখোল লম্বা-করা হলদে পা ঝুলিয়ে বসেছে শ্বেতশিমুলের ডালে। নির্জন কবর ডাঙার আকাট ঝোপ-জঙ্গল শ্বেতশিমুল গাছের তলায়। দুর্ভেদ্যপ্রায় কাঁটা ঝোপের মধ্যে পাম্পশু পায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা রহমত ডাক্তার তাঁর কালো চকচকে বড়সড় চেহারায় তরতর এগিয়ে যান বন্দুক হাতে নিয়ে। হাতে তাঁর ঘড়ি, সোনার আংটি, মুখে চুরুট। পাখি-মারা ঝোলা হাতে

ষোলো বছরের ছেলে জবা তাঁর পিছু পিছু ঘুরছে কেবল বন্দুকের কার্তুজের খোল সংগ্রহের জন্যে। জবার ছোট পিসির মেজো ভাসুর রহমত ডাক্তার। এসে উঠেছেন ভায়ের শ্বশুরবাড়ি। শ্যামগঞ্জের বড় সরদারের ছেলে, দোতলা পাকাবাড়ি—যে বাড়ি চটকলের ম্যানেজার মিচেল সাহেব তৈরি করে দিয়ে গেছেন বড় সরদার সুজাউদ্দিনকে ভালোবেসে—সেই বাড়ির আদরের দুলাল রহমত আলি এ্যালাপাথিক ডাক্তার। কত রোগী হয় তাঁর বাড়ির দরদালানে রোজ। খলনুড়ি নেড়ে নেড়ে নিজের হাতেই ওষুধ তৈরি করে দেন। চটকলের হাসপাতালে সাহেব ডাক্তারের কাছে তালিম নিয়েছেন দশ বছর—পাশের চাইতেও তা অনেক বড়। একথা মাথা নেড়ে নেড়ে ঠোঁট উলটে অতি বিশ্বাসে বলেন ইশ্তাজ মোল্লা—জবার বড় মামা। তাই মামার বাড়ি থেকে পাঁচটা ফরমাসে সব সময় জবাকে দরকারে লাগলেও রহমত ডাক্তারের 'পেলোমী' করতে ডাকলে বড়মামা সায় দেন, 'যা যা. পাখি গুড়িয়ে আনবি, কবরস্থানের দিকে ডাক্তার সাহেবকে লিয়ে যা— মেলাই পাখি আসবে সেখেনে সাঁজবেলা।'

সেঁয়াকুল, বৈঁচি, সোনাকাটা ছাড়াও ভয় আছে চন্দ্রবোড়ার। বড়মামার মেয়ে জোবেদার সঙ্গে দুপুরে গরুকে মালিকদের ডোবা থেকে জল খাইয়ে বাবলা গাছের ছায়ায় বেঁধে রেখে জবা কবরস্থানে পাকা বৈঁচি তুলতে ঢুকেছিল কোঁচড় ভরে। মালা গাঁথবে পা পর্যন্ত। বকুল গাছে উঠে গোলঞ্চলতা ছেঁড়ার সময় হঠাৎ জবার চোখে পড়েছিল তিন-চারটে চন্দ্রবোড়া মানুষের সাড়া পেয়ে ভাঙা কবরের মধ্যে ঢুকে গেল। তখন ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে দু'জনে গলা-ধরাধরি করে ভূত আর চন্দ্রবোড়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে পায়ের দিকে চোখ রেখে রেখে পালিয়ে আসে। এখন রহমত ডাক্তার বন্দুক হাতে নিয়ে একাই ঝোপ গলে গলে শ্বেতশিমুলের গোড়ার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে তাক করছেন শামুকখোল দু'টিকে। শকুনের মতো বড় পাখি। হাড়গিলে গলা। মানিকজোড়ের মতো হলদেটে লম্বা ঠোঁট। একটাতেই একমালসা মাংস হবে। মাছ-খেকো শিকারী পাখি। বেশি উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে পারে না। গায়ে চর্বি আর মাংস আছে।

গুড়ুম করে আওয়াজ হলো। একটা শামুকখোল 'বুনুটি' লাঠির প্যাঁচ ঘোরানোর মতো ঘুরতে ঘুরতে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল খানিকটা উড়ে যাবার পরে। আর একটা কক্ কক্ শব্দ তুলে বিষ্টু মোড়লদের নারকোল বাগানের দিকে উড়ে পালালো। জবা ছুটে গেল মাঠের ওপরে পড়া পাখিটাকে আনতে। তুলে ধরলো ঠ্যাং ধরে। ঠোঁট দিয়ে গড়গড় করে টাটকা কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে। রহমত ডাক্তার ঝোপ-জঙ্গল চিরে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে চাকু বার করে জবাই করে দিলেন। বললেন, 'যাক্, তবু আশার অর্ধেক হলো। জোড়াটাও ছিটে ছররায় জখম হয়েছে। সারারাত ডাকবে।'

আকন্দ ঝোপের মাথায় ফুলের বাহার। আর একটু আঁধার নামলে সাদাটে ঝোপটাকে রাজা রামমোহন রায়ের মতো দেখাবে।

চুরুট জেবলে টেনে ধোঁয়া বার করে এবার খোশমেজাজে হাঁটতে হাঁটতে রহমত ডাক্তার বলেন, 'মানিকজোড়ের একটাকে মারলে আর একটা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে মারা যায়। ঠোঁটে ধারালো অস্ত্র থাকা সত্বেও তখন তাকে ছেলেরা যে কেউ ধরে নিলেও উড়ে পালায় না। সে যেন মৃত্যুই কামনা করে। সেইজন্যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব বেশি মিল দেখলে লোকে ঠাট্টা করে বলে মানিকজোড়।'

ছাতারে, শালিক, গো-বক, গাংশালিক এসব মারেন না রহমত ডাক্তার। কার্তুজের দাম আদায় হবে না। এদের মাংসও সিটে। গো-বকের মাংস দেয়ালে পা দিয়ে ছিঁড়তে হয়। বড় মাছরাঙা, হরিয়াল ঘুঘু, ডাহুক, মানিকজোড়, শামুকখোল, কাদাখোঁচা মারেন। এদের মাংস কিছুটা নরম। পায়রার মাংসও খাওয়া যায়। তবে পায়রা হত্যা করতে মায়া লাগে নাকি রহমত ডাক্তারের।

জবা প্রশ্ন তোলে, 'আচ্ছা ডাক্তার খালু (পিসেমশায়), পায়রা জবাই করার সময় মায়া লাগে আর অন্য পাখির বেলায় মায়া লাগে না কেন?'

বড় বড় চোখ মেলে হাসেন ডাক্তার। বলেন, 'মাংস খাবার দিকে যখন লোভটা বেশি পড়ে তখন হাঁস-মুরগি-খাসি-গরু পেলে মায়া বসলেও কাটা হয়। কিন্তু যেসব পাখি উপকার করে না, মেরে খেতে মায়া হবে কেন?'

'তাহলে কাক, শকুন টিয়া, হাঁড়িচাঁচা খাবে না কেন?'

'যেসব পাখি শিকার করে খায়, ঠোঁট বাঁকা—তাদের খেতে নেই—শরিয়তে নিষেধ।'

সন্ধ্যার পর রহমত ডাক্তার মাদুর পেতে দিতে বসে বন্দুক সাফ করার পর চা মুড়ি বেগুনভাজা, ডালের বড়াভাজা খেতে খেতে সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়ে কত রকম পাখি শিকার করেছেন তার গল্প বলেন। ছেলেদের আর পড়াশুনো হয়নি সেদিন।

সাত বিঘে ধানজমি ভাগচাষে দেওয়া আছে, রহমত ডাক্তার ধান ঘড় নিতেই এসেছেন হাজী-হয়ে-আসা বড় সরদার বাবার ফরমাশে—তার মধ্যে একটু কুটুম্বিতে করে যাওয়াও। মেয়েরা পিঠেপানি করছে। নারকেল দুধের পোলাও আর মুরগি রান্না করছে আড়-ঘোমটা টেনে রান্নাশালার মধ্যে। খাঁটি তেল ঘি মশলার খোশবু বার হচ্ছে।

ইন্তাজ মোল্লা একসময় বলে দেন, 'সাত বিঘের সত্তর মণ ধান আর সাড়ে দশ কাহন ঘড় হয়েছে মেজদা। অর্ধেকটা কাল গরুর গাড়িতে করে পাঠাবো। আপনি তো সাইকেলে যাবে। জমিটা এবার হাজী সাহেবকে বেচে দিতে বলো। সাতবিঘে সাতশো টাকা দাম।' ডাক্তার বললেন, 'আমারও তাই মত। আব্বা বলেন, জমি বেচবো মুই? কত কষ্টের জমি জানিস? তালপাতার কুঁড়েয় বাস করতুম। মাটি থেকে বর্ষায় কেঁচো উঠতো। মানপাতা মাথায় দিয়ে কলে

যেতাম। নেহাত ইংরেজ সাহেবের চোখে পড়ে গেলুম, তাই বড় সরদারি জুটে গেল।'...

রহমত ডাক্তার কালো চেহারার মানুষ হলেও ভারি সুন্দর খাড়ানাক আর পটলচেরা চোখ তাঁর। সৌখিন মানুষ, দামী তেল-সাবান মাখেন। দামী দামী জামা-কাপড়-জুতো পরেন। তিনি হাসি মাখিয়ে সবসময় কথা বলেন। বলতে লাগলেন, 'আত্মীয়-কুটুম্বকে ভাগচাষী বানালে তাদের মান যায়। অবিশ্বাস দাঁড়ালে মন-ভাঙাভাঙি হয়ে যায়! আপনাদের মেয়েকে কথা শুনতে হয়। ঠিক আছে, বিক্রি করার কথা আমি বুঝিয়ে বলে দেখবো।'

আহারাদির পর রহমত ডাক্তার ইম্তাজ মোল্লার কাছে নানারকম সাংসারিক গল্প করছিলেন। তারপর স্ত্রীর অসুখ-বিসুখের কথা তুললেন। ডাক্তারের কাছে আনলেন আড়ঘোমটা টানা বউকে। পেট-হাত-জিভ দেখার পর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন ডাক্তার।

মেয়েরা হাঁড়ি-পাতিল গুটিয়ে আলো নিভিয়ে যে যার ঘরে শুতে চলে গেল কিন্তু ইম্তাজ মোল্লা ডাক্তারের বিছানার পাশে বসে কেঁড়ে-নালি চালিয়ে জাল বুনতে বুনতে সাহেববাড়ির গল্প শুনতে লাগলেন। রহমত সাহেব মোটা গদির আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে বলতে লাগলেন, 'আব্বার ভাগ্যটা যেন কাঙালের হঠাৎ-মেলা-ধনরত্ন কুড়িয়ে পাবার মতো। শ্যামগঞ্জের চটকলে বড় সরদার হয়ে যাবার পর ইংরেজ ম্যানেজার মিচেল সাহেবের বাড়ির লোক হয়ে গেলেন যেন তিনি। বাজার করে এনে দিতেন। মেমের কুকুরকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মিলের বাবুরা তাঁকে অফিসে গেলে সমাদর করে চেয়ার দিতেন পাছে বড় সরদার কারো বিরুদ্ধে সাহেবের কানে কিছু তুললে চাকরি চলে যায়। একবার সাহেব টাকার ব্যাগ ফেলে টমটম ছুটিয়ে কলকাতায় বেরিয়ে গেলে টাকা ভরা ব্যাগটি বড় সরদার রেখে দেন। তার মধ্যে অনেক জরুরী কাগজপত্রও ছিল। সাহেব পাগলের মতো হয়ে ফিরে এসে ব্যাগ খুঁজতে থাকেন। মেমকে ধমকাতেও থাকেন। কেমন করে গাড়ি থেকে ব্যাগটা উধাও হলো জানতে চান। চাকরকে পেটাই দেন। পরদিন বাবা 'সুজো সাহেব' ব্যাগ নিয়ে গিয়ে দিলে সাহেব তাজ্জব হন। গাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় নাকি ম্যানেজার-কুঠির বাইরের পথে ব্যাগটি পড়ে যায়। বাগানের মালিদের কাজ করাতে করাতে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ব্যাগটা বুকে ধরে 'সাহেব বাবা, সাহেব বাবা' বলে ডাকতে থাকলেও ঘণ্টি বাজিয়ে টমটম বেরিয়ে যায়। যাহোক, টাকার ব্যাগ পাবার পর বাবার খাতির খুব বেড়ে গেল। বড় সরদার এক হাঁক দিলেই গোটা মিল বন্ধ হয়ে যাবে। মেমের পা টিপে দিলেও আব্বা তাঁকে মায়ের মতো শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। একবার সাহেবের মেয়ে এমিলি ম্যানেজার-কুঠির বাগানের পুকুরে সাঁতার কাটার সময় ডুবে যায়। এগারো বারো বছরের নাইটি পরা মেয়েকে কাতলা মাছের মতো তুলে এনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেটের সব জল বার করে দেন বাবা—তাতে সে বেঁচে যায়। আমি অবশ্য ইঞ্জেকশন দেওয়া, ম্যাসাজ করার কাজও

করেছিলাম। সাহেব কলকাতার হেডঅফিস থেকে ফিরে সব কথা শোনার পর আমাদের বাপ-বেটার খাতির আর মাইনে বেড়ে যায়। আব্বা যা মাইনে পেতেন তা গোটা মিলের বড়বাবুর চাইতেও বেশি। তিনি একশো পঁচিশ বিঘে সম্পত্তি করেছিলেন বিভিন্ন মৌজায়। ভাগচাষে দিয়েছিলেন জমি। বিঘে তিরিশ চাষ করাতেন নিজে। কারখানা থেকে বদলি শ্রমিকদের দশ-বারোজনকে নিজের ক্ষেতে কাজ করতে পাঠাতেন। বেইমানি বা ঘুষের টাকায় হজে গেলে নাকি উট পিঠে নেয় না। আব্বা চাঁদনিচকের পুকুর কাটাবার সময় এক ঘড়া গিনিসোনা পেয়েছিলেন। ঢোল সহরত করে বিশটা গ্রামের লোককে খানা খাইয়ে দিলেন। শালতিতে দই জমিয়েছিলেন। জিনের দৌলতে নাকি রান্নার মাছ-মাংস ভাত-ডাল কোনো কিছুরই টানা পড়েনি।

ইম্তাজ মোল্লা বললেন, 'ওসব গল্প তো জানি মেজদা, আপনার সঙ্গে মিচেল সাহেবের মেয়ের কী রকম ভাব হয়ে গিয়েছিল সেটা বলো।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আর সেসব কথা মনে করিয়ে দিও না বড়ভাই।'

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সাহেব বলতে লাগলেন, 'এমিলির সঙ্গে প্রায়ই আমি গ্রামের দিকে অথবা স্পিডবোটে হুগলি নদীতে বেড়াতে যেতাম। যেদিন সাহেব মেম কলকাতায় কোনো পার্টিতে অথবা বিয়েবাড়িতে যেতেন আমাকে থাকতে হতো। এমিলি পড়াশুনার অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইতো না। এমিলি ভালো বাংলা বলতে শিখেছিল—আমিই তাকে শেখাতাম। আমি তার চেষ্টায় ইংরেজি শিখি। এইরকম অবস্থায় আব্বা আমার বিয়ে দিলেন গ্রামের এক বনেদী মুসলমান বাড়ির কিছুটা বাংলা আরবী লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে। বিয়েবাড়িতে মিচেল সাহেব এমিলিকে নিয়ে এসেছিলেন। এমিলি বউয়ের হাতে দু'গাছা ব্রেসলেট পরিয়ে দিয়ে গেল। সাহেব হার দিলেন। বিয়ের পর একদিন ম্যানেজার-কুঠিতে যেতে এমিলি দেখা করল না। মেম বললেন তার শরীর খারাপ। কয়েক দিন চেষ্টা করেও দেখা পেলাম না। একদিন জানতে পারলাম মিচেল সাহেব চাকরির মেয়াদ চুকিয়ে দেশে চলে যাচ্ছেন। যেদিন যাবেন এমিলির সঙ্গে দেখা হলো। হেসে বলল, 'হোমে চলে যাচ্ছি, আর কখনো দেখা হবে না। মনে রেখো আমাকে।'

আমি কাঁদতে লাগলাম বাচ্চা ছেলের মতো। মেম মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। সাহেবও মাথায় হাত দিলেন। এমিলি খানিকটা আড়ালে সরে গিয়ে চোখে রুমাল চাপলো।

আব্বা কাঁদতে লাগলেন। ওঁরা যখন চলে যাবেন, এমিলির হাত ধরে আমি নিচু হয়ে তাতে চুমো খেলাম। আমার চোখের জল পড়ে গেল তার হাতে। বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো এমিলি। আমি এখানে বাঁচবো না। কেমন করে তোমাকে ভুলবো?' এমিলি চোখের জল চেপে গন্ধমাখা রুমালটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে 'বায়' বলে বিদায় নিল। ঘণ্টি বাজিয়ে টমটম বেরিয়ে গেল। আমার বুকের ভেতরটা পুড়িয়ে দিয়ে গেল এমিলি।'...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহমত ডাক্তার উঠে বসে চুরুট ধরালেন। নারকেল গাছের মাথার ওপরের আকাশে তখন একফালি চাঁদ। বলতে লাগলেন, 'আব্বা তারপর রিটায়ার্ড হলেন। গ্রামের চাষীবাসীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধতে তাঁকে মানুষ পাল্কিতে করে নিয়ে গিয়ে বিচারের জন্য কাজী বা বিচারক করতো। এখন ছাদের চিলেকোঠা থেকে প্রায় নামেন না। নামাজ পড়েন, খান-দান আর ঘুমোন। বড়দা জমি-জায়গা দেখাশুনো করেন। আর পাঁচ ভাই কেউ লেখাপড়া জানে না। সবায়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বোনেরাও বিদায় হয়েছে। আমার একটিমাত্র মেয়ে হয়েছে, ঠিক অবিকল এমিলির মতো দেখতে। তেমনি মেম-ফরসা। আব্বা তাকে খুব আদর করেন। আমার স্ত্রী কিন্তু আমার ওপরে হাড়ে চটা। বলে, 'মনটা তোমার সেই এমিলির কাছে পড়ে না থাকলে আমার পেটে এইরকম মেম-বাচ্চা হয়? কটা চোখ মেয়ে রাবেয়া মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাটা অনুধাবন করতে চায়। কী বোঝে সেই জানে। কিছুদিন পরে এমিলির চিঠি এসেছিল। সে লিখেছিল, স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য শহরে এক রক্ষণশীল পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, কী সুন্দর—কিন্তু তোমার মতো কালো। অবিকল তোমার মতো চোখ-মুখ। একজন নিগ্রো আমাদের বাড়ির চাকর ছিল। তার সঙ্গে আমি ভ্রষ্টা সন্দেহ করে স্বামী মাতাল হয়ে আমার ওপর নির্যাতন চালাতো। একদিন আমাকে খুব চাবুক মারে। তাই ডিভোর্স করে আমার গর্ভজাত কৃষ্ণকায় বাচচাটিকে নিয়ে এখন বাবার কাছে এসে আছি। বাচ্চাটিকে আমার স্বামী জন কেটে ফেলতে চায়। আমি ভাবি, ভারতে যাবো আবার। তোমার কাছে যদি যাই, একটু শান্তির আশ্রয় পাবো না?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি।'

রহমত ডাক্তার এবার ঘুমোবার আয়োজন করলেন। আলো খুব কমিয়ে দিয়ে ইস্তাজ মোল্লা উঠে চলে গেলেন।

সকালে গরুরগাড়িতে ধান নিয়ে সাইকেলে চড়ে রহমত ডাক্তার চলে যাবার সময় ইস্তাজ মোল্লা বললেন, 'মেজদা, এমিলি মেমকে এখানে আসার কথা লিখে পাঠাও—মানিকজোড়ের একটা অতদূরে বসে কাঁদবে, এটা কি ভালো?'

ধানের গাড়ি ঘটর ঘটর শব্দ তুলে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে বন্দুক উঁচিয়ে বাঁশবনের মধ্যেকার একটা মেছোবক মেরে দিলেন রহমত ডাক্তার। তারপর বললেন, 'আমি যখন ওঁদের সঙ্গে বিলেতে চলে যেতে চেয়েছিলাম ওঁরা তো সায় দেননি। আমি ওখানে গেলে আমার জীবনটা অন্য রকমের হয়ে যেতো। এমিলি জোর দিয়ে টানলেই মিচেল সাহেব বা তাঁর মেম বোধহয় না করতে পারতেন না।'

'কিন্তু আপনার ঘরে যে ছিল নতুন বউ!'

'আমি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। আসলে আমরা নিগার

নেটিভ কালো চামড়ার মানুষ, সেটা মন থেকে যায়নি। ওখানের সমাজে নিন্দিত হবেন, তাই।'

ইন্তাজ মোল্লা বললেন, 'কিন্তু মনটা চিরে যখন কালো চামড়ার ছবি ভেসে উঠলো ?'

রহমত ডাক্তার যেন হঠাৎ লন্ডভন্ড হয়ে গেলেন। বললেন, 'আগে তো আমার প্রাণে দয়ামায়া ছিল। এমিলি চলে যাবার পর আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। নিষ্ঠুর হয়ে গেলাম। মদ খেতাম লুকিয়ে লুকিয়ে। বউকে পিটে দিলাম। সমানে সমানে তর্ক করে। আমাকে বলে, এমিলি শুওরখাকির কুত্তা ছিলে তুমি। তার শরীর চাটতে। মনে তোমার এখনো সে শকুনের বাসা বেঁধে আছে। আমার সাথে মিশবে আর তার কথা ভাববে এটা হবে না। তার কাছে চলে যাও তুমি।'

ইন্তাজ মোল্লা রসিকতা করে বললেন, 'ভালো হয় আপনার মেম-ফর্সা মেয়েটা এমিলিকে দান করে তার কালো ছেলেটাকে নিয়ে আপনার স্ত্রীকে দিয়ে দিলে।'

হেসে হাত তুলে চলে গেলেন রহমত ডাক্তার।

পালকি করে হাজী সুজাউদ্দিনকে একদিন আনলেন ইন্তাজ মোল্লা। সাত বিঘে জমির জন্য ৭০০ টাকা দিতে ডেমি কাগজে টিপসই দিয়ে লেখাপড়া করে দিয়ে গেলেন।

বছরখানেক পর হাজী সাহেব মারা যাবার পর বড়দাদা ভিন্ন রহমত ডাক্তারের আর পাঁচভাই চটকলের মজুরি করতে গিয়ে সংসার চালাতে না পেরে জমি-জায়গা বিক্রি করে দিতে থাকে। রহমত ডাক্তারও মূর্খ ভাইদের সঙ্গে বচসা-কলহ হবার পর পৈতৃক পাকা বাড়ি ছেড়ে বন্দুকটা নিয়ে দূরের গ্রামের এক ছিটেবেড়ার বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। জমিজায়গা তাঁরও উড়ে গেল বেশিরভাগ। এখন অল্পস্বল্প উপায় কেবল ডাক্তারিতে। মেয়েকে কলকাতার এক হস্টেলে রেখে পড়াতেন।

মুখে-মেছেতা-পড়া রোগে-দুঃখে-কাহিল-চেহারা রহমত ডাক্তারের স্ত্রী গুলনার বিবি সংসারের দুঃখের কথা জানাতে গিয়ে বলে, 'জমিজমা বেচে তো সেই মিচেল সাহেবের মেয়ে এমিলির গর্ভে ঢালছে গিয়ে প্রতি হপ্তায় তার কেজি স্কুলে। মেয়ে রাবেয়া তারই কাছে থাকে কলকাতার রিপন স্ট্রীটে। এমিলির কালো ছেলেটাকে একদিন এনেছিল। ঠিক যেন ডাক্তারের অবয়ব। ছেলেটার নাম জয়। সে বি-এ পাস করেছে।'

রহমত ডাক্তার কলকাতা থেকে ফিরে আজ হঠাৎ বন্দুকটা পরিষ্কার করতে বসলেন। মুখটা যেন হাঁড়ি হয়ে আছে। হ্যারিকেনের পলতে গোল করে কাটা হয়নি বলে আলোটা শীষ তুলে জ্বলছে। দুঃখের প্রতিমূর্তি গুলনার চা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তারের কাঁচাপাকা দাড়ি বেয়ে চোখের জল গড়াতে দেখে সে যেন হঠাৎ কোনো অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে। পৈতৃক বাড়ি বা

পুকুরের মাছ, বাগানের নারকেল-সুপারির বখরা নিয়ে কলহ হওয়ার জন্যে কোনো ভাইকে খুন করবেন নাকি! বললে, 'কি হয়েছে হ্যাঁগো?'

'জয় পালিয়েছে রাবেয়াকে নিয়ে জোহেনসবার্গে। সাদা চামড়ার লোকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে কালো চামড়ার লোকদের দলে যোগ দিয়ে লড়াই করবে বলে গেছে। আমি এখন কাকে গুলি করে মারবো? তোমাকে, না এমিলিকে, না নিজেকে?'

জীবনের পিপাসা

'আমি একজন ভাগ্যবান বলতে হবে, নইলে আপনার মতো একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি আমার কাছে আসবেন কেন?'

'খ্যাতি-ট্যাতি বাদ দিন। আমি এসেছিলাম উদয়নারাণপুরের আসন্ডা গ্রামে যে ইন্দিরা মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হল সেই উপলক্ষে 'কিংবদন্তী' পত্রিকার উদ্বোধন করতে। আসল উদ্দেশ্য সেটা নয়—এই অঞ্চলের লালচে মাটি, আলু ক্ষেতের দিগন্ত বিস্তার, থালা আলো করা রত্না চালের ধান চাষ, মানুষজন, কৃষির যান্ত্রিক উন্নতি, গাছপালা—এইসব দেখতে। রাত্রে আর হাওড়া কলকাতা হয়ে ফিরতে পারলাম না, মহসীন মল্লিক ভুরিভোজ খাইয়ে তিনতলার ঘরে শীতের শয্যা দিয়ে আরামসে রেখে দিলেন। এখন সকালে নাস্তাপানির পর আপনাকে দেখাতে আনলেন।'

দোতলার একটা সুন্দর সাজানো ঘরে বিছানার ওপর বসেছিলেন আবদুর রহমান সাহেব। বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। সমস্ত চুল কাঁচা। গতদিনের শেভ করা কাঁটার মতো দাড়ি। প্রায় গোলাকার মুখ। দোহারা চেহারা। ফরসা রঙ। দেখতে সুন্দর। নবযৌবনে 'নদের নিমাই' ফিল্মে নেমেছিলেন। ঘরে চারদিকে বইপত্র। টেলিফোন। টি ভি। ইলেকট্রিক আলো, পাখা, মোটরবাইক আছে। দুই ভাই বেকারি বিজনেস করেন চন্দননগর আর কোথায় যেন।

আবদুর রহমান বললেন, 'এইভাবে বসে আছি ভাই বহু বছর। আমার নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। স্ত্রী-সন্তানাদিও আছে।. যখন কলকাতার কলেজে পড়ি সিনেমায় চান্স পেয়ে গেলাম। সেটাই হল আমার কাল। বাবাজী নামাজী মুসল্লি লোক। ভাবলেন বাড়ির বড় ছেলে যদি এমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কী হবে? তিনি গ্রামের একটা মেয়ে দেখে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমাদের জমি-জায়গা আছে। ফসল বিক্রি হয়। সংসারে খাওয়া-পরার অভাব নেই।

আবার অমলেট, টোস্ট, চানাচুর, চা এসে হাজির হল।

'টেলিফোন এখান থেকে করা যায়?'

'ট্র্যাঙ্ককল হয়।' বললেন রহমান সাহেব।

'কীভাবে আপনি পঙ্গু হয়ে গেলেন?'

'একরাত্রে প্রস্রাব করতে বসে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারছিলাম না। যন্ত্রণায় পা দুটো আঁকড়ে ধরল। চিৎকার করতে লাগলাম। স্ত্রী এসে বিছানায় তুলে নিয়ে গেল। সেই থেকে আমার বিছানায় আশ্রয়।'

ডান হাতটা নাড়াচাড়া করছিলেন রহমান সাহেব। যেন একটু ফুলো ফুলো।

'বই পত্র দেখে বুঝতে পারছি আপনি পড়েন খুব—লেখার অভ্যাসকরতে পারেন তো।'

রহমান সাহেব মৃদু হাসলেন।

'চিকিৎসার ব্যাপার কী কী হয়েছে?'

মেজো ভাই আবদুর রহিম যিনি বাইকে চড়িয়ে আসণ্ডার মাঠের সভায় নিয়ে গিয়ে রাত্রে আবার মোটরে করে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বললেন, সবরকম চিকিৎসাই হয়েছে। অ্যালাপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, শরীরবিদ রেখে আসন করা, বড় বড় ডাক্তার এসেছেন কিছুই তেমন ফল ফলেনি। হাঁটুতে ভর দিতে পারেন না। তবে ব্যায়াম করার ফলে ডান হাতটা এখন তুলতে পারছেন—ওটাও ধরে যাচ্ছিল।'

বাইরে লোকজন অপেক্ষা করছে। অন্য জায়গায় যেতে হবে। ১৭১১ শকাব্দের টেরাকোটার কাজ করা আসণ্ডার মন্দির দেখতে যাব।

রহমান সাহেব বিনয়-নম্র হাসিতে সালাম জানালেন। তাঁর করুণ দৃষ্টি ভোলার মতো নয়।

গাড়িতে তাঁর ভাই আবদুর রহিম বলতে লাগলেন, 'বড়দা যখন এইভাবে পঙ্গু হয়ে গেলেন আমরাও সবাই মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে গেলাম। কার অভিশাপে এমন হল? কিসের জন্য? আব্বা কেবলই মাথায় হাত চাপড়ে কাঁদতেন। মা কাঁদতেন। বড়ভাবীর চোখে পানি গড়ায়। তাঁর কষ্টের আর শেষ নেই। প্রথম অবস্থাতেই পি জি হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিন বছর ছিলেন। ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। কেউ বললেন পোলিও, কেউ বললেন পক্ষাঘাত, আবার কেউ বললেন স্নায়বিক ব্যাধি। যাহোক, তিন বছর পরে হাসপাতাল খালি করার জন্য সব রোগীকে উঠিয়ে দিল। যুদ্ধ বেধেছে তখন ভারত আর পূর্ব পাকিস্তানে। আহতদের আশ্রয় দিতে হবে। সেই থেকে বাড়িতে চিকিৎসা চলছে।

'সন্তানাদি আছে?'

'জী হাঁ। একটা বি-এ পাশ করেছে। একটা মাধ্যমিক দেবে। আর দুটো মেয়ে। তারাও পড়াশুনো করে।'

'নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে পড়লেও তাহলে যৌন অক্ষম হননি।'

'জী না।'

পাখি উড়ে চলেছে আকাশ পাড়ি দিয়ে। এদিকে খেজুর গাছ বড় একটা নেই। নারকেল, তাল, করোমচা, দেবদারু, আম, জাম গাছের ভিড়।

আবদুর রহিম বললেন, 'বড় ভায়ের যাতে কোনরকম কষ্ট না হয় আমরা দেখি। ভাবী খুব যত্ন করেন। তোলা-পাড়া করা যায় না বলে বিছানাতেই তিনি কাগজ তুলোর প্যাড পেতে পায়খানা করেন। খুব খরচ হয়।'

'আপনারা ছোট দু ভাই বিয়ে করেছেন তো ?'

'জী হাঁ।'

'দুজনেই তো বাইরে থাকেন, স্ত্রীরা ?'

'তারা বাড়িতে থাকে—সংসারের কাজ তো ভাবীকে করতে দেওয়া হয় না—দাদাকেই দেখেন তিনি। আমরা দুমাস-একমাস ছাড়া বাড়িতে আসি।'

ফিরে এসেছি অনেক দূরে। দিন পনেরো পার হতে চলল। তবু আবদুর রহমান সাহেবের করুণ দৃষ্টিভরা চোখ দুটোর কথা ভুলতে পারিনি।

তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে জানালা দিয়ে। কখনো নীল আকাশ। কখনো মেঘ ভেসে যায়। পাখিরা গাছের ডালে কিচির-মিচির করে। সময় পার হয় না। দিন যায়। রাত যায়। সপ্তা যায়। মাস পেরোয়। বছরও চলে যায়। বছরের পর বছর।

তাঁর মনে হয় মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে তাঁর নিম্নাঙ্গ ডুবে আছে। সেই অন্ধকার ক্রমে ক্রমে উঠে আসতে চায়। যেটুকু আলোকিত জীবনের অর্ধাংশ গ্রাস করতে চায়।

স্ত্রী এসে ওষুধ খাওয়ান। হাত পা ম্যাসেজ করে দেন। খাইয়ে দেন। হয়তো টেলিফোন বেজে ওঠে। ভাই আবদুর রহিম চন্দননগর থেকে ট্রাঙ্কল করেছেন। কেমন আছেন বড়ভাই ?

ভাল আছি।

হঠাৎ তিনি চিৎকার করে ওঠেন স্ত্রীর নাম ধরে। স্ত্রী ছুটে আসেন। তিনি বলেন, 'না, আমাকে ফেলে দাও নিচে। তালগোল পাকিয়ে যাই। এভাবে তো বাঁচা যায় না। কী পাপ করেছি আমি ? আমি তো কিছু পাপ করিনি।'

স্ত্রী শুধু গায়ে মাথায় হাত বুলোন। বলেন, 'ওগো, অস্থির হয়ো না। আল্লাকে ডাকো।'

'কী হবে তাঁকে ডেকে ? পরকালের জন্য ? ইহকাল যার বরবাদ হয়ে গেল পরকাল তার কী হবে ?'

'তোমার খিদে লাগে না ?'

'না। আমার দৌড়তে ইচ্ছে হয়। ছেলেবেলায় যেমন বল খেলতাম। আমাকে তোল, আমাকে হাঁটাও।'

'পড়ে যাবে যে।'

'যাই যাব। গলাটা টিপে মেরে ফেলতে পার না? আমার জন্যে এত কষ্ট করে তোমার লাভ কী? তোমার সুখ নেই—সখ নেই? কোথাও বেড়াতে যাবার আশা নেই? কেন আমার জন্যে তুমি নিজেকে তিল তিল করে নিহত করছ? পরকালে ভাল ফল পাবে বলে? আমি ওসব বিশ্বাস করি না। দুটো হাত ধরে তোমাকে বলছি, একদিন তুমি আমার গলা টিপে মেরে দাও। পারবে না?'

'না।'

'তুমি স্বামীর কথার অবাধ্য? হায়রে!' আবদুর রহমান সাহেব বালিশে মাথা কোটেন।

কখনো হয়তো দেখা যায় তিনি স্থাণুর মতো বসে আছেন আর দুটো চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নামছে।

কখনো তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবছেন পুরনো দিনের কথা। কত স্মৃতি। ঝরা ফুলের মতো তারা স্রোতে ভেসে চলে যায়।

নিচে সংসার চলেছে। মেয়েদের কথাবার্তা। ছেলেদের মারামারি হুল্লোড়। মায়ের খবরদারী। খলৎপুর গাঁয়ের মাটির পথ বেয়ে লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে শত শত লোকের মিছিল গিয়ে ডিহি ভুরসুট উদয়নারায়ণপুর পাকা রাস্তার হাজার হাজার মানুষের মিছিলে মিশে যায়। তারা ধ্বনি দেয়ঃ বর্গাদারদের জমির দখল দিতে হবে—দিতে হবে।'

আবার কখনো হয়তো তিনি দর্শনের কোন বই পড়ছেন আর চিন্তায় মশগুল হয়ে আছেন।

কখনো মনে হয় পৃথিবীটা একটা দ্বীপ বিশেষ। তাতে একা বসে আছেন তিনি। ভেসে চলে যাচ্ছেন।

বড় ছেলেকে ডাকলে সে আব্বার ঐ পঙ্গু চেহারা দেখে নিরাশ মনে তাকায় আর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়ে দুটো আদর কাড়ে। ওদের বিয়ে দেবে ভাইরা। তারা বড় ভাল। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর নামেও সম্পত্তি আছে। স্ত্রীও ভাগ পাবেন। তাহলে দুঃখটা কোথায়?

দোতলার ঘর থেকেই সংসারের হাল ধরে আছেন তিনি। সমস্ত জমি জায়গায় কোথায় কী ফসল হবে, জন ধন লাগবে সবই তিনি নির্দেশ দেন। ডিপ টিউবওয়েল আর শ্যালো আছে, লাল মাটিতে প্রচুর আলু, ধান, কপি, মুলো, পালং, আখ, ঘ্যের কচু, পিঁয়াজ হয়।

তিনি পড়াশুনো করা বিজ্ঞ মানুষ। মিতভাষী বলে সবাই মান্য করে।

যদি তিনি গরিব আতুর হয়ে পথের পাশে পড়ে থাকতেন গামছা পেতে; তার চেয়ে তো অনেক ভাল।

আর তাঁর ভালর জন্যে গোটা সংসারটাই ব্যস্ত। তাদের জ্বালিয়ে নিজে

জনুলে পুড়ে লাভ কী ?

লোভ-লালসা-সুখের তো অন্ত নেই। গ্যেটের 'ফাউস্ট' তো পৃথিবীর সবকিছু সুখ উপভোগ করার জন্য শয়তানের কাছে আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। লোভ-লালসা-কামনার যত রকম উপভোগ্য জিনিস ছিল পৃথিবীতে একদিন সেসব ভোগ তার শেষ হয়ে গেল। শয়তান ঘোষণা করল এবার তার আত্মাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ফাউস্ট বলল, আমার তো এখনো পিপাসা মেটেনি।

কারো পিপাসা কখনো মেটে না। আরো দাও। আরো চাই।

তাই বিক্ষিপ্ত চিন্তা, হতাশা, দুঃখ নৈরাশ্যকে দমন করে পঙ্গু আবদুর রহমান তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত মোলায়েম হন, ভালবাসা ভরা কথা বলেন। কেন না ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না।

তাই আবদুর রহমানের মুখে হাসি, কিন্তু তীক্ষ্ণ সকরুণ দৃষ্টি। যা ভোলা যায় না।

জীবন থেকে নেওয়া

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। ওদুদ সাহেবের বাবা ছিলেন রেলের স্টেশন মাস্টার। দাদা মশায় ছিলেন জজ। বড়মামা থানার বড় দারোগা।

বি এ পাস করার পর যখন ওদুদ সাহেব এম এ ক্লাসের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথের তখন 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত বই বেরিয়েছে। ছুটির ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের ওপরে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। মূলত তাঁর কাব্য বিচার। সেটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সম্ভবত মাস তিনেক বাদে সেই রচনাটি 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রকাশিত হয়ে বেরুবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুক পোস্ট করে সেটি পাঠালেন ওদুদ সাহেবকে।

ফরিদপুরের ছেলে কুষ্ঠিয়ায় মামার বাড়ি গিয়ে জজ সাহেব দাদুর সামনে পড়লেন। আদাব জানাতে তিনি বললেন, 'তুমি তো ইকনমিক্স আর পল সায়েন্সের ছাত্র ?'

'জী হাঁ।'

'তোমার প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধটা পড়লাম। বাংলা ভাষাতেও তোমার বেশ দখল আছে। দাদুর চোখ দুটো বড় তীক্ষ্ণ। দেয়ালের ছবিটায় চোখ পড়তে দেখলেন বাঘের চোখেও অমনি তীক্ষ্ণতা।

জজ সাহেব বললেন, 'তোমার লিভারটা ভাল রাখার চেষ্টা করো যদি

উঁচু জাতের বুদ্ধিজীবী হয়ে বাঁচতে চাও। আচ্ছা ভাবো তো, কোলেমান বাড়ির ছেলে শরীফুল, ওর মা আমাদের বাড়ি দাসী বৃত্তি করত, 'জায়গীর' থেকে বি এ ডিসটিংশন পেয়ে এখন ল পড়ছে। এ বাড়ির ভাল খাবার দাবার না পেলে কি ও এরকম রেজাল্ট করতে পারত?'

ওদুদ বললেন, 'সুযোগের অভাবে অনেক দরিদ্র বাড়ির প্রতিভাবান ছেলে অকালে নষ্ট হয়ে যায়।'

'তবে অন্য কথাও আছে। প্রতিভা কখনো মরে না। দুঃখের হাওয়ায়ও সে আগুনের মতো জ্বলে। চৈতন্য ভাবনায়, প্রতিভার মৃত্যু হয় না, সে শিমুল তুলোর মতো ওড়ে। বাঁশ গাছে জড়ায়, পরে বীজ ফেলে গাছ গজায়। অর্থাৎ তুমি সুচিন্তা করলে সৎ পথে থাকলে, যদি ব্যর্থও হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার বংশের মধ্যে কেউ প্রতিভাবান হয়ে আসবেই।'

'আচ্ছা দাদু, বিবেক মন্দ কাজে বা দুঃখে জর্জরিত হলে দুর্বল হয় কি?'

'বিবেক সত্য মিথ্যা নিরিখ করে। তাতে শান দিতে হয়। অনেক পড়াশুনো করলে বিবেক ফাইন হয়। জ্ঞানবান হয়। কিন্তু চোর, মাতাল, লম্পটের বিবেক দূষিত ময়লা মেখে থাকতে থাকতে একসময় তার অপমৃত্যু ঘটে। দুর্বল তো হবেই। একটা জ্ঞানী বিবেকবান লোক অসহায় বা নিষ্পাপ কারো ওপর অত্যাচার হলে সহ্য করতে পারেন না। ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নিজের ক্ষতি তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু বিবেকহীন ব্যক্তি তখন হা হা করে হাসে। উপভোগ করে। অত্যাচারীর সহযোগী হয়। অথবা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ঘটনাটা দেখেও দেখে না।'

দাদুর কাছ থেকে ফিরে দশ ভরি সোনার চওড়া বিছেহার কোমরে পরা দিদার কাছে এসে তিনি বলেন, 'শরীফুল এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ায়, বিনিময়ে সে খায়, পোশাক পায় আর পড়াশুনোর খরচ নেয় আমার কাছ থেকে। তাই বলে সে এ বাড়ির পালিত পুত্র বা চাকর-বাকরের মতো হতে যাবে কেন? আর ছেলেটাও বলিহারী, হীনমন্যতা রোগ আছে ওর। নাহলে তোর ছোট মাসী হাসিনা না পড়লেও, কাপড় ছিঁড়ে দিলেও শাসন করে না কেন? কাজীদের ছেলেমেয়েকে মারতে নেই এটা ওর মা শিখিয়ে গেছে। তাই ওর মেরুদণ্ডটা শক্ত হয় না। তোর ছোটমামা ওর পকেট থেকে পয়সা চুরি করে, বই বেচে দেয়, তবু তাকে মারে না। আমার ওই ছোট ছেলেটা চোর হয়ে গেল!'

ওদুদ তাঁর দিদাকে একটা গল্প শোনালেন। সার্ত্রের গল্প। তিনটে সাহেব ছেলে একটা মজবুত চেহারার নিগ্রো ছেলেকে মারতে তাড়া করেছে। নিগ্রো ছেলেটা প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ ট্রেন রাস্তায় এসে পড়ল। তখন ট্রেন আসছে। তবু সে পার হয়ে গেল। যেই পার হয়ে গেছে অমনি ট্রেনটা চলে গেল। তিনটে সাহেব ছেলে তখন দাঁড়িয়ে গেছে। ততক্ষণে নিগ্রো ছেলেটি ছুটে গিয়ে একটি পতিতা মেয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। পতিতাটি দ্রুত ঘটনার কথা জানার পর তার হাতে ধরিয়ে দিল একটি

রিভালভার। বলল, 'ওদের তুমি গুলি করে মারো।'

কিন্তু নিগ্রো ছেলেটি এ কথায় কেমন যেন হয়ে পড়ল। সে কি মারতে পারে? সে যে অন্তজ। ওরা সাহেব বাচ্চা! ওদেরই তো মারার অধিকার আছে।

সাহেব ছেলে তিনটি যখন পতিতাটিকে পলাতক নিগ্রো ছেলের কথা জিজ্ঞেস করল সে বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি, এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে সে ঐ দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। এখনো তার গায়ের গন্ধ যায়নি।'

সাহেব ছেলে তিনটে দ্রুত ছুটে চলে গেল—ভুল নির্দেশিত পথের দিকে।

তারপর পতিতাটি ঘৃণায় নিগ্রো ছেলেটিকে ঘাড় ধরে বার করে দিল তার বাড়ি থেকে। বলল, 'যাও হ্যাটো। তুমি একটা কাপুরুষ।'

দিদা যেন ভাবনায় পড়লেন। কোনো একটা অঙ্ক যেন মেলাচ্ছেন। উত্তরটা জিরো হবে না তো? ভাবনাটা শরীফুলকে নিয়ে নয় তো?

ওদুদের একদিন সন্ধ্যার পর চোখে পড়ল শরীফুল বাইরের বৈঠকখানা ঘরে একা মাথা গুঁজে বসে আছে। সামনো তার বই খোলা। পাশে খানাপিনা পড়ে আছে। বাইরের জানালার নিচে ছোটমাসী।

ওদের কথোপকথন কানে পড়ল কাঁটালী চাঁপায় তলাটা থেকে। শানের ঘাটের চাতালে বসে পড়লেন ওদুদ।

ছোট মাসীকে চাপা গলায় বলতে শুনলেন, 'তাহলে আপনি এ বাড়ির চাকর-বাকরের মতো হয়েই থাকবেন চিরকাল?'

কোনো কথা বললে না শরীফুল।

'আমার বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে গেছে জানেন তো? আব্বা জজ সাহেব তাঁর কথা নড়চড় হবে না। হয়তো আমার জীবনটাই যাবে অসময়ে। নিন, খেয়ে নিন, আমার মাথার দিব্যি। আপনি আমার বড়ভাই দারোগা সাহেবকে বলুন কালকেই, যে আমি হাসিনাকে ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

শরীফুল বলল, না হাসিনা, এ কথা আমি বলতে পারব না। তাহলে তাঁর শংকর মাছের ছড়ি পড়বে আমার পিঠের ওপর। বলবেন, 'বিশ্বাসঘাতক পাতফোঁড়। পিঠে লাথি মেরে, আমাকে এ বাড়ি ছাড়া করে দেবেন।' 'তাহলে আমি বড় ভাবীকে দিয়ে বড় ভাইকে জানাব'? শরীফুল কোনো উত্তর করল না। তার দুটো কপোল বেয়ে চোখের জল নামছে। আলোয় চকচক করছে। হাসিনা হাত বাড়িয়ে তার চোখের জল মুছতে গেলে শরীফুল সেই হাতে মাথা রেখে মুখ রগড়ায়। হঠাৎ ওদুদ এসে পড়াতে ছোট মাসী পালিয়ে গেল।

শরীফুল স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। ওদুদ ঢোকা চাপা দেওয়া তরকারিগুলো খুলে দেখলেন। বললেন, 'খাচ্ছ না কেন, খেয়ে নাও। অবহেলা করে ফেলে রাখলে খাদ্য নাকি অভিশাপ দেয়—যার পরিণাম অসময়ে সেই বাসি খাদ্য খেয়ে হয় পেটের অসুখ।'

কৃত্রিম হাসি হাসল শরীফুল।

বাঁশ বনের গভীর অন্ধকারে তখন আলোর মালা সাজিয়ে চলেছে জোনাকীরা।

রাতচরা পাখি ডাকছিল তখন গভীর রহস্যময় স্বরে।

বড় দারোগা আবদুর রহিম সাহেব যখন ছোটবোন হাসিনার দুর্বল হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারটির কথা শুনলেন তখন তিনি যেন হঠাৎ গুবলেট হয়ে গেলেন। কি করতে হবে ভেবে পেলেন না। স্ত্রীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'বলো কি তুমি! এটা কখনো হয়? কাজী বাড়ির মেয়ের তো চিরকালই কাজী বাড়িতে বিয়ে। দাসীর ছেলে। চাষার বেটাটার সাহসও তো বলিহারী। দাও তো শংকর মাছের চাবুকটা'...তাঁর মা এসে হাত উল্টে বললেন, 'থাক, কাউকে মারার দরকার নেই। তুমি শুধু বিয়ের সম্পর্কটা ভেঙে দাও। তোমার আব্বা যেন না শোনেন। ও পক্ষে শুধু তুমি উল্টোপাল্টা বলে ভাংচি দিয়ে দাও।'

'মা হয়ে বলছ একথা? একে দারোগা হয়ে আমি অপদার্থ হয়ে গেছি তায় আবার ইন্ধন যোগাচ্ছো? বলি, মান কুল খাবে? আমার ভাংচি দেবার কারণ?'

'কারণ অত্যন্ত জটিল এবং গুরুতর। যত তেজারতি দেখে দাও মেয়ে যদি না সুখী হয় কি হবে সেই বিয়েতে? যদি হাসিনা আত্মহত্যা করে?'

বড় দারোগা পোশাক পরলেন। তারপর ঘোড়ায় উঠলেন।

কিভাবে ভাংচি দেওয়া যায় সে কথা অনেক ভাবলেন বড় দারোগা রহিম সাহেব। নিজে নিজের বোনের বিরুদ্ধে কোনো সৎ-বংশজাত ব্যক্তি বলতে পারেন? তার চেয়ে বাইরের কোনো লোককে দিয়ে এ কাজটা করা যেতে পারে।

কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। বুমেরাং হয়ে ফিরে এলো। কাজী বাড়ির বদনাম করা লোকটি অপমান হয়ে এসে বলল, 'বড়বাবু, আমি উপদেশ নিয়ে ফিরে এসেছি। রুস্তম কাজী বললেন, পরের 'গিবৎ' বা বদনাম করা মহাপাপ। জজ সাহেব সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনি বেশি ওয়াকিবহাল নন। কাজেই এ বিয়ে হবেই। আমরা জজ সাহেবের অনেক ব্যাপারে কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

হিতে বিপরীত হল।

অসময়ে হঠাৎ ঢাকা শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন জজ সাহেব। হম্বি তম্বি চিৎকার শুরু করলেন।

'বাড়িটা কি আস্তাবল হয়ে গেছে নাকি!' গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মনে করেছ তোমরা? কোন পাজীর পা-ঝাড়া রুস্তম কাজীর বাড়ি লোক পাঠিয়ে আমার বংশের বদনাম গাইতে পাঠিয়েছিল? আমার মেয়ের টি বি আছে, তাকে জীন ধরে আছে, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মুখ রগড়ায়। আসলে রোগটা নাকি টি বি নয়, মৃগী রোগ এইসব কথা কে রটিয়েছে।

আমি হাসিনার ওইখানে বিয়ে দেবই। কারো বাপের সাধ্য নেই বন্ধ করে।' বড় দারোগার ডাক পড়ল এক সময়। তিনি গিয়ে নত মস্তকে দাঁড়ালে জজ সাহেব বললেন, 'এই যে জজ সাহেবের ছেলে বড় দারোগা! আমি জানতে চাই তোমার থানার কোনো পুলিস কেন উপযাচক হয়ে, কার নির্দেশে হাসিনার মিথ্যে রোগের সংবাদ পরিবেশন করে বিয়ে ভাঙতে চেষ্টা চালিয়েছে? তুমি কি এ ষড়যন্ত্রের আসামী?'

'জী না।'

'কে তবে?'

'হাসিনা নিজেই বোধহয়। যে বিয়ে আপনি ঠিক করেছেন তাতে আমার সর্বৈব মত আছে। কিন্তু হাসিনার মত নেই। শুনেছি তার অমতে বিয়ে দেওয়া হলে সে নাকি আত্মহত্যা করতে পারে।'

'এতদূর! শুয়োরের বাচ্চা শরীফুলটাকে তোমরা এখনো এ বাড়িতে রেখে দিয়েছ কেন? বুকে বসে সে শকুনের মতো চোখে ঠোকর দেবে?'

মেয়েটাকে যে জীনে ধরেছে এটা তো ঠিক কথা! জীনটা ঐ চাষার বেটা, দাসীর ছেলে শরীফুল। ডেকে দাও হাসিনাকে।

গোটা বাড়িতে তখন যেন সন্ত্রাস নেমে এলো। হাসিনাকে হয়তো মারপিট করবেন জজ সাহেব।

সবাই একঘরে জড়ো হয়েছেন। গোপন শলাপরামর্শ চলছে। কি হবে এখন? হাসিনার ওপরে মারপিট হলে সে যদি গলায় দড়ি দেয় বা বিষ খেয়ে বসে?

সবাই ঠিক করলেন আবদুল ওদুদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটা বাঁচার কৌশল বার করতে পারেন। কেন না তিনিই বার করেছেন আল্লার সমস্ত কিছু করার ক্ষমতা থাকলেও দুটি কাজ তিনি করতে পারেন না। এক, নিজের মতো আর একজন আল্লা পয়দা করতে পারেন না, আর দ্বিতীয়, নিজেকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন না।

আবদুল ওদুদ বড় মামার মেম সুন্দরী মেয়ে জামিলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এ মুখকে কি ভোলা যায়? যেন অনবদ্য পদ্ম কোরক। পরবর্তী জীবনে বিয়ের পর ঘর-আলো করে বসে থাকা মেম সাহেবকে দেখে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভেবে তিনি চোখ তুলতেই-অনেকে পালিয়ে এসেছেন। সেই কিশোরী জামিলা এখন একটু হাসল। এ হাসির অর্থ ছোট পিসিকে সমর্থন করুন। ছোট মাসীর কান্নাভরা মুখখানা দেখে তাঁর মায়া হল। ওদুদ সাহেব বললেন, 'একটা পথ আছে। ছোট মাসী এখন বলুক, আমি জীবনে কখনো কাউকে বিয়ে করব না। ব্যাস, আর কিছু বলার দরকার নেই।'

বড় দারোগাও খুশি। বললেন, 'ঠিক কথা। দেখা যাক কি ফল ফলে। জজ সাহেবের মাথা কোন দিকে খেলে। সাধে কি আমি ওদুদকে জামাই করতে চেয়েছি। ও ব্যাটা বলে, আচ্ছা বড়মামা, আপনি নামাজ পড়েন, রোজা

করেন আবার টেনে ঘুষও খান—এটা কি রকম ? আমি বলেছি পুণ্যও করি আবার পাপও করি। উসুল যায়। স্বর্গও চাই না, নরকও না। পৃথিবীর মতো একটা জায়গা পেলেই হবে। এইরকম রোজ আমার মোরগ পোলাও চাই। যাও হাসিনা, আব্বাজানের দরবারে সাক্ষাৎ দিয়ে এসো।

হাসিনা মৃদু পায়ে কাঁপতে কাঁপতে আব্বার ঘরে গেল। বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ফুরসির নলে সুগন্ধি তামাক টানছিলেন জজ সাহেব। বললেন, 'মা হাসিনা, তোমার মত কি ? আমি আব্বা হয়ে তোমার জন্য যে সাদির ব্যবস্থা করেছি তাতে তোমার নিশ্চয়ই অমত হবে না ?'

'আব্বাজান আমাকে ক্ষমা করুন। আমি জীবনে কখনো কাউকে সাদি করব না।' চমকে উঠলেন জজ সাহেব। হাসিনা তখন মুখে হাত দিয়ে কান্না চেপে পালিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে। দিশেহারা হয়ে গেলেন যেন জজ সাহেব। এতটুকু এই মেয়েটা এই চরম বুদ্ধিটা পায় কি করে ?

প্রেমের ব্যর্থতার পরিণাম বিরহ—তারই হলাহল পান করে কি হাসিনা নীল হয়ে গেছে ?

এবার ডাক পড়ল কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের।

তিনি গিয়ে নানাজীকে সালাম জানালেন। জজ সাহেব বললেন, 'শালা !'

অবাক হয়ে মুখ তুললেন ওদুদ সাহেব। জজ সাহেব আবার বললেন, 'শালা তোর কাজ। নাহলে এ বুদ্ধি আর কে দেবে ? ঠিক আছে। আমি হার মানলাম। বেনোজল ঢোকাচ্ছ ঢোকাও কিন্তু এর পরিণাম খারাপ হলে ঐ অন্তজ সন্তান শরীফুলটাকে আমি শংকর মাছের চাবুক কষাব। যাও, তোমরা সবাই যা চাও—তাই করো গিয়ে।'

বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেল।

বড় দারোগা দেদার খরচ করলেন। হাজার লোক খেলেন। কিন্তু জজ সাহেব এক গ্লাস জলও পান করলেন না সেদিন। সাদির খানাপিনা বিরিয়ানী, কাবাব, কোপ্তা, জর্দা, মালাই, ক্ষীর সবই পড়ে রইল তাঁর টেবিল।

সাদির পর হাসিনা আর শরীফুল যখন তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে গেল তখন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বললেন' 'যা রে চাষার বেটা, মানুষ হয়ে মানুষের মতো সংসার ধর্ম কর গিয়ে। কাজীবাড়ির ঋণ যেন কখনো ভুলিস না। হাসিনার গায়ে কখনো হাত তুলবি না। তাকে অনাদর করবি না। যদি করিস তবে তোর মাথায় যেন বজ্রপাত হয়।' এই হল আশীর্বাদ। সিংহ যেন রোষে গর্জন করছে। বর-কনে দু-জনে কদম বুসি করার পর পালিয়ে এলো।

জজ সাহেব তার পরেই টমটম ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দেশের বাড়িতে আর কোনদিন ফেরেননি। ওদুদ সাহেব বলেছিলেন একজন জজ সাহেব বা ভদ্রলোক যে এত মুখ খারাপ করতে পারেন এই ঘটনার আগে বা পরে আমি কখনো শুনিনি। তবে কাজী ঘরের মেয়ের কাজীবাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেও এই বিয়ে কিন্তু খুব সুখের হতো।